সাহিত্য শিল্প ভাবনা

সম্পাদক

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ন ব য ন

প্রথম প্রকাশ ১লা মার্চ, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ দেবী চট্টোপাধ্যায়
নবমন প্রকাশন
৯২, পি, কে, গুহ রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৮

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ ব্লকম্যান প্রসেস্, কলি-৯

মুদ্রক ঃ মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলি-৭০০ ০০৪

দেশে দেশে জনশিক্ষা বিজ্ঞান

আর সমাজমুখী শিল্প-সাহিত্যের জন্য

যাঁরা সংগ্রাম করেছেন

তাঁদের উদ্দেশে

সম্পাদকের কথা

বাংলা সাহিত্যে এমন ধরনের একটি বই পাওয়ার ইচ্ছে বহুদিন ধরেই ছিল। সুযোগ পেয়ে নিজেই নির্মাণে উদ্যোগ নিলাম। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য-সমালোচকদের কাছ থেকে সাড়াও পেলাম।

এই সংকলন-গ্রন্থের প্রথম পর্বে ইউরোপীয় দেশের ভাববাদী ও বস্তুবাদী শিল্পতত্ত্বের ধারা এবং সমাজ, দর্শন ও শিল্পভাবনার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে, রুশ, চীন প্রভৃতি দেশের সাহিত্য ভাবনায় সমাজবাস্তবতার উত্তরাধিকার, প্রকৃতি ও বিকাশ দেখানো হয়েছে। এই পর্বেই পাবলো পিকাসো ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্রষ্টার ভাবনা স্বতন্ত্র গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে এঁদের সমাজ-সচেতনতার জন্য।

মানবসভ্যতার বিবর্তনে দর্শন ও শিল্পতত্ত্ব কেন ও কিভাবে বদলায়—সমাজের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক কতটুকু ও কিভাবে থাকে, এই বিষয়ে সুস্থ বিতর্কের দিগন্ত আজ আরও প্রসারিত, বিশেষ করে সমাজতন্ত্র ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জয়-জয়ন্তীর যুগে।

সমাজজীবনেও যেমন, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন--মূল্যবোধের সমস্যা। কিন্তু মানবসমাজের দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের নিয়মেই আজ নতুন সমাজদর্শন ও জীবনবোধ গড়ে উঠেছে এবং জনপ্রিয় হয়েছে তারই অনুগামী বৈজ্ঞানিক শিল্পতত্ত্ব—এই সম্পর্ক মাতার সঙ্গে ভ্রূণস্থ শিশুর মত পূর্বাপর অবিচ্ছিন্ন। আমার ধারণা এই রকম একটি গতিশীল সামাজিক ঘটনার পর্যালোচনা যে-কোন কল্যাণকামী বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

এই দিকে লক্ষ্য রেখেই প্লেটো, আরিস্টটল, বার্ণার্ড শ, কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, মাও-সে-তুঙ, র‍্যাঁমা রলাঁ, ম্যাকসিম গোর্কি, জঁ-পল সার্ত্রে, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, লুস্যুন, বের্টোল্ট ব্রেখ্ট প্রমুখ যুগ-প্রতিনিধি মনীষী স্রষ্টাদের শিল্প-সাহিত্য-ভাবনার পরিচয় তুলে ধরা হল।

শেষে 'পুনশ্চ' অংশে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ ও বিতর্কিত তাত্ত্বিক প্রশ্ন পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করবো, আগ্রহী পাঠক ও সমালোচকগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে এই গ্রন্থের সমৃদ্ধিকরণে সহযোগিতা করবেন।

যে সব বিশেষজ্ঞ বিদগ্ধ লেখক গ্রন্থটির পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়ে তাঁদের মূল্যবান লেখনী নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, আমার বিশ্বাস সহৃদয় পাঠক

উষ্ণ অভিনন্দনে তাঁদের সম্মানিত করবেন। লেখকদের জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। প্রকাশনার কাজে প্রবীণ বন্ধু শ্রীযোগেন বসু, শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায় ও টেম্পল প্রেসের কর্মিবৃন্দের সহযোগিতা, অগ্রজ সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ ছাড়া শ্রীতুষার পাল ও দুই কন্যা মনোনীতা ও নবনীতা পাণ্ডুলিপি কপি করে যতটুকু সাহায্য করেছে, তা-ও ভোলার নয়।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

প্লেটোর শিল্পভাবনা

নবকুমার নন্দী

নন্দনতত্ত্ব এ যুগে একটা স্বাধীন স্বনির্ভর বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত; কিন্তু প্রাচীনকালে বিশেষত প্রাচীন গ্রীকদের নিকট নন্দনতত্ত্বের স্বাধীন বিজ্ঞান রূপে স্বীকৃতি ছিল না। বস্তুতপক্ষে তখনকার দিনে জ্ঞান-চর্চা বলতেই বুঝাত দর্শনকে। প্রত্যেক বিজ্ঞান ছিল দর্শন মুখাপেক্ষী কিংবা দর্শন-চর্চার অংগ। সুতরাং শিল্পকলা সম্পর্কে প্লেটোর মত জানতে গেলে প্লেটোর দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার এবং যেহেতু দর্শন মানুষের সচেতন চিন্তাপ্রসূত এবং যেহেতু মানুষের চিন্তা তার সমাজ কাঠামো ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল সেজন্য প্লেটোর সময়কার প্রাচীন গ্রীক সামাজিক কাঠামো সম্পর্কেও কথঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

প্রাচীন গ্রীক সমাজ নিঃসন্দেহে ছিল দাস-ভিত্তিক সমাজ। পণ্য উৎপাদনে দাসরাই ছিল প্রধান উপকরণ; এই দাস প্রথাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্র। ফলত এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সব বিষয়ে সব সময় চলত এক ধরণের ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। এদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও কম হত না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল তখন গ্রীক দেশে—দাস-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অবসরভোগী একশ্রেণীর মানুষের জন্ম। জীবিকা-নির্বাহের জন্য তাদের সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকতে হত না। এরাই তখনকার দিনের বুদ্ধিজীবি। এরা বিভিন্ন রকম জ্ঞানচর্চায়, শিল্পকলায় এবং সর্বোপরি সকল রকম মনন কার্যে ব্যাপৃত হলেন। এভাবে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বিভাজন স্বীকৃত হওয়ায় সমাজে বুদ্ধিজীবিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতঃই এ অবস্থায় বুদ্ধিজীবিদের একাংশ পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে জানা ও বুঝার কাজে তাদের চিন্তা ভাবনাকে নিযুক্ত করলেন। পরিবেশকে জানার সঙ্গে সঙ্গে তারা মানব কল্যাণের কথাও চিন্তা করতেন। সুস্থ ও উন্নত নাগরিক জীবনের উপায় উদ্ভাবন তাদের চিন্তায় স্থান পেত। যাদের চিন্তাভাবনা সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হত তারা 'জ্ঞানী' বলে পরিচিত হতেন। পরবর্তী কালে তাঁরাই 'দার্শনিক' আখ্যায় ভূষিত।

এই ধরনের একটা সামাজিক অবস্থার মধ্যেই প্রাচীন গ্রীক দর্শনের জন্ম। লক্ষ্য করার মত প্রথম অবস্থায় দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জগতের আদি উপাদান নির্ণয় করা। সক্রেটিসের পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র সোফিস্ট ছাড়া সকল গ্রীক দার্শনিকই মুখ্যত ছিলেন সৃষ্টিতত্ত্ববিদ। তাদের আলোচনায় মানুষের কথা ছিল গৌণ। সক্রেটিস থেকে সুরু হয় মানুষ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা। প্লেটোই হচ্ছেন গ্রীস কেন খুব সম্ভব পৃথিবীরই প্রথম দার্শনিক যাঁর চিন্তা সম্ভাব্য সকল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। তিনি একদিকে যেমন অধিবিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যারও অবতারণা করেছেন। কিন্তু তবু শিল্পকলার আলোচনা তাঁর কোন বইয়েই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেনি।

প্লেটোর বইগুলি 'ডায়ালগ' আকারে লিখিত। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে ডজন দুয়েরও বেশী 'ডায়ালগ' লিখে গেছেন। বিভিন্ন 'ডায়ালগ'-এ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা। ললিতকলা বা শিল্প সম্পর্কে তার মতামত প্রধানত পাওয়া যায় 'রিপাবলিক' গ্রন্থে। এ ছাড়া 'সফিস্ট', 'ল্জ' প্রভৃতি অংশে এ সম্পর্কে কিছু কিছু উক্তি আছে। তবে মুখ্যত 'রিপাবলিক'-য়ে এই শিল্প সম্পর্কিত তাঁর মতামত ব্যক্ত। কিন্তু এখানে এ প্রসঙ্গে আলোচনা কখনও মুখ্য হয়ে উঠেনি। নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে এসেছে শিল্পসংক্রান্ত আলোচনা।

প্লেটোর শিল্পসংক্রান্ত আলোচনার দুইটা দিক আছে; একদিকে হল শিল্পের অধিবিদ্যক সংজ্ঞা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও প্রসঙ্গ চিন্তা। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি শিল্প ও ললিতকলাকে হীন ও অহেতুক বলে গণ্য করেছেন। অথচ মজার কথা হল প্লেটোর নিজের লেখা উপভোগ্য সাহিত্য সুষমায় মণ্ডিত।

প্রথমে প্রথম দিকটার আলোচনা করা যাক। প্লেটোর মতে শিল্পকর্ম হচ্ছে 'অনুকরণের অনুকরণ'। কেন প্লেটো একথা বলছেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তাঁর অধিবিদ্যক অবস্থান নির্ণয় করা দরকার। প্লেটো হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম যুক্তিবাদী বা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে যথার্থ জ্ঞান যুক্তিভিত্তিক। তাঁর পূর্বসূরী 'সোফিস্ট' নামক দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করতেন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই জ্ঞান এবং জ্ঞানের মাপকাঠি ব্যক্তি মানুষ স্বয়ং—Man is the measure of all things. সোফিস্টদের এই মতবাদ খণ্ডন করে প্লেটো দেখালেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র বিশেষের জ্ঞান দেয়। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ হচ্ছে সর্বজনগ্রাহ্যতা। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিভেদে ও সময়ভেদে ভিন্ন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষে যা পাওয়া যায় তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

শাশ্বত সত্যের সন্ধান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দিতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান সর্বজনগ্রাহ্য। বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান সামান্য লক্ষণাক্রান্ত। প্লেটোর মতে বুদ্ধি মানবাত্মার অপরিহার্য অংশ। তাঁর মতে মানবাত্মা বুদ্ধি ও অবুদ্ধির সমন্বয়। বুদ্ধি অবিনশ্বর এবং সকল আত্মায় একইরূপে বিদ্যমান; কিন্তু অবুদ্ধি অংশ দেহজ এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে এর বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং প্লেটোর নিকট বোধাত্মক আত্মাই যথার্থ আত্মা।

এই আত্মার লক্ষ্য হচ্ছে সত্যানুসন্ধান। সত্য শাশ্বত। ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। কেন না ইন্দ্রিয় সংবেদন যা দেয় তা পরিবর্তনশীল। একমাত্র বুদ্ধিই সত্যের সন্ধান দিতে পারে। বুদ্ধিগ্রাহ্য যে জগত তা হল ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং এখানেও প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। নিয়ত পরিবর্তনশীল কিংবা ক্ষণিক যা তা যথার্থ জগত নয়। যদি প্রশ্ন করা যায় এর ঊর্ধ্বে কি রিয়াল বা বাস্তব বলে কিছু আছে তাহলে প্লেটো বলবেন নিশ্চয়ই আছে তা হল 'আইডিয়া'র জগত। 'আইডিয়া' হল ইন্দ্রিয়াতীত বাস্তব সত্তা। সাধারণ ভাষায় আইডিয়া বলতে আমরা মানসিক ধারনাকে বুঝি। কিন্তু প্লেটো আইডিয়া বলতে কোন মানসিক ধারনাকে বুঝাননি। প্লেটো যে আইডিয়ার কথা বলেন তা হল সত্তাবান, অবিনশ্বর ও সামান্য। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এর জ্ঞান হয় না। কেবলমাত্র বুদ্ধিই এর জ্ঞান দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্লেটোর অধিবিদ্যায় ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্বিজগত স্বীকৃত। একটি 'বিইং' এবং অপরটি 'নট বিইং'। এই দুই জগতের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি 'অনুকরণ' কথাটা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চাইছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগত যাকে 'প্রকৃতি' বলে আমরা চিহ্নিত করি তা হচ্ছে প্রকৃত জগত বা আইডিয়ার জগতের অবিকল প্রতিরূপ। উদাহরণ দিয়ে এ কথাটাকে পরিষ্কার করা যায়। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষ 'মানুষ' নামক আইডিয়ার প্রতিরূপ ব্যক্তি মানুষ বিভিন্ন; কিন্তু 'মানুষ' আইডিয়াটি এক অভিন্ন। ইহা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে বিদ্যমান। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু 'মানুষ' আইডিয়ার মৃত্যু নাই। অনুরূপভাবে প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়বস্তুই ইন্দ্রিয়াতীত জগতে অবস্থিত বিভিন্ন আইডিয়ার অবিকল প্রতিরূপ। যথার্থ জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে এ সত্য উপলব্ধি করা—আইডিয়াকে জানা, তা হলেই সত্যকে জানা হয়।

দর্শনে প্লেটোর এই অধিবিদ্যক অবস্থান বুঝতে পারলে শিল্পকর্মকে তিনি কেন 'অনুকরণের অনুকরণ' বলেছেন তা বোধগম্য হয়। একজন শিল্পী কি করেন?

প্লেটোর ভাষায় স্পষ্টতই তিনি 'ইমিটেট' বা অনুকরণ করেন। কাকে

অনুকরণ করেন? তিনি আইডিয়ার অনুকরণ করেন না। প্রকৃতির অনুকরণ করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগত, যে জগতের বর্ণ আছে, গন্ধ আছে, সে জগতের বিকল প্রতিরূপ এঁকে যান। সুতরাং শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে অনুকরণের অনুকরণ। এবং শিল্প কর্ম যেহেতু অনুকরণের অনুকরণ সেজন্য তা সত্য থেকে তিন গুণ দূরে। রিপাবলিক-এর নিম্নোদ্ধৃত 'ডায়ালগ'টি অনুসরণ করা যাক।

'Now there are these three beds, first the bed which exists in nature, which we should say, I fancy, was made by God. Should we not?'

'By God, I fancy'.

'And one made by the Carpenter?'

'Yes', he said.

'And one made by the painter?'

'Yes, let us suppose so'.

'Painter, Carpenter and God, these three are set over the three classes of beds'.

'Yes, these three'.

. . . .

. . . .

'And you call the painter also a manufacturer and maker of the same kind of thing?'

'Certainly not'.

'Then what is he of a bed?'

'I think', he answered 'that he would be most fairly described as an imitator of what the other two manufacture'.

'Good', I said 'you call him an imitator who is concerned with that which is begotten three removes from nature?'

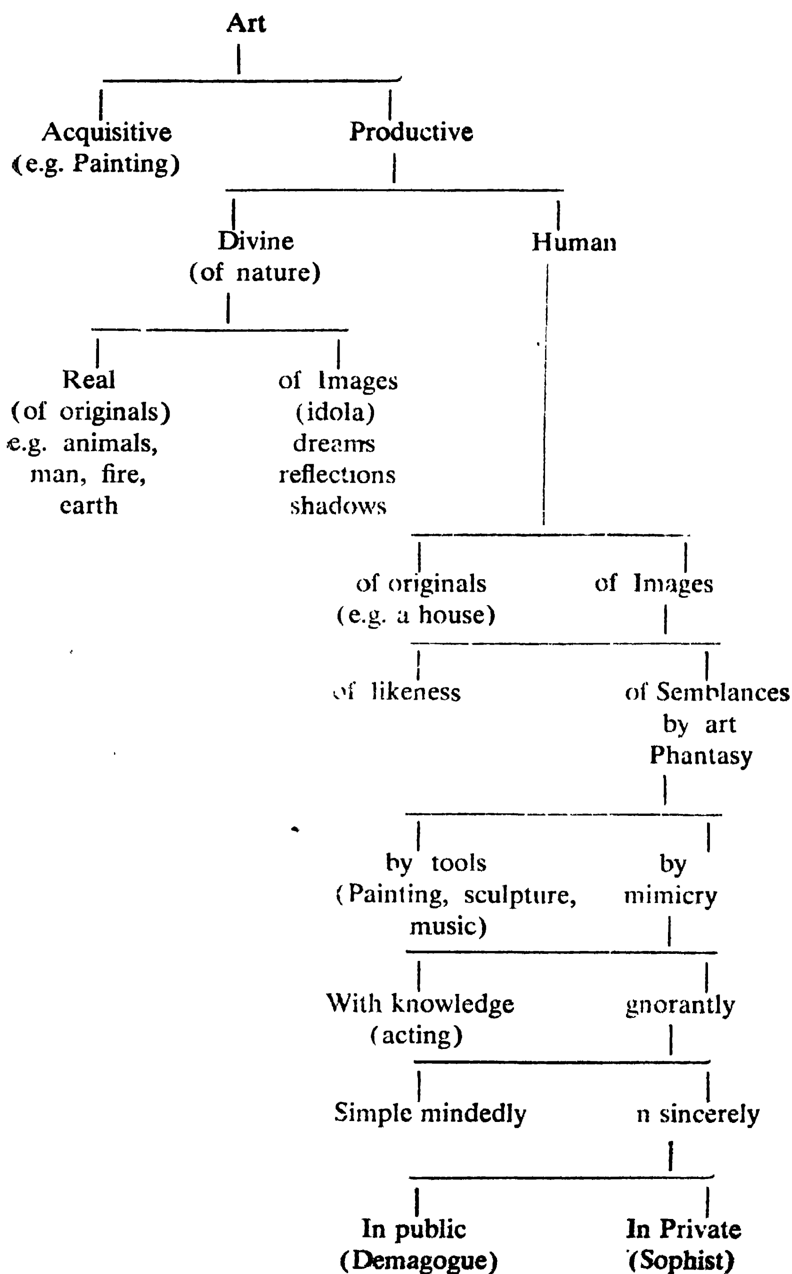
'Certainly', he said.

'And the tragedian, since he is an imitator, will be the one whose nature is third from the king and from the truth, and all the other imitators will be like him?'

'That seems probable'.

এই কথোপকথন থেকেই বোঝা যায় শিল্পকর্মকে প্লেটো কেন হীন স্থান দিয়েছেন। সম্পূর্ণভাবেই তিনি সমগ্র বিষয়টাকে পূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন। সুন্দর এবং জ্ঞানের মধ্যে প্লেটো এক ধরণের বিরোধ যেন লক্ষ্য করছেন। যা সুন্দর তা জ্ঞান নয়। সুন্দরের আবেদন কল্পনায়, জ্ঞানের আবেদন বুদ্ধিতে।

আধুনিককালের কোন নন্দনতাত্ত্বিকের পক্ষে প্লেটোর শিল্প-ব্যাখ্যা গ্রহণ



Art
Acquisitive
(e.g. Painting)
Productive
Divine
(of nature)
Human
Real
(of originals)
e.g. animals,
man, fire,
earth
of Images
(idola)
dreams
reflections
shadows
of originals
(e.g. a house)
of Images
of likeness
of Semblances
by art
Phantasy
by tools
(Painting, sculpture,
music)
by
mimicry
With knowledge
(acting)
gnorantly
Simple mindedly
n sincerely
In public
(Demagogue)
In Private
(Sophist)

করা সম্ভব নয়। শিল্পমাত্রই অনুকরণের অনুকরণ স্বীকার করা শক্ত। কিন্তু শিল্পকে কেন প্লেটো অনুকরণের অনুকরণ বললেন তার একটা সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। আদিম ললিতকলা বা শিল্প সৃষ্টির উদ্ভব কীভাবে ঘটে? স্পষ্টতই এক ধরণের অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শিকারী মানুষ শিকারের আশায় পশুর ডাক অনুকরণ করত। আদিমতম সঙ্গীত, আদিমতম নৃত্যকলার উৎপত্তি এ ধরণের অনুকরণ থেকে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এভাবেই শিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রাচীন গ্রীসে যখন দাস-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত তখন আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব একেবারে অবলুপ্ত মনে করার কারণ নাই। প্রাচীন গ্রীক শিল্পকলায় এর প্রভাব বিদ্যমান থাকতে বাধ্য। সুতরাং প্লেটোর শিল্প চিন্তা প্রাচীন গ্রীক শিল্পকলার প্রভাবেই প্রভাবিত। সফিস্ট নামক গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় প্লেটো ললিতকলার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা থেকেও তা অনুমান করা যায়। [সফিস্ট-এ শিল্পের শ্রেণী বিভাগের সারণীটি আগের পাতায় রইল।]

প্লেটোর কাছে গৃহনির্মাণ, চিত্রাঙ্কণ সবকিছুই শিল্পকলা। এ সবই অনুকরণ। শিল্পীরা অতীন্দ্রিয় সত্তার ধার ধারে না। সত্যের অনুসন্ধান তাদের কাজ নয়।

কবিতার বিরুদ্ধে প্লেটোর অভিযোগ ত্রিবিধ। প্রথমত শিক্ষার ক্ষেত্রে কবিতার প্রভাব ব্যক্তি-মানসের পক্ষে ক্ষতিকারক। কবি যেহেতু প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন এবং যেহেতু প্রকৃতি হচ্ছে যথার্থ জগতের অনুকরণ মাত্র, সেজন্য কবিকর্ম হচ্ছে অনুকরণের অনুকরণ মাত্র। সুতরাং কখনই তা জ্ঞানার্জনের সহায়ক নয়। দ্বিতীয়ত কবিতা মানুষের অপেক্ষাকৃত হীন ও লঘু আবেগকে উদ্দীপিত করে। সত্য ও শিবকে অর্জন করতে হলে এ সকল আবেগকে যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন। সুতরাং আদর্শ নৈতিক জীবনের পক্ষে কবিতা অপ্রয়োজনীয়, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও। তৃতীয়ত কবিতা বহু ক্ষেত্রে দেবতাদের সম্পর্কে মিথ্যা আখ্যান রচনা করে; এজন্য ধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, যা আদর্শ ধর্ম জীবনের পক্ষে সুখকর নয়। অলীক পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীকে মানুষের মত করে ভাবা প্লেটোর সমসাময়িক অনেকেই নিন্দা করেছেন। এ কারণেই প্লেটো যে আদর্শ প্রজাতন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন সে জগত থেকে কবিরা 'নির্বাসিত'।

প্লেটোর মতে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র জীবনে সব কিছুর ঊর্ধে যুক্তির স্থান। আদর্শ রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির পক্ষে শ্রেয়কে অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং শিল্প যেন কোন মতেই দর্শন ও নীতিশাস্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত না করে।

অ্যারিস্টটলের শিল্পচিন্তা

পবিত্র সরকার

১· ভূমিকা

দার্শনিকদের গুরুশিষ্য পরম্পরার সবচেয়ে বিখ্যাত তিনটি নাম হল সক্রেটিস (সোক্রাতেস, ৪৭০—৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ) প্লেটো (৪২৮—৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ) এবং অ্যারিস্টটল (আরিস্তোতেল, ৩৮৪—৩২২ খ্রীঃ পূঃ)। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম নামটি তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। বাকি দুটি নাম অপরিহার্য। অ্যাথেন্সে প্লেটোর আকাদেমি নামের বিদ্যালয়ে ৩৬৮ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল। স্কুলের (আসলে এক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়) উজ্জ্বলতম এবং সবচেয়ে ধীমান্ ছাত্র ছিলেন তিনি। গুরুর পরে স্কুলের অধ্যক্ষ তাঁরই হওয়া প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু ভাবনা ও মেজাজের দিক থেকে গুরু ও শিষ্য ছিলেন দুই গোলার্ধের মানুষ। প্লেটো ঈশ্বরবিশ্বাসী, ভাবুক, আবেগপ্রবণ এবং যুক্তির চেয়ে আপ্তবাক্যে বেশি অনুরক্ত; আর অ্যারিস্টটল সংশয়ী, জীবনে একটি কবিতা লিখে ফেলা সত্ত্বেও মূলত যুক্তিবাদী, বিচার-প্রবণ, মাথা-ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। একজন অবরোহী (ডিডাক্‌টিভ্) পদ্ধতিতে কথা বলেন, অর্থাৎ আগেই কিছু সূত্র ও সিদ্ধান্ত খাড়া করে পরে তার ব্যাখ্যা করেন; অন্যজনের অবলম্বন আরোহী বা ইনডাক্‌টিভ পদ্ধতি —অজস্র তথ্য ও যুক্তির সমর্থন ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই করেন না। শোনা যায়, 'পলিটিক্‌স' বইটি লেখার সময় গ্রীসের ১৫৮টি রাজ্যের শাসনতন্ত্র তাঁর হাতের কাছে মজুত ছিল। লোকে বলে, এক সময় গ্রীসে লোকে হয় প্লেটো-পন্থী হত, না হয় অ্যারিস্টটল-পন্থী হত—দুয়ের মাঝামাঝি কিছু হওয়ার উপায় ছিল না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অনেক আগেই নিশ্চয়ই এই বিরোধের সূচনা দেখা গিয়েছিল। তাই গুরু মৃত্যুর আগে শিষ্যকে স্কুলের ভার দিয়ে যাননি। সে দায়িত্ব দিয়ে যান ভাইপো স্পেউসিপ্পুস্-কে। এতে অ্যারিস্টটল খুবই দমে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। গুরু-শিষ্যের এই বিরোধের কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

২· অ্যারিস্টটলের শিল্পতত্ত্বের মূলগ্রন্থ

পরে ৩৩৫ খ্রীঃ পূঃ থেকে অ্যাথেন্সে নিজের স্কুল লুকেআম্ বা লাইসিয়াম্ গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন অ্যারিস্টটল। এই স্কুলে ছাত্রদের পড়ানোর জন্যই ৩৩০ খ্রীঃ পূঃ নাগাদ তাঁর 'কাব্যতত্ত্ব' বা পোয়েটিক্স বইটি রচনা করেন। 'রচনা করেন' বলাটা সম্ভবত ভুল হল। বইটি মনে হয় ক্লাস নোটের খসড়া, পড়ানোর সময় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতেন। তবে কোথাও কোথাও খুব সাধারণ কথাও যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন ('সাত', অধ্যায়ে প্লট্-এর 'আরম্ভ', 'বিকাশ' বা 'পরিণতি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যেমন), তাতে এই অনুমান প্রায়ই ব্যাহত হয়। প্রায় দশ হাজার শব্দের, ২৬টি অধ্যায়ের এবং তিরিশ পৃষ্ঠার মতো এ বইয়ের সম্ভবত আরেকটা অংশ ছিল, যার নাম ছিল 'কবিদের বিষয়ে'—সে অংশ আমাদের হাতে পেঁাছোয়নি। যাই হোক, ভালো করে পড়লে প্রায়ই দেখা যায় যে, অ্যারিস্টটল বেশ যত্ন নিয়েই যুক্তি খাড়া করছেন, প্রতিটি জিনিশের সবগুলি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন, তাঁর বিপক্ষে কী যুক্তি হতে পারে তার বিচার করছেন। এমন তীক্ষ্ণ ও সর্বব্যাপ্ত নজর যেখানে সেখানে বইটিকে নিছক ক্লাস নোট ভেবে নিতে অসুবিধা হয়।

এই পুস্তিকাই ইয়োরোপের শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম স্বাধীন আলোচনা। তার পর থেকে প্রায় তেইশ-শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে—তা সত্ত্বেও এই বইকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, যদি বা অ্যারিস্টটলের দেওয়া উত্তরগুলিকে বাতিল করা সম্ভব হয়, তিনি যে-প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন সে-প্রশ্নগুলি আজও মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক। আর কে না জানে যে, সঠিক উত্তরদানের চেয়ে সঠিক প্রশ্ন তোলার গৌরব এতটুকু কম নয়, বরং বেশি। সুতরাং এই দু হাজার বছর ধরে 'জ্ঞানীদের প্রভু' (Il maestro di color che sanno—"যারা জানে তাদের প্রভু"—ইনফারনো চতুর্থ সর্গ, দান্তে) এই মানুষটির কাব্যতত্ত্ব নামের এই বইটি নিয়ে পণ্ডিতদের বিতর্ক শেষ হয়নি।

আর পুরো বইটিও ঠিক কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নয়। শিল্পতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রশ্নগুলি অ্যারিস্টটল তুলেছেন প্রথম তিন-চারটি অধ্যায়ে। পরে চলে গেছেন বিশেষ ধরনের শিল্প—কবিতা বা সাহিত্যের বিবর্তনের আলোচনায়। সেখান থেকে বিশেষ ধরনের সাহিত্য অর্থাৎ নাটকের, এবং তারপরে ৬ অধ্যায় থেকে বিশেষ ধরনের নাটকের, অর্থাৎ ট্রাজেডির, আলোচনায়। বাকি অংশে প্রায় সবটাই সংজ্ঞা থেকে শুরু করে ট্রাজেডির নানা দিকের আলোচনা। অর্থাৎ নির্বিশেষ শিল্প থেকে বিশেষ শিল্পের দিকে এগিয়ে এসেছেন অ্যারিস্টটল, বড়ো এলাকা থেকে ছোটো এলাকায় পৌঁছে

আজকের ভাষায় যাকে in-depth study বলে তাই করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে 'শিল্প কী' এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু হলেও, এবং 'পোয়েটিকস্' নাম হলেও এ বইয়ের মূল বিষয় ট্রাজেডি। যেখানে শিল্পবিশেষের আলোচনা ও বর্ণনাই মুখ্য, সেখানে কি শিল্পের 'তত্ত্ব' খুঁজে পাওয়া যাবে? একটু লক্ষ করলে দেখব, ঐ বিশেষের আলোচনাতেও নির্বিশেষ বা সমগ্রতভাবে শিল্পের তত্ত্ব কিছু কিছু জড়িয়ে আছে। সেগুলি আমরা যথাস্থানে নির্দেশ করব।

আর যে-কথাটি মনে রাখা দরকার, তা এই যে, অ্যারিস্টটলের এ বইটি 'নাট্যবেদ' গোছের কিছু নয় যে এর সূত্র মন্ত্রের মতো শিরোধার্য করতে হবে। যদিও ওয়ালটার কফম্যান অ্যারিস্টটলের ভারিক্কি চালে ট্রাজেডির মূলসূত্র ব্যাখ্যার মধ্যে "ট্রাজেডির লেখকদের তুলনায় আমার জ্ঞানবুদ্ধি বেশি" গোছের একটা আত্মবিশ্বাস লক্ষ করেছেন, তবু এখন আর ও বইটিকে 'নাট্য-শাস্ত্র' হিসাবে দেখা হয় না। তাঁর সময়কার এবং তাঁর সংস্কৃতি ও ইতি-হাসের মধ্য থেকে জাত নাটক দেখে প্রত্যক্ষ বা 'এমপিরিক্যাল' পদ্ধতিতে শিল্প ও ট্রাজেডি সম্বন্ধে তিনি কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তা থেকে রোমের হোরেস প্রমুখ সমালোচকেরা তাঁকে মন্ত্রদাতা ঠাউরে মাথায় বসিয়ে-ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্য-ক্লাসিক নাট্যকার এবং সমালোচকেরাও শুধু যে তাঁর কথা বেদবাক্যের মতো মেনেছেন তাই নয়, তাঁর কথার অতি-ব্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা লক্ষ করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, অনেক গ্রীক নাটকই অ্যারিস্টটলের শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেছে। নাট্যসমালোচক অ্যালারডিস নিকল তাঁর নাট্যতত্ত্বের বইয়ে সে জন্য বলেই ফেলেছিলেন যে, "আমাদের কালের নাটক দেখলে অ্যারিস্টটল নিশ্চয়ই তাঁর সূত্রটুত্রগুলি একটু বদলে লিখতেন"। ফলে এ বই আইনের বই নয়। ফ্রানসিস ফার্গুসন বইটিকে 'পাক-প্রণালী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এতে কতকগুলি মূল নীতি দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিরুচি অনুযায়ী প্রত্যেক নাট্যকার সেগুলিকে ব্যবহার করবেন।

৩· শিল্পের সাধারণ লক্ষণ ও সংজ্ঞা

শিল্পের মৌলিক বিষয়ে এ বইয়ে অ্যারিস্টটলের প্রথম প্রশ্নঃ "শিল্প কী, শিল্প কাকে বলব?" আর তাঁর উত্তরঃ "হে তেখ্নে মিমেইতাই তেন্ ফুসিন্"—শিল্প স্বভাবের অনুকরণ করে (Art imitates Nature)। অ্যারিস্টটলের মান্যতম ইংরেজি অনুবাদক বুচার 'স্বভাব' বা Nature কথাটির অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ দুরূহ ব্যাখ্যায় না গিয়েও খুব সহজবুদ্ধিতে আমরা বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নিতে পারি যে, এই পৃথিবীতে যা-কিছু মানুষের অনুকরণের ফলে জাত

বা সৃষ্ট নয়, তা-ই স্বভাব বা 'নেচার'-এর অন্তর্গত। গাছ প্রকৃতির, কিন্তু গাছের ছবি অনুকরণের ফলে সৃষ্ট, কাজেই তা শিল্প। এমন-কী চেয়ার-টেবিল বাড়িঘরও শিল্প নয়, কারণ কোনো কিছুর অনুকরণে সেসবের সৃষ্টি হয়নি। প্লেটো হলে এসবকেও অনুকরণ বলতেন, কিন্তু অ্যারিস্টটল তা বলতে সম্মত নন। অ্যারিস্টটলের মতে এগুলি প্রকৃতিরই অভাব পূরণ, প্রকৃতিরই সম্প্রসারণ। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি—শীতের আচ্ছাদন হিসেবে পশুর গায়ে ভারী লোম আছে—তা প্রকৃতিরই অংশ। মানুষের গায়ে ঐ ঘন দীর্ঘ লোমরাজি নেই, কাজেই মানুষকে জামাকাপড় তৈরি করে নিজেকে ঢাকতে হয়। এই জামাকাপড় প্রকৃতির শূন্যতাকেই পূর্ণ করছে, তার এলাকাই বাড়াচ্ছে। ফলে ঐ চেয়ার-টেবিল বাড়ি-ঘর জামা-কাপড়কে শিল্প বলা সম্ভব নয়, কারণ তা অনুকরণের ফলে জাত নয়। বুচার ইঙ্গিত করেছেন যে, অ্যারিস্টটলের মনে চারুশিল্প (fine arts, imitative arts) ও কারুশিল্প (useful arts, applied arts)—এ দুয়ের ভেদ স্পষ্ট ছিল। চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি কারুশিল্পের উৎপাদন, কিন্তু ছবি গান কাব্য চারুশিল্পের অধিকারে। আরেকটা সূত্র দিয়েও চারু ও কারুশিল্পের এই তফাতটিকে বার করে আনা যায়। পোয়েটিক্‌সের 'চার' অধ্যায়ে (Book IV) অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, অনুকরণ আনন্দদায়ক। এখন চেয়ার-টেবিল-বাড়িঘর ইত্যাদি কি সে অর্থে আনন্দদায়ক? তা যখন নয়—তখন এগুলিকে ঐ চারুশিল্প বা ললিতকলা বলে গণ্য করা যাবে না। ললিত কলা হল তাই যা অনুকরণ-লব্ধ। সেগুলির এক নাম তাই অনুকরণাত্মক শিল্প বা imitative arts (মিমেতিকাই তেখনাই)।

যাঁরা আদি যুগের গ্রীক চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি দেখেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন কেন ঐ মতবাদের উদ্ভব হয়েছে চতুর্থ খৃীষ্ট পূর্বশতকের গ্রীসে। আজকের পৃথিবীর বিমূর্ত শিল্পকলার হদিশ তখন ছিল না, তখনকার সমস্ত শিল্পই প্রতিরূপসূচক—কোনো আদল দেখে বা ভেবে নিয়ে তার সৃষ্টি। গ্রীক মৃৎপাত্রে তাদের জীবনযাত্রার সজীব অনুকরণাত্মক ছবি ছিল বলেই তা কীট্‌সের কাছ থেকে কবিতার উচ্ছ্বাস উপার্জন করতে পেরেছিল। সুতরাং শিল্প যে অনুকরণাত্মক—তার প্রমাণ দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রীসে আগেই উপস্থিত ছিল। পরে তা তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হল প্লেটো-অ্যারিস্টটলের লেখায়।

৪· অনুকরণ কাজটা ভালো না মন্দ?

'শিল্প স্বভাবকে অনুকরণ করে'—চারুশিল্পের এই সংজ্ঞা অ্যারিস্টটল নির্দেশ করলেন। কিন্তু অনুকরণ সংক্রান্ত সকল তর্কের তাতে নিরসন হল

না। একটা তর্ক তো চলছিলই যে, অনুকরণ জিনিশটা ভালো, না মন্দ? অনুকরণ করা উচিত, কি উচিত না? এই তর্কে গুরু প্লেটো এবং শিষ্য অ্যারিস্টটলকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা গেল। তাঁরা মুখোমুখি হননি। প্লেটো অনুকরণের, বিশেষ করে কাব্যকলার প্রতি তাঁর তীব্র সমালোচনা করে গেছেন তাঁর 'দ রিপাবলিক' এবং শেষতম ডায়ালগ 'দ ল'জ' (The Laws) বই দুটিতে। অ্যারিস্টটল পোয়েটিকস্ লিখলেন গুরুর মৃত্যুর প্রায় আঠারো বছর পরে, সুতরাং এ নিয়ে তাঁদের সাক্ষাৎ সংঘর্ষ হয়নি। নিজের বইয়ে তিনি গুরুর নামও করেননি কখনো। কিন্তু বইয়ে অনুকরণ সম্বন্ধে প্লেটোর গালমন্দের পরিষ্কার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এটা বেশ বোঝা যায়। আগে দেখা যাক অনুকরণ সম্বন্ধে প্লেটোর আপত্তির কারণগুলি কী কী?

তার আগে, একটি কথা মনে রাখলে প্লেটোর আপত্তির একটি পটভূমিকা পাওয়া যাবে। প্লেটো শিল্পকে দেখেছিলেন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে, যে-শিক্ষা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তি ও স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ শিল্পকে শুধু শিল্প হিসেবে না বিচার করে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণ ও পরিপোষণে শিল্পের কার্যকরতার দিকটিই বিবেচনা করছেন। অর্থাৎ প্লেটোর লক্ষ্য ব্যবহারিক। কিন্তু অ্যারিস্টটল শিল্পকে স্বাধীন ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন, ফলে তাঁর উদ্দেশ্য ও বিচারের মাত্রা নন্দনতাত্ত্বিক, যদিও ক্যাথারসিস-এর ধারণায় সামাজিক স্বস্থতা ও মঙ্গলের বিষয়টি একটু উঁকি দেয়।

এ বইয়ে প্লেটো প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বিস্তারিতভাবে এসব কথার আলোচনা হয়েছে, তবু প্লেটোর অনুকরণ সংক্রান্ত আপত্তিকে এখানে সংক্ষেপে আমরা দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম আপত্তির নাম দিতে পারি দার্শনিক বা নৈয়ায়িক আপত্তি। এর মূল কথা হল, অনুকরণ মানে মিথ্যাচার। কবিরা আসলে মিথ্যাবাদী। কেন? না, তারা নকলের নকল করে। একবার নকলেই আসলের অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়—একটি কানাড়ী প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে ছবির ইক্ষু চিবুলে মিষ্টি লাগে না, ছবির রমণীকে আলিঙ্গন করা যায় না। নকলে আসলের বা মূলের অনেক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় বলতে প্লেটো সম্ভবত এইরকমই কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। একবার নকলেই যদি এই দশা হয় দুবার নকলে তবে মূলের আর কী খুঁজে পাব? ফলে কবিদের অনুকরণে সত্য শেষে মিথ্যার আকার নেয়, মূল আদল থেকে দুবার (কারো কারো ভাষ্যে তিনবার) সরে এসে।

কিন্তু সত্য তাহলে কী? সত্য বলতে প্লেটো কী বুঝছেন যে তা থেকে ভ্রষ্টতার জন্য তিনি কবিদের উপর ক্ষুব্ধ? প্লেটোর মতে আমরা যা দেখছি

শুনছি ছুঁচ্ছি, যার গন্ধ পাচ্ছি ইত্যাদি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর এই জাগতিক বস্তুনিচয়—এসব সত্য নয়, এগুলোও অনুকরণ করে তৈরি। কে অনুকরণ করেছেন? স্বয়ং ঈশ্বর। কী থেকে অনুকরণ করলেন? না প্রত্যেকটি বস্তুর একটি মূল ধারণা বা রূপ (আইডিয়া বা ফর্ম) থেকে। ঐ মূল ধারণা বা রূপ আছে ঈশ্বরের চিত্তে, তারই আদলে তিনি জগৎচরাচরের সব কিছু তৈরি করেছেন। ঐ 'আইডিয়া'গুলোই মূল সত্য, তার অনুকরণে জগদ্-বস্তু তৈরি করতে গিয়ে মূলের অনেক কিছু নিশ্চয়ই বাদছাদ দিয়েছেন ঈশ্বর। তারপর কবিরা কী করবেন? তাঁরা ঈশ্বরের ঐ যে নকল, তার আবার নকল করলেন। চিত্রশিল্পীরাও তাই। গাছের 'আইডিয়া' থেকে ছাঁচ নিয়ে ঈশ্বর তৈরি করলেন পৃথিবীর গাছ, চিত্রশিল্পী আবার তাকে অনুকরণ করলেন রঙে রেখায়—ক্যানভাসের উপর। ফলে এই মানুষ-অনুকরণকারীর দল, অর্থাৎ কবি-শিল্পীরা, এরা হয়ে গেলেন 'twice removed from Truth', ফলত মিথ্যাবাদী।

শুধু প্লেটো কেন, ঐ সময় আরো বহু গ্রীক মনীষীও প্রায় একই কথা বিশ্বাস করতেন যে, কবি আর অভিনেতারা মিথ্যুকের সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু নয়। সক্রেটিসের পূর্ববর্তী দার্শনিক জেনোফানেস বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, মানুষেরা ভাবে তাদেরই মতো দেবতারাও জন্মায়, তাদেরই মতো জামাকাপড় পরে, কথা বলে মানুষের গলায়, চেহারাও মানুষের মতো। কিন্তু ঘোড়ারা যদি লিখতে পারত বা ছবি আঁকতে পারত, তহলে ঘোড়াদের দেবতারা হত ঘোড়াদেরই আদলে, ষাঁড়দের দেবতারা ষাঁড়দেরই মতো। নিগ্রো ইথিয়োপীয়দের দেবতাদেরও সেজন্য গায়ের রং কালো, নাকও থ্যাবড়া। দেবতারা যে ঠিক কীরকম তা কোনো মানুষ কি জানে, না কখনো জানতে পারবে? এফেসাসের হেরাক্লিটাস দেবতাদের নিয়ে লেখার (অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণের) অপরাধে হোমারকে বেত্রাঘাত করার বিধান দিয়েছেন। তাই প্লেটো তাঁর 'দ রিপাবলিক'-এর 'দুই' অধ্যায়ে হোমার হেসিয়োদ প্রভৃতি কবিদের প্রধান অপরাধ এই বলে নির্দেশ করেছেন— "the fault of telling a lie, and, what is more, a bad lie."

ব্যাড লাই কেন, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, অভিনেতাদেরও (মনে রাখতে হবে প্রধান অভিনেতা কথাটির মূল গ্রীক 'হিপোক্রিতস্'—যা থেকে ইংরেজি হিপোক্রিট) মিথ্যাবাদী মনে করা হত গ্রীসে—তাঁরাও তো নকলের নকলের কারবারী। প্লুতার্ক তাঁর জীবনীসংগ্রহে এই মজার ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। অ্যাথেন্সে থেসপিসের নাটক দেখতে এসেছিলেন বৃদ্ধ সেনেটর সোলোন। নাটক শেষ হলে ব্যাক স্টেজে এসে বললেন, "তুমি কী দারুণ মিথ্যেবাদী হে! অন্যের সাজ পরছ, অন্যের কথা

নিজের মুখে বলছ, লজ্জা করে না?" থেসপিস বললেন, "নাটকে ওসবে দোষ নেই।" শুনে সোলোন রাগে মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "এসব নাটককে প্রশ্রয় দিলে শাসনটাসনের সর্বনাশ হবে।" প্লেটোর আদেশ ছিল আরো চিত্তাকর্ষক। তাঁর মতে, একজন অভিনেতার সারা জীবন একটি-মাত্র ভূমিকাতেই অভিনয় করে যাওয়া উচিত। তাতে অন্তত মিথ্যাচারের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে।

যাই হোক, প্লেটোর জগৎ-সংস্থানের চেহারাটি অনেকটা এভাবে দেখানো যেতে পারে—

১· সর্বোচ্চ সত্যবস্তু	ঃ 'ফর্ম' বা 'আইডিয়া'র সমষ্টি
২· দ্বিতীয় স্তরের বস্তু	ঃ গাণিতিক সংখ্যা ও পরিমাপ
৩· তৃতীয় স্তরের বস্তু	ঃ ইন্দ্রিয়গোচর জগতের বস্তুসমূহ
৪· চতুর্থ স্তরের বস্তু	ঃ ছায়া, জলের প্রতিবিম্ব ইত্যাদি

'দ রিপাবলিক'-এর ৬ ও ৭ অধ্যায়ে তাঁর রিয়ালিটির এই চারটি স্তর তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু ১০ অধ্যায়ে আবার ছকটি এরকম:

১· ফর্ম বা আইডিয়া	ঃ যেমন 'বিছানা'র ধারণা
২· তার অনুকরণে তৈরি বস্তু	ঃ ছুতোরের তৈরি বিছানা
৩· তার অনুকরণ	ঃ শিল্পীর আঁকা বিছানার ছবি।

৩ নম্বরের বস্তুটি—যা অনুকরণের অনুকরণ—তা প্লেটোর মতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তা মিথ্যাচারের নামান্তর মাত্র, কারণ বিছানার আইডিয়া-র সঙ্গে বিছানার ছবির যোগ প্লেটোর মতে খুবই সামান্য। ঐ ১০ অধ্যায়েই ট্রাজেডির রচয়িতা সম্বন্ধে প্লেটোর ধিক্কার শুনি— "the tragic poet is an imitator, and therefore, like all other imitators, he is thrice removed from the throne of truth."

শিল্পীরা মিথ্যাবাদী—এই অভিযোগের কোনো সাক্ষাৎ প্রতিবাদ অ্যারিস্টটল করেননি। কিন্তু পোয়েটিক্‌সের চতুর্থ অধ্যায়ে অনুকরণ সম্বন্ধে দুটি মূল কথা বলেছেন। প্রথমত, শৈশব থেকেই অনুকরণ করে মানুষ, অনুকরণ করেই সে জীবনের প্রথম পাঠগুলি গ্রহণ করে: কাজেই অনুকরণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়ত, অনুকরণপ্রসূত আনন্দও (the pleasure in things imitated) সর্বজনীন। যিনি অনুকরণকে স্বাভাবিক এবং আনন্দদায়ক বলে গ্রহণ করেন তিনি তো শুরুতেই অনুকরণ যে মিথ্যাচরণ এই অভিযোগকে অগ্রাহ্য করেন। প্লেটোকে প্রত্যাখ্যান করেই অনুকরণ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের আলোচনা শুরু হয়।

৫· শিল্পীরা কি দুষ্কৃতকারী ?

অনুকরণ সম্বন্ধে প্লেটোর যে দ্বিতীয় অভিযোগ—যে অভিযোগ খানিকটা নৈতিক বা এথিক্যাল—তার মূল কথা এই: কবিরা সামাজিক অমঙ্গলকে প্রশ্রয় দেয় এবং সমাজের ক্ষতি করে। অর্থাৎ তারা শুধু lie সৃষ্টি করছে না, তারা bad lie-এর স্রষ্টা। তারা দেবতাদের সম্বন্ধে অসংগত কথাও লেখে। তাদের হিংসা, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার—এসব বিষয়ে ফলাও করে বলতে কবিদের ক্লান্তি নেই। রূপক হোক যাই হোক, তরুণরা রূপক আর আক্ষরিক বর্ণনার মধ্যে তো তফাত করতে পারে না, তাদের পক্ষে এসব বর্ণনা বিষের মতো ক্ষতিকর। ২ অধ্যায়ে (দ রিপাবলিক) সক্রেটিস আদেই-মান্তস্‌-কে বলছেন, "You and I, . . . at this moment are not poets, but founders of a State." সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে যে দুটি জিনিস সবচেয়ে বেশি করে দরকার—সেই আনুগত্য ও সমাজ-সংহতির ভিত্তি যখন কবিরা দেবতাদের সম্বন্ধে এই সব লিখে দুর্বল করে দিচ্ছে, তখন তাদের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এ সব পড়ে তরুণদের মনে দেবতাদের সম্বন্ধে ভয়ভক্তি হ্রাস পাবে। তার ফলে রাষ্ট্রশাসক-দেরও তারা আর বিশেষ পরোয়া করবে না, অন্যদিকে দেবতাদের এই সব রসালো কুৎসা তাদের মনের গোপন প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলে তাদের স্বেচ্ছাচারের প্ররোচনা দেবে। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই কবিদের রচনা ক্ষতিকর। তাছাড়া ট্রাজেডির নায়কদের আত্মবিস্মৃত শোকোচ্ছ্বাস ও অসংবৃত আবেগের প্রকাশ দেখে দেশের লোকে সংযমপূর্ণ বীরত্ব এবং ধৈর্যের আদর্শ ভুলে যাবে, এমন ভয়ও আছে। সেদিক থেকেও কবিদের রচনা বিপজ্জনক।

শিল্পের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্লেটোর এই নীতিনির্ভর আপত্তির জবাব অ্যারিস্টটল দিয়েছেন এইভাবে: তিনি বলছেন শিল্প অনুকরণ, এবং অনুকরণ স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক। তাঁর ইঙ্গিত যেন এই যে, যা স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক, তা কেন ক্ষতিকর হবে? অবশ্য ৬ অধ্যায়ে ট্রাজেডির সংজ্ঞাতে ট্রাজেডির প্রতিক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে ক্যাথারসিস কথাটি ব্যবহার করেছেন অ্যারিস্টটল। মূল গ্রীকে দশটি মাত্র শব্দে (দি এলেয়ো কাই ফোবো পেরাইনোসা তেন্ তন্ তোলোতন্ পাথেমাতন্ কাথারসিন্) যা বলেছেন তা আর পরে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাননি। তবে তার খানিকটা অর্থ এইরকম: ট্রাজেডির নায়কের দুঃখদুর্গতির ঘটনা দেখে দর্শকের মনে করুণা বা অনুকম্পা ('এলেওস্') এবং আতঙ্কের ('ফোবোস্') আলোড়ন ঘটে, এবং পরে এসব অনুভূতির

আতিশয্যজনিত মোক্ষণ (release) ঘটে তার চিত্তে প্রশান্তি ও ভারসাম্য আসে। এই কথার ঠিক অর্থ কী, তা নিয়ে বিতর্কে যাবার সুযোগ নেই। কিন্তু ঐ 'all passion spent' গোছের প্রশান্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন উপকারী তেমনই সমাজের পক্ষেও নিশ্চয়ই উপকারী--সমাজ যেহেতু ব্যক্তিরই সমষ্টি। তা সামাজিক সংস্থিতি এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। সুতরাং সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের দিক থেকেও একভাবে প্লেটোর কথার জবাব দেওয়া হল। আর ৯ অধ্যায়ে কাব্যকে ইতিহাসের চেয়ে উন্নততর এবং ব্যাপকতর (অধিকতর 'সর্বজনীন') বলে গণ্য করেছেন তিনি। তাতেই স্পষ্ট হয় যে, অ্যারিস্টটল কাব্য বা শিল্প সম্বন্ধে প্লেটোর মতো একদেশদর্শী ছিলেন না।

৬· অনুকরণ কি হুবহু প্রতিবিম্বন?

এর পরের যে প্রশ্ন, তা হলঃ অনুকরণ বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বুঝিয়েছেন? মাছিমারা কেরানির মতো নকল করা? 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' রচনা? না কি কবির বা শিল্পীর কোনো একটা স্বাধীনতা থাকে কল্পনা ও উদ্ভাবনের, নিজস্ব সৃজনের? এ নিয়েও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু 'পোয়েটিকস্' বইটি ভালো করে পড়লে এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে, অ্যারিস্টটল অনুকরণ কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে কখনোই বোঝাতে চাননি। তাঁর 'অনুকরণ'-কে বুচার 'a creative act' হিসেবেই দেখেছেন। বইটিতেই অসংখ্য ইঙ্গিত আছে যে, অ্যারিস্টটল অনুকরণ-কর্মের মধ্যে স্রষ্টার কল্পনা ও সৃজনের যথেষ্ট স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন। এই ইঙ্গিতগুলিকে পর পর সাজিয়ে দিইঃ

১· সংগীতকেও তিনি অনুকরণাত্মক শিল্প বলে স্বীকার করছেন (১ অধ্যায়)। এখন চিত্র, কাব্য বা ভাস্কর্য যে-অর্থে অনুকরণ, সংগীত কি সে-অর্থে অনুকরণ? চিত্রে, ভাস্কর্যে, কাব্যে যার অনুকরণ করা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার মূলটিকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। অর্থাৎ সেখানে অনুকরণের পরিণাম এবং অনুকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও সাযুজ্য থাকে। কিন্তু সংগীতে সে-সাদৃশ্য কীভাবে খুঁজব? যদি আক্ষরিক সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও সংগীত অনুকরণাত্মক শিল্প হয়, তাহলে অনুকরণ কাজটি কিছুতেই নকলনবিশের কাজ হতে পারে না।

২· ২ অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল বলছেন, "we must represent men (in action) either as better than in real life, or as worse, or as they are." ১৫ অধ্যায়ে প্রায় একই ধরনের যে কথা বলা হয়েছে

তাতে বুঝতে পারি যেমন আছে তার চেয়ে একটু উন্নত করে দেখানোর কথাই অ্যারিস্টটল বলছেন, স্বভাবত উন্নত মানুষকে যথাযথভাবে আঁকার কথা বলছেন না। এখানেও স্রষ্টার স্বাধীনতাই স্বীকার করা হল। এখনকার উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, মহৎ রাষ্ট্রশাসককে কেউ ট্রাজেডির নায়ক হিসেবে দেখতে পারে, আবার কেউ করে তুলতে পারে কার্টুনের বিষয়বস্তু। এখানে উন্নত বা লঘু করে দেখানোরই ব্যাপার।

৩· ৭—৮ অধ্যায়ে অনুকরণের বিষয়কে একটি Form বা সংগঠনের অধীন করার কথা বলা হয়েছে। অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও অবয়বহীন বিষয়বস্তুর উপর যখন অবযব বা Structure আরোপ করা হয়, তখন তা আর নিছক অনুকরণ থাকে না। তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়, আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে আনা হয়, বৃহৎ ঘটনাকে গৌণ এবং গৌণ ঘটনাকে বৃহৎ করে দেখানো হয়, ঘটনাকে গ্রহণ এবং বর্জন করা হয়। এই সব স্বাধীনতা নিলেই এলোমেলো পুঞ্জীভূত ঘটনাতে আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি আনা যায়, আর অংশ ও অঙ্গগুলিকে কার্যকারণ ও অনিবার্যতার সূত্রে বাঁধা যায়। অ্যারিস্টটল প্রার্থিত organic form-এর শর্ত মানতে হলে এই সব স্বাধীনতা শিল্পীকে নিতেই হবে।

৪· অনুকরণের এই ব্যাপকতর ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড়ো সমর্থন পাই ৯ অধ্যায়ে। এখানেই তিনি বলছেন, ইতিহাস অনুকরণ করে what has happened-এর, আর কবিতা অনুকরণ করে what may happen অর্থাৎ কার্যকারণ ও বিশ্বাস্যতার সূত্র অনুযায়ী যা সম্ভব তার। তাই কবিতাকে তিনি 'a more philosophical and a higher thing than history বলে ঘোষণা করেছেন। তার কারণ "poetry tends to express the universal, history the particular." অনুকরণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ যদি অ্যারিস্টটলের অভিপ্রেত হবে, তাহলে ইতিহাসের চেয়ে কবিতাকে উঁচু সম্মান কেন দেবেন তিনি? ইতিহাস তো ঘটনার অনেক বিশ্বস্ত অনুকরণ—ঘটনা যেভাবে ঘটছে, যেরকম গুরুত্ব পাচ্ছে ঠিক সেই ক্রমে সেই গুরুত্বে তাকে বিন্যাস করতে হবে। কবির অনুকরণ তো অনেক বেশি স্বাধীন। অয়দিপৌস বা ঈডিপাসের ইতিহাস এবং তাকে নিয়ে লেখা নাটক—এ দুয়ের তুলনা করলেই বোঝা যাবে কোনটি আক্ষরিক অর্থে অনুকরণ। অবশ্য ইতিহাসও যে আক্ষরিক অনুকরণ হতে পারে না, আউয়েরবাখ তা বারবার বলেছেন। কিন্তু কবিতার চেয়ে তার বিষয়-নিষ্ঠা সব সময়েই বেশি। তা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল কবিতাকেই বেশি মূল্য দিচ্ছেন।

৫· এই অধ্যায়েই চূড়ান্ত এবং মোক্ষম কথাটি বলছেন এ সম্বন্ধে। আগাথন নামক ট্রাজেডিকারের 'আনথেউস' নাটকটি সম্বন্ধে বলছেন, তার ঘটনা এবং চরিত্র,—সবই ছিল কল্পিত, 'and yet they give nonetheless pleasure' তা হলে যা কোনো অর্থেই অনুকরণ নয়, অর্থাৎ পুরোটাই কল্পিত, তাও 'অনুকরণ' বলে গণ্য হচ্ছে, এবং তা আনন্দদায়কও হতে পারছে। অনুকরণের সংকীর্ণ আক্ষরিক অর্থ ধরলে এ কথা বলা অ্যারিস্টটলের পক্ষে সম্ভব হত কি?

অর্থাৎ, বাইরে কোথাও যাবার দরকার নেই, কোনো পণ্ডিতের শরণাপন্ন হওয়ারও কিছু নেই—পোয়েটিকস্ বইটি থেকেই অজস্র প্রমাণ ও ইংগিত উদ্ধার করা যায় যার সাহায্যে বোঝা যায় অনুকরণ বলতে অ্যারিস্টটল কখনোই আলোকচিত্রধর্মী নকলের কথা বলেননি।

৭· শিল্পের নানা শ্রেণী : শ্রেণীবিভাগের মাপকাঠি

অনুকরণ=শিল্প, প্রায় এই সমীকরণটি নির্দেশ করলেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু অনুকরণ তো শিল্পের সাধারণ লক্ষণ—বিশেষ বিশেষ শিল্প আমরা চিনব কী করে? শিল্পের শাখাপ্রশাখা ভাগ হবে কিসের ভিত্তিতে? এই উদ্দেশ্যে অ্যারিস্টটল তিনটি মাত্রা বা মাপকাঠি গড়ে তুললেন—

১· অনুকরণের বাহন (medium of imitation)

২· অনুকরণের বিষয় (object of imitation) এবং

৩· অনুকরণের প্রকার (manner of imitation)

প্রথম তিনটি অধ্যায়ে এই তিনটি মাত্রার সাহায্যেই শিল্পের শ্রেণীবিভাগ এবং উপবিভাগ করেছেন অ্যারিস্টটল।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ঐ তিনটি মাত্রাকে এইভাবে সাজাই :

অনুকরণের বাহন
অনুকরণের প্রকার
অনুকরণের বিষয়।

কারণ আর কিছুই না, শিল্পের বড়ো বিভাগ থেকে ছোটো বিভাগে যেতে হলে অ্যারিস্টটলের ক্রম অনুযায়ী মাত্রাগুলিকে সাজালে চলবে না। অনুকরণের বাহন অনুযায়ী আমরা চিত্রকলা, সাহিত্য, বাঁশির ও বীণার সংগীত, নৃত্যকলা ইত্যাদি প্রধান-প্রধান শিল্পগুলিকে পাই। এর ফর্মুলা হল : ভিন্ন বাহন, কাজেই ভিন্ন শিল্প। চিত্রকলার বাহন রং ও রূপ (colour and form), কাব্য বা সাহিত্যের বাহন ভাষা ও ছন্দ, মেষপালকের বাঁশি ও বীণার সংগীতের বাহন সুর ('হারমনি') ও তাল।

কিন্তু যদি আরো সূক্ষ্ম ভাগ চাই? তাহলে এবার শরণ নিতে হবে অন্য একটি মাত্রার—অনুকরণের প্রকার বা প্রকরণের। ধরা যাক কাব্য বা সাহিত্য। প্রধানত দুটি প্রকারে সাহিত্য পরিবেষিত হতে পারে। এক শ্রেণীর কাব্য গায়ক বা চারণ বর্ণনা করে, আবৃত্তি করে। তাতে যে ঘটনার কথা লেখা তা শ্রোতারা চোখে দেখে না। আরেকশ্রেণীর কাব্য সামনে অভিনয় করে ঘটিয়ে দেখানো হয়। সেখানে দর্শকেরা কাব্যের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখছে। তাহলে আবৃত্তি বা narration-এর প্রকরণের ফলে সাহিত্যের একটি ভাগ তৈরি হল, যাকে নিছক কাব্য বলতে পারি। তা শ্রুতিগ্রাহ্য। অন্যদিকে ঐ অভিনয় বা representation-এর প্রকরণ সাহিত্যের আরেকটি ভাগ নির্দেশ করল—তার নাম নাটক। শিল্পের বড়ো ভাগ সাহিত্যের দুটি উপবিভাগ পাওয়া গেল—কাব্য আর নাটক। ঐ 'প্রকার'-এর মাত্রাটির সহায়তায়।

যদি আরো সূক্ষ্ম ভাগ করতে চাই? তাহলে আমাদের সাজানো' অনুযায়ী ঐ শেষ মাত্রাটির সাহায্য নিতে হবে। এবার বিষয়বস্তু বলে দেবে নাটকের মধ্যে আবার কোন্‌টা ট্র্যাজেডি, কোন্‌টা কমেডি। মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তু ট্র্যাজেডির উপাদান, লঘু বিষয়বস্তু কমেডির।

এইভাবে সামগ্রিক ও নির্বিশেষ শিল্প থেকে বিশেষ শিল্পে, এবং বিশেষ শিল্প থেকে তার শাখাপ্রশাখায় পৌঁছোবার উপায় নির্দেশ করেছেন অ্যারিস্টটল। নিচের ছকটি থেকে সেই অগ্রগতিটি বোঝা যাবে ঃ

শিল্প = অনুকরণ

অনুকরণের বাহন ঃ বিভিন্ন শিল্প	অনুকরণের প্রকার	অনুকরণের বিষয়বস্তু
রং ও রূপ ঃ চিত্রকলা		
সুর ও তাল ঃ সংগীত		
শুধু তাল ঃ নৃত্যকলা		
ভাষা ও ছন্দ ঃ কাব্য বা সাহিত্য	আবৃত্তি ঃ বর্ণনকাব্য	
	অভিনয় ঃ নাটক	মহৎ ও উন্নত ঃ ট্র্যাজেডি
		লঘু ঃ কমেডি

৮· শিল্পের লক্ষ্য

শিল্পের লক্ষ্য যে আনন্দ, তা অ্যারিস্টটল বারবার বলেছেন। প্লেটোর সঙ্গে এখানে তাঁর বড়ো বিরোধ। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে প্রত্যেক শিল্পের

উপভোগের আনন্দ (proper pleasure) আলাদা। এই আনন্দের উৎস একদিক থেকে অনুকরণ, কারণ অনুকরণ (কফম্যান এর অর্থ করছেন অভিনয় বা ভান করা—pretending) স্বভাবতই আনন্দদায়ক। কিন্তু ট্রাজেডির ক্যাথারসিসের ফলে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়, তার উৎস আলাদা। এ নিয়ে তর্কের মীমাংসা হয়নি, ফলে আমরাও তা পরিহার করব। কিন্তু শিল্প উপভোগের বিষয়—এই ধারণা থেকে পরবর্তী Art's for art's sake-এর বিশ্বাসের পূর্বাভাস উদ্ধার করা কঠিন কাজ নয়।

১· উপসংহার

শিল্প সম্বন্ধে এগুলিই অ্যারিস্টটলের মূল কথা। তবে তাঁর ট্রাজেডি সম্বন্ধে নানা সিদ্ধান্তকে সম্প্রসারিত করে আরো দুচারটে কথাও যে বার করে আনা যায় না তা নয়। যেমন শিল্পের আয়তন কী হবে, তার দেহে কত ধরনের ঐক্য থাকা দরকার ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁর ইতস্তত কথা আছে। সেগুলি খুব স্পষ্ট নয়, কোথাও কোথাও স্ববিরোধও আছে। যেমন ৭ অধ্যায়ে অনুকরণের আকৃতি ক্ষুদ্র হলে চলবে না বলে ফতোয়া দিয়েছেন, আবার ২৬ অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন বলে ট্রাজেডিকে মহাকাব্যের তুলনায় শ্রেয় বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ঐক্য সম্বন্ধে ধারণাকে পরবর্তী হোরেস প্রভৃতিরা যতটা ফাঁপিয়ে তুলেছেন তিনি নিজে অতটা জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে মনে হয় না। কারণ সোফোক্লেসের 'আইয়স' থেকে শুরু করে অসংখ্য গ্রীক নাটক তাঁর ঐক্যের ধারণাকে লঙ্ঘন করছে। এ নিয়ে কিছু মীমাংসা করা কঠিন। আমরা তাই সহজবুদ্ধির অনুগামী হয়ে শিল্প-বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মূল ও প্রধান কথাগুলিই কেবল এখানে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি।

কার্ল মার্কসের মতবাদ ও শিল্পতত্ত্ব

হীরেন ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

মার্কসের মতবাদের সারবস্তু কী? এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় সবচেয়ে সংক্ষেপে দিয়েছেন এঙ্গেলস। কার্ল মার্কসের সমাধি পাশে বক্তৃতায় তিনি বলেছেন—"ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম।"

ইতিহাসকে মার্কস একটি বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। সেই দর্শন হল ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শনের আলোকে তিনি দেখিয়েছেন—ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি মহাপুরুষদের ইচ্ছা নয়, মূল চালিকাশক্তি 'সমাজের অর্থনীতিক উৎপাদন' নামক বস্তুগত শক্তি। আর সেই শক্তিতে মানবেতিহাস যে গতিশীল হয়ে উঠেছে তার কারণ সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। মার্কসবাদ কোন পূর্ণাঙ্গ শিল্পতত্ত্বালোচনা না হলেও দেখা যায় পরবর্তীকালে শিল্পতত্ত্বের জগতে 'মার্কসবাদী শিক্ষাতত্ত্ব' বলে একটি শিল্পতত্ত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে। দেখা যায় সুসম্বাদ মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব রচনায় এগিয়ে এসেছেন প্লেখানভ, ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল, জর্জ টমসন, আর্ণস্ট ফিশার, আর্ণলড্ কেটল, জর্জ লুকাচ প্রমুখ পন্ডিতেরা।

কিন্তু এই মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব বিনাযুদ্ধে স্বীকৃতি লাভ করেনি। যে মার্কসবাদ মূলতঃ ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি বা দার্শনিকতত্ত্ব শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে স্বীকার করে নিতে অনেকেই আপত্তি তুললেন। ট্রট্স্কিবাদীরা বিশেষভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, "The methods of Marxism are not the methods of art," কিন্তু সমস্ত বিতর্কজাল ভেদ করে বর্তমানে শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রেও মার্কসবাদ আত্ম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

মার্কসবাদী দর্শনকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববীক্ষা হিসাবে দেখলে শিল্পের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা গ্রহণের কারণ নির্ধারণ করা সহজ হয়ে যায়।

শিল্পতত্ত্বের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালেই চোখে পড়বে, মানুষের শিল্পমতবাদ পুরাকাল থেকে ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। যুগে যুগে তার নানা বদল ঘটেছে। অনুকৃতিবাদ, কল্পনাবাদ, রূপকৈবল্যবাদ, ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্য দিয়ে শিল্পতত্ত্বের অগ্রগতি ঘটেছে। অন্য দিকে দেখা যায় মানুষের দর্শন চর্চাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব ও বিলয় ঘটেছে। এক্ষেত্রে দর্শন এবং শিল্পতত্ত্ব উভয়ের যুগপৎ বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে প্রত্যেক যুগেই দার্শনিক মতবাদের বদলের সঙ্গে শিল্পতত্ত্বেও কিছু কিছু বদল ঘটেছে। কথাটাকে অন্যভাবে বললে, বলা যায়, প্রত্যেক যুগের সামাজিক বস্তুগত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সে যুগের দার্শনিক ও শিল্পগত মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে দাস প্রথার উপর যখন সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখনি এরিস্টটলের দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে, যে দার্শনিক মতে "the institution of slavery was decreed by nature, since some men were born slaves."

আবার সামন্ত সমাজের পূর্ণ বিকশিত দিনগুলিতে যখন অভিজাত পরিবৃত রাজাই ছিলেন শাসনক্ষমতার শীর্ষে তখনি দেখা যায় মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক টমাস এ্যাকুইনাস-এর উদ্ভব ঘটেছে, যিনি তাঁর দার্শনিক মতে শ্রেষ্ঠতম দেবদূত পরিবৃত ঈশ্বরের কল্পনা উপস্থিত করেছেন।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ/পঞ্চম শতকে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল—'আর্ট ইজ দি কপি অব দি কপি'—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা প্লেটোর দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই অনুসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। প্লেটোর দার্শনিক মত ছিল—জগৎটা পরমসত্তার প্রতিভাস মাত্র। কাজেই লজিকের ফর্মায় ফেললে কথাটা এই দাঁড়ায় যে পরমসত্তার প্রতিভাস হল জগৎ, আর জগতের প্রতিভাস হল শিল্প, কাজেই শিল্প আসলে বস্তুর অনুকরণের অনুকরণ। প্লেটোর দার্শনিক ভাববাদের মূল বিষয় হল—ডিভাইনিটি, কাজেই তাঁর শিল্পসিদ্ধান্তেও শিল্পসৃষ্টির মূল উৎস হল "ডিভাইন ম্যাডনেস্।" পরবর্তীকালে দেখা গেল এই শিল্পসিদ্ধান্তেরও কিছুটা বদল ঘটেছে। সেখানেও শিল্পকে অনুকৃতিই বলা হয়েছে কিন্তু তার উৎস সম্পর্কে দেখা গেল প্লেটোর মত বাতিল হয়ে গেছে। সেকালে শিল্পের উৎস হিসাবে "ডিভাইন ম্যাডনেস্"-এর বদলে বাস্তব মানুষের ইনসটিঙ্কট এবং বোধবৃত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতি সেকালের দিকপাল দার্শনিক এরিস্টটলের দার্শনিক মতেরই প্রতিফলন। এরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকসে' বলেছেন, "The poet being an imitator, like a painter or any other artist, must of necessity imitate one of three objects--things as they

were or are, things as they are said or thought to be, or things as they ought to be," এই যে 'থিঙ্‌স্‌ অ্যাজ দে অট টু বি'-এর কল্পনা মানুষ শুধুমাত্র ভাবোন্মাদনা বা ডিভাইন ম্যাডনেস-এর সাহায্যে করতে পারে না। যে বস্তু আছে তার সম্ভাব্য বিকাশটি কি হতে পারে তার কল্পনার জন্য মানুষের "ডিডাক্‌টিভ" বুদ্ধির প্রয়োজন। কাজেই কবি বা শিল্পীর কর্তব্যের মধ্যে 'থিঙ্‌স্‌ অ্যাজ দে অট টু বি'-এর স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই হল শিল্পের উৎস হিসাবে মানুষের বোধবৃত্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া। শিল্পের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি এরিস্টটলের দার্শনিক প্রতীতীরই প্রতিফলন। এরিস্টটল প্লেটোর মত বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রভাববাদী ছিলেন না। তাঁর দার্শনিক মতবাদে প্লেটোর ভাববাদের সঙ্গে পূর্বতন দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের জড়বাদও কিছু এসে মিশেছিল। কাজেই তাঁর শিল্প সিদ্ধান্তেও দেখা যায়, এরিস্টটল প্লেটোর পরম সত্তার নিরাকরণ করলেন না অথচ শিল্পের উৎস হিসাবে মানবিক বোধবৃত্তিকে স্বীকার করে নিলেন। ডেমোক্রিটাস ছাড়াও গ্রীসের প্রথম যুগের জড়বাদী দার্শনিকদের অন্যতম হেরাক্লিটাসের প্রভাবও সম্ভবত এরিস্টটলের দর্শনের উপর পড়েছিল। হেরাক্লিটাসকে 'ফার্স্ট ডায়ালেক্‌টিক্যাল ফিলজফার' বলে অভিহিত করা হয়। প্রমাণিত যে 'বৈপরীত্যের সংঘাত' সম্বন্ধে হেরাক্লিটাসের ধারণা ছিল। তাই শিল্প ক্ষেত্রে এরিস্টটল যে "প্রবেবল্‌ ইমপ্রবেবিলিটির" বৈপরীত্য ও সমন্বয়ের কথা বলেছেন তা স্বভাবতই হেরাক্লিটাসের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়।

যুগে যুগে শিল্পতত্ত্ব তার কালের প্রধান দার্শনিক মতের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে, মার্কসবাদী দর্শন 'ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে'র উপর ভিত্তি করে যে 'মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব' নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তা কিছু বিচিত্র নয়।

॥ ২ ॥

মার্কসবাদের আবির্ভাবের পরে দার্শনিক জগৎ মোটামুটি তিনটি মতে বিভক্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তিনটি মত হচ্ছে—যান্ত্রিক জড়বাদ বা 'মেকানিক্যাল মেটেরিয়ালিজম', ভাববাদ বা 'আইডিয়ালিজম' এবং ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা 'হিস্টোরিক্যাল এ্যান্ড ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম'। স্বভাবতই এই তিন দার্শনিক মতের অনুসারী শিল্পতত্ত্বও আছে।

যান্ত্রিক জড়বাদ, দর্শনের ক্ষেত্রে অবজেক্ট বা বিষয়কে, সাবজেক্ট বা বিষয়ী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে, তাই দেখা যায়, যান্ত্রিক জড়বাদী শিল্পতত্ত্ব

শিল্পের বিষয়কে শিল্পী থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেছে। তার ফল হয়েছে বিশুদ্ধ আঙ্গিকবাদ বা ফরমালিজম্, এই বিশুদ্ধ আঙ্গিকবাদ শেষ পর্যন্ত "শিল্পই শিল্পের লক্ষ্য" এই মতবাদে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

অন্যপক্ষে ভাববাদী দার্শনিকেরা, যান্ত্রিক জড়বাদীদের বিপরীতে সাবজেক্ট বা বিষয়ীকে অবজেক্ট বা বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। কাজেই ভাববাদী শিল্পতাত্ত্বিকেরাও সেই অনুসারে বিষয়টাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়ীর বা শিল্পীর এবং ভোক্তার আবেগ-অনুভূতিকেই চরম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে এই মতানুযায়ী শেষপর্যন্ত শিল্পের আস্বাদনই শিল্পের চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" এরই নামান্তর।

এই উভয় দর্শনানুগ শিল্প-সিদ্ধান্তের একটি জায়গায় মিল দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো, উভয়েই শেষ পর্যন্ত সমাজ থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর।

যান্ত্রিক জড়বাদী সিদ্ধান্ত—"শিল্পই শিল্পের লক্ষ্য" আর ভাববাদী সিদ্ধান্ত—"শিল্পের জন্যই শিল্প"-মূলতঃ একই কথার এপিঠ ওপিঠ। উভয়েরই শেষ সিদ্ধান্ত,—শিল্পের লক্ষ্য সমাজ নয়, শিল্প নিজেই নিজের লক্ষ্য।

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত যে, উপরে দুই দর্শন ও শিল্পতত্ত্বের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তাতে মনে হতে পারে যে এই দুই শ্রেণীর শিল্পতাত্ত্বিক প্রথম থেকেই শিল্পকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা মনে করলে ভুল হবে। ভুল হবে এই জন্যে যে এইরকম সরলীকৃত সিদ্ধান্ত উক্ত দর্শন এবং শিল্পতত্ত্বকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখাতে ব্যর্থ হবে। একটা দর্শন বা তদানুগ শিল্পতত্ত্ব প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠবার পর কালে কালে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে একটা প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে, চলতে চলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার মধ্যেও নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। এখানে আগে যে সরলীকৃতভাবে দুই দর্শনের সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে, তা, শেষ পর্যন্ত এদের মোট সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ায় সেই কথাটা বোঝাবার জন্যই।

একেবারে গোড়াতেই বলেছি যে সমাজের বস্তুগত অবস্থাই বিভিন্ন দর্শনের জনক। তাই দেখা যায় একেকটি সামাজিক অবস্থায় যান্ত্রিক জড়বাদী বা ভাববাদীরা নিজেদের মূল অস্তিত্ব গূঢ়ভাবে বজায় রেখেই একেক রকমের কথা বলেছেন। শেষপর্যন্ত এই সকল দার্শনিক শিল্পের ব্যাপারে "এইম ইন্ ইটসেল্ফ"-এর তত্ত্ব ঘোষণা করে শিল্পকে সমাজনিরোপেক্ষ রূপদান করার চেষ্টা করলেও দেখা যায় বিভিন্ন যুগে এদের নিজের মধ্যে নানা মতান্তর ঘটেছে। শুধু নিজেদের কেন, এমনও দেখা গেছে একজন শিল্পী

নিজেই নিজের মত খণ্ডন করেছেন। যেমন বদ্‌লেয়ার। এককালে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন—"শিল্প হবে পুরোপুরি স্বশাসিত।" আবার ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে তিনিই ঘোষণা করলেন—"শিল্পের জন্য শিল্প ব্যাপারটা শিশুসুলভ।" আর সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করলেন যে "শিল্পের একটা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে।" অথচ এই সময়ে যে বদ্‌লেয়ার তাঁর জীবনদর্শন পাল্টেছেন এমন খবর জানা নেই।

আর এ শুধু বিদেশেই নয়। আমাদের দেশেও একই দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর আলংকারিকদের মধ্যে শিল্পের সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে রীতিমত উষ্ণ বিতণ্ডার উদাহরণ আছে। যেমন, একই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর একদল আলংকারিক বলেছেন—কাব্য সমাজকে—কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে—"রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" - রামের মত হও, রাবণের মত নয় (অতুল গুপ্তের কাব্য জিজ্ঞাসা থেকে নেওয়া)। সেই সঙ্গে অবশ্য তাঁরা একথাও বলেছেন যে কাব্য যে সমাজকে উপদেশ দেবে তা শুষ্ক শাস্ত্রোপদেশ নয়, তা হবে—"কান্তা সম্মিততযোপ-দেশঃ"—অর্থাৎ কান্তার উপদেশের মত সরস। আবার 'দশরূপকের' আলং-কারিক ধনঞ্জয় এই মতের প্রতিবাদে শ্লেষের সুরে বলেছেন—"আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলকেও যারা ইতিহাস প্রভৃতির মত সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তিমাত্র বলেন সেই সব অল্প বুদ্ধি সাধু লোকদের নমস্কার।" কাজেই সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে যে একই দর্শনে বিশ্বাসী হয়েও সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে শিল্পতত্ত্ববিদদের মতের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু এই ভিন্নতা আসলে দ্বিধা ও কৌশলগত। কারণ সবাই শেষ পর্যন্ত 'রসবাদী' হয়েই উঠেছেন। আর 'রস'কে তাঁরা "ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ" বলে ঘোষণা করে যখন বলেন—যে এই ব্রহ্মস্বাদসহোরঃ রস—"বিষয়ান্তর নিরপেক্ষ", তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকাকে অস্বীকারই করেন। কারণ তাঁরা বলেছেন--শিল্প রস-সৃষ্টি করে, আর রসের স্বরূপ হচ্ছে ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ। অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের (বা প্লেটোর সেই "এ্যাবসলিউট এর) আস্বাদ করলে মন যেখানে উত্তীর্ণ হয়, রসের আস্বাদেও মন সেখানেই উত্তীর্ণ হয়। কাজেই রস 'বিষয়ান্তর নিরপেক্ষ'। অর্থাৎ শিল্পের সামাজিক কোন ভূমিকা নেই। প্রাচীন আলং-কারিকদের যে দল শিল্পের সামাজিক ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন তার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের রীতিমত অভাব আছে। অর্থাৎ শিল্পের সামাজিক ভূমিকাকে বাধ্য হয়ে মুখে স্বীকার করলেও অন্তরে তা তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। এ বিষয়ে আলংকারিক শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয় বলেছেন—"কাব্যরসের এই ফলশ্রুতি যে আলংকারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোষের কথা তার প্রমাণ ওসব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই

আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তার লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না।" (কাব্য জিজ্ঞাসা)

যাই হোক, মোট কথা এইটে দেখা যাচ্ছে যে, জড়বাদীই হোন আর ভাববাদীই হোন, যাঁরা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট বা বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সূচনা করেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিল্পকেও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

ঠিক এই সাবজেক্ট অবজেক্ট সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেই মার্কসীয় 'ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' পূর্বতন যে কোন বিশ্ববীক্ষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে শিল্পতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার কডওয়েলের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় তা উদ্ধৃতি করছি ". . . . . in materialism the object had been separated from the subject and regarded contemplatively, while in idealism the subject had certainly been considered actively but active on a nothing, on mere appearance. Marx's realisation of this led to the conception of the subject-object relation as an active one—man's theory as the outcome of practice on the object, 'sensing as sensing something'. Theory was seen to be generated by the struggle of man the subject, with nature the object"— এখানেই অন্যান্য দর্শন থেকে মার্কসবাদী দর্শন আর সেই সঙ্গে তার শিল্পতত্ত্ব পৃথক হয়ে গেছে।

॥ ৩ ॥

মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের সবটাই দাঁড়িয়ে আছে—এই অবজেক্ট ও সাবজেক্ট, থিওরি ও প্র্যাকটিস-এর সঠিক উপলব্ধি থেকে জাত 'ভিত্তি ও উপরিতলের' তত্ত্বের উপর। মার্কসের মতে চেতন্যও আছে, বস্তুও আছে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্কও আছে! কিন্তু প্রাথমিকভাবে বস্তুই চৈতন্যের নিয়ন্তা। বস্তুই ভিত্তি, চৈতন্য উপরিতল। মার্কসের কথায় "মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

মানুষ তার সত্তা রক্ষার জন্য, বাঁচার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় ও উৎপাদন করে। উৎপাদন করতে গিয়ে সে তার চারপাশে যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে—সেই উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কই তার 'ওয়েজ অফ লাইফ' বা জীবনপদ্ধতি নির্ধারণ করে, আর তার জীবন-পদ্ধতিই তার

চিন্তা-চেতনাকে, তার রাজনীতি, আইন, ধর্ম, দর্শন, নন্দন প্রভৃতি ভাবাদর্শ-গত দিককে আকৃতি দান করে। এইটেই মোটামুটি অতি সংক্ষেপে মার্কসের ভিত্তি ও উপরিতলের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পতত্ত্বও বলে যে মানুষের শিল্পও যেহেতু একটি 'ফর্ম অব কনসাসনেস' বা চেতনারই রূপবিশেষ এবং যেহেতু চিন্তা-চেতনা মূলতঃ মানুষের উৎপাদন-ভিত্তিরই অবদান সেই হেতু শিল্পও একটি সামাজিক অবদান। শিল্পের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অতি নিবিড় কারণ শিল্প সমাজ থেকেই উদ্ভূত।

ভাববাদীরা এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন যে এই মতবাদ মানুষের মনন, চিন্তা ও শিল্পচেতনার সৃজনশীল ভূমিকাকে খর্ব করেছে। কারণ এই মতে বস্তুর উপর নির্ভরশীল চেতনার ভূমিকা "প্যাসিভ" বা নিষ্ক্রিয়। বলা বাহুল্য অভিযোগটি সত্য নয়। সত্য নয় এই জন্য যে এঙ্গেলস নিজেই বলেছেন—"রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশ ধারা অর্থনৈতিক বিকাশ ধারার উপরেই ভিত্তিশীল, কিন্তু এরা সকলেই পরস্পরের উপরে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। একথা ঠিক নয় যে অর্থনৈতিক অবস্থানই একমাত্র কারণ এবং একাই সক্রিয় আর বাকী সব কিছুতেই রয়েছে কেবল নিষ্ক্রিয় প্রভাব।" এখানে অবশ্যই প্রশ্ন ওঠে যে তাই যদি হয় তবে মার্কস কেন বলেন যে বস্তুই চৈতন্যের নিয়ন্তা? ক্ষেত্র বিশেষে তো দেখা যাচ্ছে যে চৈতন্যও বস্তুর পরিবর্তন সাধন করছে? এর উত্তরে এঙ্গেলস বলেছেন, "অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে, আর এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।"

এর পরেও ভাববাদীরা প্রশ্ন তোলেন যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই বুঝলাম, কিন্তু যদি বলা হয় যে অর্থনীতি যেমন চিন্তা বা মননকে প্রভাবিত করে, চিন্তা বা মননও তেমনি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তবে তো দুটোই সম-পর্যায়ের। আর তা যদি হয় তো কেন কার্যকারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বস্তুকে কারণ চেতনা কার্য বলে উল্লেখ করা হচ্ছে?

একথা আগেই বলেছি যে মার্কসবাদী স্বীকার করেন—চেতনা আছে, বস্তুও আছে। মার্কস বস্তুবাদী বলে চেতনাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেন নি। বরং একশ্রেণীর ভাববাদীই বস্তুকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে শুধু চেতনাকেই স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন—"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা"। মার্কস এরকম একপেশে কোন মত পোষণ করেন নি। তিনি বস্তুবাদী হিসাবে চৈতন্য এবং বস্তুর মধ্যে বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন বস্তু থেকেই তার গুণ রূপে চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে। মার্কস যে প্রক্রিয়ার কথা বলেন, তা

হল এই যে বস্তু থেকে আসে বস্তুর জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান আমাদের এমন কর্মে প্রবৃত্তি দেয় যে কর্মের সাহায্যে আমরা বস্তুকে পরিবর্তিত করি। যেমন লোহা নামক বস্তু থেকেই কামার প্রাথমিকভাবে লোহা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং সেই লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই পরে সে লোহার আকৃতি পরিবর্তিত করে। এই প্রক্রিয়াটা সমাজের ক্ষেত্রেও ঘটে। সমাজ থেকেই সমাজের জ্ঞান মানুষ লাভ করে এবং সেই লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই সে সমাজকে পরিবর্তন করে। কিন্তু লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে বস্তুকে পরিবর্তিত করে তা কখনই বস্তুর নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে করতে পারে না, বস্তুর নিয়মকে মেনেই তা করতে পারে। এইখানেই বস্তুর প্রাধান্য। বস্তুর বন্ধনের মধ্যে থেকেই বস্তু-লব্ধ জ্ঞান বস্তুকে পরিবর্তিত করে। লৌহ নামক বস্তু প্রকৃতির আইনেই জলে ভাসে না, কিন্তু মানুষে জাহাজ নামক লৌহ-বস্তুকে যে জলে ভাসিয়েছে তা লোহা বা জলের নিয়মকে ভঙ্গ করে নয়, বরং সে নিয়মকে মেনেই ভাসাতে পেরেছে। এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া। একে হঠাৎ সবলীকৃত কার্য-কারণের ফর্মায় ফেলে বিচার করলে তার সত্যকে পাওয়া যাবে না।

এই ভিত্তি এবং উপরিতলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শিল্পের মধ্যেও কার্যকর।

এ বিষয়ে প্লেখানভই প্রথম শিল্পতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি, শিল্পের উৎস যে সমাজ তার বিস্তারিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বুচারকে প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে তিনি তাঁর যুক্তি ও প্রমাণ হাজির করেছেন। উৎপাদনের সামাজিক ভিত্তি থেকেই যে শিল্পের উদ্ভব বুচার তা অস্বীকার করেছেন। বুচার বলেছেন উৎপাদন ব্যবস্থার উৎস থেকে শিল্পের উদ্ভব ঘটেনি। তার কারণ,--বুচারের মতে "শিল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের চেয়ে পুরোনো।" এক্ষেত্রে বুচার ঘোড়ার আগে গাড়ী জুতে দিয়ে বলেছেন যে—বরং শিল্প থেকেই সামাজিক উৎপাদনের সূচনা হয়েছে। বুচারের এ মত ভ্রান্ত। প্লেখানভ বলেছেন যে, সামাজিক উৎপাদন থেকেই যে শিল্পের উদ্ভব ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে আদিম মানবের গুহাচিত্রে। আদিম মানব গুহাগাত্রে শিকারের ছবি এঁকে তারপরে শিকারে প্রবৃত্ত হয় নি, বরং গুহাচিত্রগুলি বাস্তব শিকারেরই প্রতিফলন। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, আদিম মানবের নৃত্যগুলি প্রাথমিক স্তরে উৎপাদনমূলক শ্রমেরই অনুকৃতি। এসব নানা তথ্যের অবতারণা করে তিনি শেষে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেনঃ—"আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আদিম শিল্পকলার ইতিহাস আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে যদি না আমরা একথা বুঝতে পারি যে কাজ হল শিল্পকলার চেয়ে প্রাচীন এবং সাধারণভাবে মানুষ প্রথমে প্রয়োজনের দৃষ্টিতেই বস্তু এবং বিষয়ের

প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং পরে সৌন্দর্যতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির সম্পর্কে বিবেচনা করতে শুরু করে।"

আদৌ মার্কসবাদী নন, এমন বড় কবি আছেন যাঁরা একইকালে একদিকে শিল্পকে নিয়ে সমাজ থেকে উর্ধে উঠে যাবার বাসনা প্রকাশ করেছেন আবার অন্য দিকে শিল্পের উৎস হিসাবে এই বস্তুজগৎটাকে, এই মানব সমাজটাকেই আন্তরিকভাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেনঃ—

লেখা আর আঁকা
তব মনোবিহঙ্গের
এই দুটি পাখা
ধরণীর ধূলিপথ তপ্ত হয় হোক্
আকাশে রহিল মুক্ত তব মুক্তিলোক!

কবি সামাজিক সংঘর্ষে তপ্ত পৃথিবী থেকে শিল্পের পাখা মেলে দূরে চলে যেতে চাইছেন। সমাজ থেকে শিল্পকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাসনা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে এই রবীন্দ্রনাথই অন্যদিকে একথা অস্বীকার করেন নি যে শিল্প তার রসদ সংগ্রহ করে এই তপ্ত সমাজ ভূমি থেকেই। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি মনে করে দেখুন—যেখানে তিনি বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করেছেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি।
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?

শ্রীরাধার ইমেজ যা আজ সমাজ মানসে অঙ্কিত তার মূল উৎস কোনটা? চৈতন্যরূপিণী হ্লাদিণীশক্তি সমাজে এসে উপস্থিত হয়েছেন? নাকি সমাজ থেকেই হ্লাদিণীর ধারণার উদ্ভব হয়েছিল? চৈতন্য বস্তুরূপ ধারণ করেনি। বরং বস্তুরই প্রতিফলন ঘটেছে 'হ্লাদিণী' রূপে—রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নটাকে বিশ্লেষণ করলে এইটেই ধরা পড়ে।

এছাড়া সংস্কৃত রসবাদী আলংকারিকেরাও, কাব্যে যে চিত্র থাকে তার উৎস হিসাবে এই প্রাকৃত সমাজকেই স্বীকার করেছেন। তাঁরা যখন কবিতার 'ঔচিত্য' অনৌচিত্যের প্রশ্নে 'প্রাকৃতত্যৌচিত্তের' কথা বলেন তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরা সমাজকে স্বীকৃতি দেন। রসবাদী পণ্ডিত অতুল গুপ্ত বলেছেন, 'কাব্যের লক্ষ্য রস। রস ভাবের পরিণতি। কিন্তু ভাব নিরালম্ব নয়;

বস্তুকে আশ্রয় করেই জন্মায় ও বেঁচে থাকে।...সুতরাং কাব্যের কথা বস্তু যদি ভাবের প্রাকৃত বস্তুর যথাযথ চিত্র না হয়, তবে রসোবোধের বাধা ঘটে। আলংকারিকেরা একেই বলেছেন 'ভাবৌচিত্য' বা 'প্রাকৃত্যৌচিত্য'।"

এই সব নানা দিক থেকেই দেখা যায় যে, শিল্পকে যাঁরা 'শিল্পের জন্য' বলে সমাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক তাঁরাও কোন না কোন পাকেচক্রে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও সমাজভূমিতেই শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াতে বাধ্য হন। কাজেই আজকের যুগে, শিল্পের উৎস সমাজ কি না এ প্রশ্ন আর 'বার্ণিং' নয়। এ যুগে মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে অন্য দিক থেকে।

আজকের প্রশ্নটা কি? সেটা সবচেয়ে ভালভাবে ব্যক্ত করেছেন শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়। তাঁর বক্তব্যঃ

"কাব্য যে মানুষের সভ্যতা-বৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে! এবং যদি রসটানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি বিপর্যয় না ঘটলে, মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাই কেউ মনে ভাবে না।"

অর্থাৎ সমাজের উৎস থেকেই শিল্পের উদ্ভব ঘটেছে একথা সত্য, কিন্তু এর থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে না যে সমাজ থেকে জন্মেছে বলেই শিল্পটা সমাজের জন্য বা শিল্পের লক্ষ্য সমাজ। শিল্পের প্রতি প্রয়োজনবাদের দৃষ্টিভংগী গ্রহণেই এঁদের আপত্তি। শিল্পের সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কেই আপত্তি।

এই আপত্তির মধ্যে দুটো প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে --শিল্প সমাজের কাজে লাগে কি না? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে লাগা উচিত কি না?

মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব দুটো প্রশ্নেরই ইতিবাচক উত্তর দেয়। শিল্প সমাজের কাজে লাগে এবং লাগাটা শুধু উচিতই নয়, লাগাটাই স্বাভাবিক। খুব গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে কলাকৈবল্যবাদের ধ্বনি যে শিল্প ক্ষেত্রে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, তা আসলে সমাজের উপর শিল্পের প্রভাব আছে বলেই ওঠে। শিল্প যদি সমাজের কোন কাজে না লাগত তো এই ধ্বনিটাই উঠত না।

প্লেখানভ একাধিক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে অকাট্য-ভাবেই প্রমাণ করেছেন যে সমাজ পরিবেশ নিয়ে শিল্পীরা যখন বেকায়দায় পড়েন তখনি তাঁরা কলাকৈবল্যবাদের ধ্বনি দেন। প্লেখানভের কথায়ঃ "The belief in art for art's sake arises when artists and people

"keenly interested in art are hopelessly at odds with their social environment."

প্লেখানভ এই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার জন্য পুশকিনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। পুশকিন প্রথম দিকে কলাকৈবল্যবাদী আদৌ ছিলেন না; বরং তিনি মনে করতেন, শিল্প সংগ্রামের হাতিয়ার। এই বিশ্বাস নিয়ে পুশকিন লিখেছিলেনঃ Unhappy nation! Everywhere Men suffer under whips and chains And over all injustice reigns And haughty peers abuse their powers And somber prejudice prevails.

এই পুশকিনই আবার পরের দিকে হঠাৎ কলাকৈবল্যবাদী হয়ে গেলেন এবং লিখলেনঃ

No, not for worldly agitation
Nor worldly greed, nor worldly strife
But for sweet songs, for inspiration
For prayer the poet comes to life.

প্রশ্ন হল, মাঝখানে কি এমন ঘটল যা পুশকিনের মধ্যে এই অভাবনীয় সমাজ নিরপেক্ষতার জন্ম দিল? প্লেখানভ ইতিহাস উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে প্রথম আলেকসান্দারের কালে পুশকিন সমাজের পক্ষে শিল্পগত সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ডিসেম্বরিস্টদের পরাজয়ের পরে. প্রথম নিকোলাসের কালে তিনি বদলে গেলেন, তার কারণ ডিসেম্বরিস্টদের দমনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অগ্রণী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদেরও পাদপ্রদীপের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এতে সমাজের নৈতিক অবনমন ঘটেছিল। সেই সময় প্রথম নিকোলাস ও তাঁর পুলিশ চীফ বেঙ্কেনডর্ফ চেষ্টা করেছিলেন চাপ দিয়ে কবি পুশকিনকে তাঁদের পক্ষে কলম ধরাতে। পুলিশ চীফ আশা করেছিলেন—"আমরা যদি তাঁর কলম ও কণ্ঠস্বরকে পরিচালনা করতে পারি তো সুবিধাই হয়।" এই সময়ে এই সামাজিক পরিস্থিতিতে পুশকিন কলাকৈবল্যবাদে তাঁর বিশ্বাস ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে নিকোলাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তা হলে এ ঘটনার তাৎপর্য কি? 'কলাকৈবল্যবাদী' পুশকিন শিল্প-সাহিত্যকে নিকোলাসের প্রশস্তিতে ব্যবহার করতে চাইলেন না কেন? চাইলেন না তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে তিনি মনে করেছিলেন তাতে তিনি সমাজের ক্ষতি সাধন করবেন। আর এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্প সাহিত্য সমাজকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। আসলে শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিচারে ধরা পড়ে যে 'নান্ কিক্স এ ডেড হর্স'। সমাজের উপর শিল্প-সাহিত্যের যদি কোন প্রভাবই না থাকত তবে শিল্পকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজনই কেউ বোধ করতেন

না। আর তা হলে প্রথম নিকোলাস, চতুর্দশ লুই, প্রথম নেপোলিয়ান, তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রমুখ রাজদণ্ডধারীরাও খামোকা 'শিল্পের জন্য শিল্প'-এর বিরূপ সমালোচনা করতেন না। সেকালে কেন একালেও যে শিল্প-সাহিত্যের উপর মাঝে মাঝে শাসক শ্রেণীর হস্তক্ষেপ ঘটে, তা সমাজের উপর শিল্পের রীতিমত প্রভাব আছে বলেই ঘটে।

সমাজ পরিবর্তনে শিল্পসাহিত্যের ভূমিকা আছে—এই মার্কসবাদী সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কিছু কিছু স্থূল দৃষ্টান্ত যে হাজির করা যায় না তা নয়। ডিকেন্সের 'নিকোলাস নিকোলবি', তদানীন্তন ইংরাজ সমাজের যে পরিবর্তন এনেছিল তার কথা বলা যায়। 'আংকল্ টমস্ কেবিন' দাস প্রথার যে ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল বা আমাদের 'নীলদর্পণ' যে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এসব ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত হাজির করা যায়। কিন্তু এগুলিকে স্থূল উদাহরণ বলছি এই জন্যে, সমাজের ঘটনাবলীর উপর শিল্প সাহিত্যের ফলশ্রুতি অধিকাংশ সময়েই এরকম তাৎক্ষণিক বা আশু এবং প্রত্যক্ষ হয় না। কোন একটি বিশেষ সামাজিক প্রথা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উপন্যাস বা কাব্যের ভূমিকার চেয়েও সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্যের একটি বড় ভূমিকা আছে; যা দীর্ঘকালব্যাপী একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া হিসাবে সক্রিয়।

দর্শন প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন—

"দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে ব্যাখ্যাই করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল তাকে পরিবর্তন করা।" দর্শন হল মানব মনের একটি ভাবাদর্শগত রূপ। তা হলে বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টতঃই মার্কস ভাবাদর্শগতরূপসমূহের সমাজ পরিবতনকারী ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। দর্শন যেমন ভাবাদর্শের একটি বিশেষ রূপ, শিল্পও তেমনি ভাবাদর্শের অন্য একটি রূপ। তাহলে শিল্পেরও সমাজ পরিবর্তনকারী ভূমিকা আছে। কিন্তু শিল্প কিভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই ভূমিকা পালন করে? 'এ কনট্রিবিউসন্ টু দি ক্রিটিক অব দি পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থে মার্কস এক জায়গায় বলেছেন যে, অবিরাম গতি-শীল সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন শক্তি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের, আর নন্দনতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি ভাবাদর্শগত রূপগুলির "মাধ্যমে মানুষ এ সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং লড়াই করে তার নিষ্পত্তি করে।"

একদা খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষ শ্রম ও জ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক নানা বন্ধনকে ছিন্ন করে স্বাধীন হয়েছে এবং খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে উৎপাদকে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরে চলছে নানা স্তরের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই স্তরে শিল্প

কিভাবে সামাজিকভাবে সংঘবন্ধ মানুষের কাজে লেগেছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে জর্জ টমসন বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন মানুষের এই সংগ্রামে শ্রমের ক্ষেত্রে ছন্দ কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ছন্দ মানুষের শ্রম-প্রয়াসে এনেছে ঐক্য, আর এই ঐক্যই তার সাফল্যের চাবিকাঠি। শক্তিশালী প্রকৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সংগ্রামের জন্য মানুষকে তার ইচ্ছা শক্তির মশালকে প্রজ্বলিত করতে হয়েছিল। এই ইচ্ছা শক্তি প্রজ্বলনে সেদিন যে ম্যাজিক এবং মন্ত্র মানুষের সহায় হয়েছিল পরবর্তীকালে কবিতার জন্ম হয়েছিল তা থেকে। ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালকে কবিতার ভিত্তি হিসাবে দেখিয়েছেন জর্জ টমসন। অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ম্যাজিক ও মন্ত্রের সৃষ্টি। যে শত্রু এখনো বিনষ্ট হয়নি, যে ফসল এখনো জন্মায় নি, যে বৃষ্টি এখনো নামে নি—তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় ইন্দ্রজালের প্রক্রিয়ায় ও মন্ত্রে। ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর বিখ্যাত 'বার্থ অব পোয়েট্রি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এই মন্ত্র বা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ আদিতে ঘটেছিল এক প্রকার 'উত্তেজক ভাষা'র মধ্যে, যা সেদিন মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে কর্মে অভিযোজিত করার প্রেরণা সঞ্চার করতো। মানুষ আজ পায়ে পায়ে বহু দূর এসে গেছে। শ্রেণী-সমাজের আবির্ভাবে সমাজ হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর। সেই সংগে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেখা দিয়েছে শ্রমবিভাজন। আর এই শ্রম-বিভাজনের প্রতিফলনে শিল্প-সংস্কৃতির উপরিকাঠামোও বৈচিত্র্যময় হয়ে গেছে। কিন্তু শিল্প আগে যেমন সক্রিয়ভাবে সামাজিক মানুষের প্রবৃত্তি এবং আবেগগুলিকে কর্মে অভিযোজিত করতো আজও পূর্বের চেয়ে অনেক জটিল পরিস্থিতিতে এবং আরো অনেক বেশি জটিল প্রক্রিয়ায় হলেও, তাই করছে। শুধু আগে যা ছিল প্রত্যক্ষ এখন তা হয়েছে অনেক বেশি বেশি মাত্রায় পরোক্ষ। অনেক মার্কসবাদী শিল্পী যে গ্রীক পুরাণের অরফিয়াসের প্রভাবের সংগে বর্তমানের তুলনা করে বলেন ঃ

"The more primitive the society, the stronger was the power of music and of art in general. The more man masters nature, the more progressive his consciousness becomes, the less influence has art on human consciousness." (Hanns Eisler)—

—তা শুধু এই প্রত্যক্ষতার ক্রম অনুপস্থিতি ও পরোক্ষতার ক্রমিক মাত্রা বৃদ্ধির জন্যই বলেন। শুধু প্রবৃত্তি-চালিত মানুষের উপর শিল্প যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে, স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তি এবং তৎসহ সচেতন বোধবৃত্তি চালিত মানুষের উপর সে প্রভাব অন্যভাবে বিস্তার করে।

কডওয়েল শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে শিল্প সামাজিক মানুষের পারিপার্শ্বিক সচেতনতার প্রসার ঘটায় এবং বিকাশ সাধন

করে। মানুষের ইনস্‌টিঙ্ক্‌ট এবং ইমোশান বা প্রবৃত্তি এবং আবেগ তার কর্মের অন্যতম প্রেরণাস্থল। শিল্প এই প্রবৃত্তি এবং আবেগকে তার বাস্তব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে এবং সেই সঙ্গে প্রবৃত্তিও আবেগকে বাস্তব উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে সংগঠিত করে। এইটেই শিল্পের সামাজিক কার্যকারিতা। মার্কস যে বলেছেন ভাবাদর্শগত রূপসমূহের মধ্য থেকে মানুষ তার সমাজ পরিবেশের সংঘাত সম্পর্কে সচেতন হয় এবং লড়াই করে তার নিষ্পত্তি করে; কডওয়েলের বক্তব্যগুলি মার্কসের এই সংক্ষিপ্ত উক্তিরই সবিস্তার ব্যাখ্যা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিল্পের সাহায্যে সামাজিক মানুষের প্রবৃত্তি ও আবেগগুলি যে কর্মে অভিযোজিত হবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে—শিল্পের এই সামাজিক কার্যকারিতার গুণটি, নীলদর্পণ, টমকাকার কুটির প্রভৃতির আশু ও তাৎক্ষণিক ফলপ্রসবী গুণের চেয়েও অনেক বেশি সূক্ষ্ম, জটিল, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এ ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে শিল্প হয়ে উঠেছে এক অতি প্রয়োজনীয় সহায়ক।

॥ ৪ ॥

অগত্যা মার্কসবাদবিরোধীরা প্রতি-আক্রমণ করলেন--মানুষের ওপর শিল্পের প্রভাব আছে ঠিকই কিন্তু সে প্রভাব সমাজের যূথ মানসে নয়, ব্যক্তি মানসে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর "কবিতার শত্রুমিত্র—একটি খোলা চিঠি" নামক রচনায় লিখেছেন—"কিন্তু আমরা এখনো অন্য একটি কথা তুলতে পারি, কোন সাফাই হিসেবে নয়, তথ্য হিসেবে। সভ্যতার সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে শিল্পকলার একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েঃ তার প্রভাব প্রগাঢ় হলেও ব্যাপ্ত নয়, তা কাজ করে ব্যক্তি মানসে, যূথমানসে নয়।"

এই প্রশ্নটাকে মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিকেরা দুই দিক থেকে আলোচনা করেছেন—এই দুই দিক হচ্ছে শিল্পের স্রষ্টার দিক এবং ভোক্তার দিক। দুই দিক থেকে আলোচনা করেছেন এই জন্য যে বিরোধীরা শিল্পের প্রভাবের ক্ষেত্রেই শুধু ব্যক্তিমানসের কথা বলেন নি, শিল্প-সৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁরা বলেছেন যে শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটাও কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। অর্থাৎ শিল্পের সৃজন ও উপভোগ দুই-ই ব্যক্তিগত, সামাজিক নয়।

প্রথমে দেখা যাক শিল্পসৃজনটা শিল্পীর বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত ব্যাপার—এ মত কতদূর সত্য। এ বিষয়ে মার্কসবাদীদের প্রথম প্রশ্নই হল এই "বিশুদ্ধ ব্যক্তি" অর্থ কি? এই "বিশুদ্ধ ব্যক্তি"র মানস গঠন কি সমাজ-

নিরপেক্ষ? তাই যদি হয় তো সমাজ-নিরপেক্ষ অসামাজিক মন কি সৃজন-ক্ষম? আমরা যাকে বলি 'সৃষ্টি' অসামাজিক মনের পক্ষে তা কি সম্ভব? মানুষে গান গায় শ্রোতারা শুনবে বলে, সাহিত্য রচনা করে পাঠকেরা পড়বে বলে, ছবি আঁকে দর্শকরা দেখবে বলে। অন্য মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশই শিল্পের ধর্ম। কাজেই অন্য নিরপেক্ষ 'বিশুদ্ধ-ব্যক্তি'-মানস কখনো শিল্প সৃজন করতে পারে না। শিল্পীমাত্রকেই একটি ভোক্তা সমাজের অপেক্ষা রাখতে হয়। শিল্পী যে সৃজন কালে বারবার মাথা নাড়েন আর সৃষ্টকে বারবার মজাঘষা করেন, কবি যে কবিতা লিখতে লিখতে কাটছাঁট করেন আবার লেখেন, এক শব্দ কেটে আরেক শব্দ লেখেন—তার কারণ কি? কারণ তিনি এমন শব্দেরই সন্ধান করেন যা ভোক্তাসমাজের কাছে তাঁর বক্তব্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং শিল্প একটি সামাজিক বিষয়। এটা যে শুধুমাত্র মার্কসবাদীদেরই বক্তব্য তা নয়, যে কোন সমাজ সচেতন সুস্থ শিল্পীই এই মত পোষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দেব জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখী যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত, পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। পাখীর গানের মধ্যে পক্ষীসমাজের প্রতি যে কোন লক্ষ্য নাই, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে তো নাই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা, কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ।" (সাহিত্যের সামগ্রী)

এইজন্য মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিক প্লেখানভ বলেছেন—"শিল্প হল সামাজিক ঘটনা।" এই জন্যই মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিক কডওয়েল মনে করেন, শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামাজিক রূপ লাভ করে। শিল্পী যে শিল্প রচনা করেন তার প্রক্রিয়ার সার বস্তুটা কি? কডওয়েলের মতে—শিল্পীর মনে পুরাতন সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব থেকেই শিল্প জন্মলাভ করে। সমাজ নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল সমাজে শিল্পী যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তা তাঁর সমসাময়িক সমাজেরই প্রতিফলন। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরাতন সমাজের অভিজ্ঞতাও ঐতিহ্য আকারে শিল্পীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। কাজেই প্রতি পর্দেই শিল্পীর মনে বাতিল হয়ে যাওয়া পুরাতন সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবলব্ধ সামাজিক অভিজ্ঞতার সংঘাত দেখা দেয়—এই সংঘাতে শিল্পীর পুরাতন এবং নূতন উভয় অভিজ্ঞতাই বদলে যায় এবং দেখা দেয় একটি সমন্বিত নূতন অভিজ্ঞতা, যা প্রকাশ করার জন্য শিল্পী খোঁজেন এমন ইমেজ, এমন শব্দ, এমন রূপক, উপমা যা নূতন সমাজের

মানুষের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। এইখানেই শিল্পীর ব্যক্তিমানস আর যূথমানসের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর অভিজ্ঞতার সামাজিকীকরণই হয়ে ওঠে শিল্পের প্রাথমিক লক্ষণ। এই কারণেই শিল্প ব্যক্তির রচনা হয়েও সমাজের এবং এই কারণেই শিল্পের প্রভাবও শুধু ব্যক্তি-মানসেই আবদ্ধ থাকে না, তা যূথমানসে প্রতিফলিত হয়। শিল্প একান্ত-ভাবে ব্যক্তির নয় সমাজের। সাহিত্যে প্রধান অবলম্বন যে ভাষা, সেই ভাষারই উদ্ভব ঘটেছিল সামাজিক কারণে। ভাষার আবেদন সাধারণের কাছে। কাজেই 'ভাষা-বাহন-শিল্পের' আবেদনও শুধু ব্যক্তির কাছেই নয়, সমাজের সাধারণের কাছে। মার্কসবাদীদের এই বক্তব্যও অনেক বড় কবি যাঁরা মার্কসবাদী নন তাঁরাও স্বীকার করেন। এক্ষেত্রেও আবার রবীন্দ্রনাথেরই উদাহরণ উপস্থিত করছি। সাহিত্যের লক্ষণ কি তা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষ ভাবে সাধারণের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।" রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—" দাশু রায়ের পাঁচালী দাশরথির ঠিক একলার নহে, যে-সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালী রচিত।"

সমাজ-নিরপেক্ষ কোন সাহিত্য টিঁকে থাকতে পারে না। সাহিত্য যে টিঁকে থাকে, রবীন্দ্রনাথের মতে—"সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণে টিঁকিয়া থাকে।"

সুতরাং শিল্পের সৃজন ও তার প্রভাব উভয়েই শেষ বিচারে সামাজিক।

॥ ৫ ॥

এই মূল সিদ্ধান্ত থেকে স্বভাবতই অনেকগুলি অনুসিদ্ধান্ত আসে, যেগুলির পূর্ণ আলোচনা না করলে মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের আলোচনাও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনার যেহেতু অবকাশ নেই, সেই হেতু আমরা উপসংহারে শুধুমাত্র অনুসিদ্ধান্ত-গুলির মধ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেটিরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

শিল্প যেহেতু চেতনারই একটি বিশেষ রূপ সেই হেতু শিল্প মূলত বস্তুগত সমাজেরই প্রতিফলন,—এ কথা স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে একথাও এসে যায় যে সমাজটা যখন শ্রেণীবিভক্ত তখন তার প্রতিফল হিসেবে শিল্প শ্রেণীমানসিকতায় বিভাজিত।

একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শিল্পী যখন সমাজেরই মানুষ তখন নিশ্চিতভাবেই তিনি সমাজের কোন না কোন শ্রেণীর মানুষ এবং তাঁর

মানসিকতা মূলত তাঁর শ্রেণীগত অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। সে জন্য শিল্পীর সৃষ্টিতেও কোন না কোন শ্রেণীর মানসিকতা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এই প্রতিফলন অবশ্যই সরল প্রক্রিয়ায় ঘটে না, এর মধ্যে জটিলতা আছে। এ বিষয়ে লুনাচার্স্কি বলেছেন,—"সাহিত্যে কিন্তু সব সময়ই, সচেতন বা অচেতনভাবে লেখকের শ্রেণীগত মানসিকতাকে প্রতিফলিত করবেই। হয় ব্যাপারটা এরকম হবে, নয় তো যা প্রায়শঃই ঘটে থাকে, তা হলো লেখকের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাবের একটা মিশ্রণের প্রতিফলন ঘটবে।"

এই মিশ্রণই জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে শিল্পীর মানসিকতা মূলতঃ তার শ্রেণীচিন্তার দ্বারাই প্রভাবিত। শিল্পীর শ্রেণীগত অস্তিত্বের দিকটি বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু এই সূত্র ধরে যখন শ্রেণী-আইডিওলজি এবং তার থেকে—পার্টি-আইডিওলজির প্রতি শিল্পীর পক্ষপাতিত্ব বা 'পার্টিজেনশিপের' প্রশ্ন এসে পড়ে, তখনি মৌচাকে ঢিল পড়ে। বুর্জোয়া সমাজ তো বটেই অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী শিল্পতাত্ত্বিকও এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'কমিটমেন্ট টু পার্টি আইডিওলজি'-এর কথা প্রথম শোনা গেল ১৯০৫ সালে লেনিনের কণ্ঠে। তখন অনেকের কাছেই কথাটা অদ্ভুত এবং সংকীর্ণ বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপকতা, শিল্পের আবেদনের সার্বজনীনতা একটি পার্টির সংকীর্ণ পরিধি মধ্যে যেন সঙ্কুচিত হয়ে এল।

আর্নেস্ট ফিশার ও আর্নলড্ কেটল শিল্পতত্ত্বে মার্কসবাদী হয়েও তাই মনে করেন, শিল্পের পক্ষে কোন 'আইডিওলজির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।' শিল্পের ক্ষেত্রে ফিশার বাস্তবকে কোন আইডিওলজির চোখে দেখতে রাজী নন এবং তিনি মনে করেন কোন দলীয় প্রভাব থেকে শিল্প যতই মুক্ত হবে ততই তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত মার্কসবাদীরা এর পাল্টা মনে করেন যে, 'পার্টি' এবং 'আইডিওলজি' এ দুটোর সম্পর্কে ফিশার এবং কেটলের ধারণাটাই সংকীর্ণ। 'পার্টি' বলতে এঁরা একটা জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী বলে মনে করেছেন। কিন্তু লেনিনের কাছে পার্টি হচ্ছে 'শ্রেণীর প্রতিনিধি'। লেনিনের পার্টি প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিনিধি। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী অংশের দ্বারা গঠিত নির্ভক্রিয়াসই হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের 'পার্টি'। আর এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে কিছুতেই বুর্জোয়া শ্রেণীর মত একটি মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠী-গঠিত শ্রেণী বলা যায় না। মার্কস তাঁর 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' বলেছেন—"অতীত ইতিহাসে প্রত্যেকটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের

স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারিয় আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিক্যের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্বাধীন আন্দোলন। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম।"—এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীভূত রূপ হচ্ছে তার পার্টি। ফিশার বা কেটল শিল্পের 'সার্বজনীনতা'র যে প্রশ্ন প্রকারান্তরে তুলেছেন তার উত্তরে তাই বলা যায়,—শিল্পকে যদি সত্যই 'সার্বজনীন' হতে হয় তবে তাকে প্রলেতারিয়েতের কথাই বলতে হবে। কারণ দেশের প্রকৃত 'সর্বজন' এই বিপুল সংখ্যক প্রলেতারি-য়েত ছাড়া আর কেউ নন। আর শিল্প যদি সর্বজনের আশা আকাঙ্ক্ষার ঘনীভূত রূপের প্রকাশক হয় তবে সে ঘনীভূত রূপকে শিল্প পার্টি ছাড়া আর কোথায় পেতে পারে?

ফিশার যে বলেছেন—বাস্তবকে তিনি কোন ইডিওলজির চোখ দিয়ে দেখতে নারাজ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে তাঁর এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে "ইডিওলজি" বাস্তব থেকে স্বতন্ত্র কিছু। 'বাস্তব' কি? 'ইডিও-লজি'-ই বা কি? আর দুটোর মধ্যে সম্পর্কটাই বা কি? চেতনা নিরপেক্ষ যে বাস্তব জগৎটা মানুষের সামনে আছে, তার নিয়মকে জেনে মানুষ তার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সেই বাস্তবকে পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রাম করে। সংক্ষেপে এই সংগ্রামই জীবন। এই সংগ্রামে সফল হতে হলে বাস্তব সম্পর্কে মানুষকে একটা কার্যকরী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে হয়। এক অর্থে মানুষের ইডিওলজি হচ্ছে বাস্তব সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভংগী। এই দৃষ্টি-ভংগী বা ইডিওলজি আকাশ থেকে পড়ে না, বাস্তবের সংগে মানুষের সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি হচ্ছে তার ইডিওলজি। একটা ইডিওলজি ছাড়া বাস্তবকে দেখার যে 'কনসেপশন্' বা ধারণা ফিশার করেছেন আসলে তা একটা নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর। মানুষের সামনে যে মাটিটুকু আছে, তাকে শুধু মাত্র জানা হল—এতেই মানুষের চলে না। এই মাটি থেকে লড়ে ফসল আদায় করতে হলে মানুষকে সক্রিয়ভাবে কিছু করতে হবে। আর এই সক্রিয়তার জন্য মানুষের একটা সুসম্বন্ধ ভাবাদর্শ থাকা দরকার, যার মাধ্যমে মানুষ এবং মাটির মধ্যে একটি সফল সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাই ফিশারের ইডিওলজিহীন বাস্তবজ্ঞানের মতবাদ আসলে 'সাব্জেকট' থেকে 'অবজেকট'-কে বিচ্ছিন্ন করে শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তায় নিক্ষেপ করে। শিল্প মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও আবেগকে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে তোলে—ক্রিস্টোফার কডওয়েলের এই মত যদি মানি তবে বলতেই হবে যে, ইডিওলজির ভিত্তি ছাড়া থশিল্প দাঁড়াতেই পারে না, আর যদি বা দাঁড়ায় তো একমাত্র 'ফর্ম' ছাড়া শিল্পের সেখানে আর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।

আর শুধু 'ফর্ম-সর্বস্ব' শিল্প শেষ পর্যন্ত 'এইম ইন্ ইটসেল্ফ'-এর চোরা-বালিতে ডুবে যায়।

কাজেই লেনিন যে 'কমিটমেন্ট টু পার্টি ইডিওলজি'-এর কথা বলেছেন, বিশ্লেষণ করে দেখলে তা সংকীর্ণতা নয়ই বরং এতেই শিল্পের সর্বাধিক ব্যাপকতা এবং সক্রিয়তার কথা বলা হয়েছে।

লেনিনের এই দায়বদ্ধতার ঘোর বিরোধী হলেন বুর্জোয়া শিল্পতাত্ত্বিকরা। তাঁরা বলেন, এটার মানেই পক্ষপাতিত্ব এবং উদ্দেশ্য প্রবণতা। আর শিল্পে দুটোই অচল। কিন্তু শিল্পের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এই মতের সায় পাওয়া যায় না। "ট্র্যাজিডির জনক ইস্কাইলাস এবং কমেডির জনক এ্যারিস্টো-ফেন্স্ উভয়েই নিশ্চিতরূপে উদ্দেশ্য-প্রবণ কবি ছিলেন—ঠিক যেমন ছিলেন দান্তে ও সার্ভেন্টিস। শিলারের 'ক্রাফ্ট এণ্ড লভস'-এর প্রধান গুণ এই যে এইটিই প্রথম জর্মন রাজনৈতিক উদ্দেশমূলক নাটক।" শিল্পে উদ্দেশ্য-প্রবণতা যদি অচলই হয় তো উপরোক্ত দিকপাল কবি সাহিত্যিকদের অ-শিল্পী আখ্যা দিতে হয়।

মার্কসবাদীরা মনে করেন উদ্দেশ্য বা পক্ষপাতিত্ব থাকলেই শিল্পের হানি হয় একথা ঠিক নয়। কথা হচ্ছে, সে উদ্দেশ্য বা পক্ষপাতিত্ব শিল্পী কিভাবে উপস্থিত করছেন তার উপরেই নির্ভর করে তা শিল্প হয়ে উঠল কিনা। শিল্পী যদি তাঁর মতকে পাঠক, দর্শক বা শ্রোতার উপর জোর করে চাপিয়ে না দেন, শিল্পীর মতামত যদি তাঁর শিল্পকর্মে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনিবার্য-ভাবে স্ফুরিত হয় তবে শিল্পকে তা কোনদিনই কুণ্ঠিত করে না। এ বিষয়ে এংগেলস একখানি উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"......আমি মনে করি, পরিস্থিতি এবং চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই পক্ষপাত বেরিয়ে আসা উচিত। যে সামাজিক বিরোধের চিত্রগুলি আঁকা হয় তার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান পাঠকের উপর চাপিয়ে দেওয়া লেখকের পক্ষে সংগত নয়।" কাজেই লেনিনের দায়-বদ্ধতার মতবাদ শিল্পবিরোধী—এ নালিশ টেঁকে না।

আসলে বুর্জোয়া শিল্পতাত্ত্বিকরা যে মার্কসবাদকে শিল্পের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেছেন তার মূল কারণ হচ্ছে মার্কসবাদীরা শিল্পকে সমাজের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। বুর্জোয়া শিল্পতাত্ত্বিকদের মতে মার্কসবাদীরা শিল্পকে সমাজের দাসত্বে বন্দী করে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছেন। এর বিপরীতে মার্কসবাদীরা মনে করেন শিল্প তার মর্যাদা এবং স্বাধীনতা হারায় বরং পুঁজিবাদী সমাজেই। স্টর্চের অর্থনীতিক মতামতের আলোচন প্রসঙ্গে মার্কস স্পষ্টতঃই মন্তব্য করেছেন—"পুঁজিবাদী উৎপাদন মানসিব উৎপাদনের কয়েকটি দিকের বিরোধী যেমন শিল্পকলা ও কবিতা।"

প্রকৃত বাস্তবে পুঁজিবাদী সমাজ শিল্পকে পণ্যের বা "কমোডিটি"র পর্যায়ে নামিয়ে এনে তার মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করেছে। পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ,—যাকে গোর্কী "চিড়িয়াখানার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" বলে অভিহিত করেছেন,—তা আসলে শিল্পীকে সমাজবিচ্ছিন্ন হতাশাময় এক ট্র্যাজিক সত্তায় পর্যবসিত করেছে এবং তদ্দ্বারা শিল্পের মর্যাদা নষ্ট করেছে।

লেনিন তাই বলেছেন—

"বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মহাশয়েরা! আমরা বলতে বাধ্য যে আপনাদের পরম স্বাধীনতার কথাটা একেবারেই ভণ্ডামী! যে-সমাজ অর্থাধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মেহনতী মানুষ দারিদ্র্যে ভোগে আর মুষ্টিমেয় ধনী দিন কাটায় পরশ্রমজীবী হিসাবে, সেখানে বাস্তব ও সত্যিকারের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। লেখক মহাশয়! আপনার বুর্জোয়া প্রকাশকের কাছ থেকে কি আপনি স্বাধীন? আপনার বুর্জোয়া পাঠকদের কাছ থেকে, যারা উপন্যাস ও চিত্রে আপনার কাছ থেকে চায় কুরুচি, "পবিত্র" অভিনয় কলার পরিপূরণ হিসাবে চায় গণিকাবৃত্তি, তার থেকে কি আপনি স্বাধীন?...... বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী, অভিনেত্রীর স্বাধীনতা হল টাকার থলি, উৎকোচ আর রক্ষিতাবৃত্তির ছদ্মবেশী পরাধীনতা।"

বুর্জোয়ার ব্যক্তি-স্বাধীনতা আসলে সমাজ বিচ্ছিন্ন এক অসহায় পরাধীনতা। এই বিচ্ছিন্নতার শিকার যে শিল্পী তিনিও তাই সমাজ বন্ধনকে অস্বীকার করেন!

ক্যাপিটালিজমের অর্থনীতি বুর্জোয়াকে শেষ পর্যন্ত সমাজ বিচ্ছিন্ন এক একক ব্যক্তি-সত্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে—যেখানে তার বহু ঘোষিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে গেছে। বুর্জোয়া চেয়েছিল ফিউডাল সমাজ বন্ধন থেকে মুক্তি, যে-মুক্তির জন্য তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তির উপর। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্থনীতিক ভিত্তি থেকেই উপরি কাঠামোতে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের জন্ম। বুর্জোয়াদের এই সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির মুক্তি, ব্যক্তির স্বাধীনতা। কিন্তু ফিউডাল সমাজের পীড়নমূলক বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন হতে গিয়ে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল এই যে—'সমাজ মাত্রেই ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী।' বুর্জোয়া ধারণা, মানুষের প্রবৃত্তি নিচয় "বরন্ ফ্রি", শুধু সমাজই তাকে শৃংখলিত করে রেখেছে। সমাজের প্রত্যক্ষ কর্তব্য থেকে মুক্তি পেতে পারলেই সে স্বাধীন—এই হল বুর্জোয়া স্বাধীনতার মূল ধারণা। এ ধারণার জন্ম হয়েছিল অনিবার্যভাবেই তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে।

এই অর্থনীতিক কর্মকাণ্ড কি?

মার্কসের কথায় তা হল এই—"উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী

বদল না ঘটিয়ে এবং তদ্দ্বারা উৎপাদন সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ সম্পর্কের অবিরাম বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী বাঁচতে পারে না।...আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন; সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং স্থায়ী উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুসঙ্গীক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, আবার নবগঠিত সম্পর্ক ও ধারণাসমূহও দানা বাঁধার আগেই অচল হয়ে পড়ে" (কমিউনিস্ট ইশতেহার)। এই কর্মকাণ্ডের ফলে বুর্জোয়ার কোন সদর্থক সমাজস্থিতি আর রইল না এবং সমাজ থেকে, মুক্তি-স্পৃহায় ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ফিউডাল সমাজকে ভেঙে চুরমার করতে গিয়ে বুর্জোয়ারা এই সত্যকে বিস্মৃত হল যে, আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট একটি সমাজকে ভেঙে ফেললেও তার জায়গায় আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিপূর্ণ আর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মুক্তি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেন না সামাজিক বন্ধনই ব্যক্তির মুক্তির শর্ত, অন্যথায় অসামাজিক প্রাণীর মত অবাধ স্বাধীনতা তাকে ভোগ করতে হবে যা পরাধীনতারই নামান্তর। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলেছিলেন যে, বীণার তার যে বীণার দুই প্রান্তে কঠিন বন্ধনে বন্দী, একমাত্র সেই বন্ধনের ফলেই তার থেকে ঘটে সুরের মুক্তি। সুর যদি নিজ মুক্তির জন্যে ঐ তারের বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তারকে শিথিল করে দেয় তার পরিণতিতে সুর বন্দী হয় নিঃশব্দতার জড়তায়। বুর্জোয়াও ব্যক্তির মুক্তির জন্য সমাজ-বীণার তার ছিঁড়ে ফেলেছে, ফলে ব্যক্তির মুক্তি ঘটেনি, বরং আজ বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ নিজের কর্মকাণ্ডের জালে জড়িয়ে এক অসহায় ট্র্যাজিক পরিণতির মুখে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে এলো বুর্জোয়ার অবাধ বাজার, এবং পুঁজিতন্ত্র—যার ফলে প্রতিনিয়তই একজন পুঁজিপতি আর একজন পুঁজিপতিকে আর্থিকভাবে ধ্বংস করে এগিয়ে যাচ্ছে। পুঁজি সঞ্চয়ের মাধ্যমে এক পুঁজিপতি অন্য পুঁজিপতিকে নিরন্তর গ্রাস করছে এবং টেনে দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনছে। এই হলো বুর্জোয়ার 'অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন'। এর মূলে আছে সেই বুর্জোয়া অবাধ বাজার, যা নাকি বুর্জোয়া স্বাধীনতার ভিত্তি। ব্যক্তি স্বাধীনতার এই গ্যারান্টি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপরীত ফলই প্রসব করল। অবাধ বাজার এবং ভাল প্রতিযোগিতার স্বর্ণোদ্যান শেষ পর্যন্ত তার কাছে হয়ে দাঁড়াল স্বর্ণপিঞ্জর। সে আটকা পড়ল এক দুষ্টচক্রের ঘূর্ণাবর্তে; অর্থাৎ সে যতই হারাতে লাগল তার স্বাধীনতা, ততই সে আরো বাজার ও প্রতিযোগিতার দাবিতে বিদ্রোহ করতে লাগল এবং তার ফলে আরো দাসত্ব শৃঙ্খলে নিজেকে জড়াতে লাগল। শেষ

পর্যন্ত সমাজ থেকে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল; আর সমাজবিচ্ছিন্ন এক অলীক স্বাধীনতার জন্য আর্তনাদ করতে লাগল।

ক্রিস্টোফার কডওয়েল দেখিয়েছেন, ধনতন্ত্রের কাব্য-নাটকে কিভাবে ধ্বনিত হয়েছে এই আর্তনাদ, এই ট্র্যাজিডি, এই হতাশা। ক্যাপিটালিজমের এই ব্যর্থতা বা শূণ্যতার মধ্যে এসে যখন শিল্পী দাঁড়ালেন, তখন সমাজকে বলার মত কোন সদর্থক বাণী আর তাঁর থাকতে পারে না। তাই সে সমাজ থেকে, শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। নিজের পরাধীনতার পথে শিল্পকেও তার সঙ্গী করতে চায়।

কিন্তু এর বিপরীতে মার্কসবাদ যে সমাজের কথা বলে, সে সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই বরং সমাজবন্ধনই সেখানে ব্যক্তির মুক্তি এবং বিকাশের প্রধান শর্ত। এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই মার্কসবাদী শিল্প-তত্ত্বের প্রধান সিদ্ধান্ত হলঃ সমাজের শিল্প সমাজের দ্বারা সমাজেরই জন্য সৃজিত, সমাজের বৃন্তবন্ধনেই শিল্পসাহিত্য জীবন্ত।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনায় বার্ণার্ড শ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শিল্পসাহিত্য উদ্দেশ্যহীন হতে পারে কি?

সাহিত্য চিত্রকলা সংগীত নৃত্য, যে কোন রকম সৃজনধর্মী শিল্পেই শিল্পী কি চান শুধু রস পরিবেশন করতে, অথবা তাঁর সৃষ্টি কর্মের লক্ষ্য থাকে দর্শক শ্রোতা ও পাঠকের গোচরে একটা কিছু আঁকড়ে ধরার মত বস্তু, একটা দর্শন, তত্ত্বকথা, জীবন জিজ্ঞাসা বা উপলব্ধির সঞ্চয় পৌঁছে দিতে? যাঁরা বলেন, শুধু শিল্পের জন্যই শিল্প, অর্থাৎ পাণ্ডিতী অভিধায় যাঁদের বলা হয় কলা কৈবল্যবাদী, তাঁরা কোন পার্থিব প্রয়োজন বা লাভালাভের নিরিখে শিল্পসৃষ্টির মূল্যায়ন করতে রাজি নন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য ত বটেই, প্রাজ্ঞ বিচারক হিসাবেও নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর নন সবাই। পক্ষান্তরে শিল্পের একটা কোন সুস্পষ্ট প্রতিপাদ্য থাকবে, যা সন্ধিৎসু মানুষকে আলো দেখাবে, এই কথাই বলেছেন অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁদের দেখা আমরা পাই সেকাল একাল সর্বকালেই, আর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সব দেশেই। অন্য বিভাগগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু সাহিত্যের খতিয়ান তলব করলেই আমরা দেখি, সংস্কৃত গ্রীক লাতিন আরবী ফার্সী চীনা ও হিব্রু থেকে শুরু করে, ফরাসী জার্মান বৃটিশ ইতালীয়ান স্প্যানিশ রুশ ও স্কান্দিনেভিয়ান পর্যন্ত প্রত্যেকটি ইউরোপীয় সাহিত্যের যেগুলি ধ্রুবপদী রচনা, তার কোনটাই 'পুণ্যাশ্রয়ী' বা হাওয়াবিলাসী সৃষ্টি-কর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টা শিল্পী এই জন্যেই বলেছেন, আনন্দই সৃষ্টির আদি প্রেরণা, তার লক্ষ্যও আনন্দ সৃষ্টি। কিন্তু সেইখানেই শেষ হয়ে যায় না সব কথা।

আনন্দটা কিসের? কিছু বোঝার, কিছু পাওয়ার বা ধরার আনন্দই বোধের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে সৃষ্টির রূপ ধরে। এই একই কথা বলেছেন বার্ণার্ড শ, অলংকার বিমুক্ত চাঁচাছোলা কাজের ভাষায়। তিনি বলেন: একজন বুদ্ধিসম্পন্ন প্রকৃতিস্থ মানুষ ভেবেচিন্তে যা কলম তুলে সুর বা দেহভংগীর মধ্যে রূপ দেন, তা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে কি? যিনি বলেন পারে, সেই নির্বিবেক ব্যক্তির সংগে তর্ক করে লাভ নেই। খাওয়ার জন্যে

খাওয়ার বা বলার জন্যে বলার যদিবা কোন মানে থাকে, কাগজ কলম ও শারীরিক সামর্থ্য অপচয় করে আবর্জনা বহুল নরককে হাতে বহরে আরো পুষ্ট করার কোনই মানে হয় না। এরকম মানুষদের সামাজিক ন্যায়-বিচারের আদালতে দণ্ডিত করা উচিত।

বার্ণার্ড শ্য কোন্ কথাটা যথার্থ উক্তি হিসাবে বলেছেন, কোন্‌টা ব্যঙ্গোক্তি হিসাবে বলেছেন, তা নিরূপণ করা অবশ্য কঠিন হলেও, এই মন্তব্যটাকে আমরা তাঁর খাঁটি অভিমত বলেই নিতে পারি। তাঁর লেখা নাটকগুলিতেও এই মতের অভিব্যক্তি দেখতে পাই। তা পড়ে আপনার মধুর বা বিরস যে কোন রকমই প্রতিক্রিয়া হোক, একথা কবুল না করে পারবেন না যে তার প্রত্যেকটারই বক্তব্য আছে কিছু না কিছু। মানব ও অতিমানব, মানুষ ও হাতিয়ার, শ্রীমতী ওয়ারেনের পেশা, জন বুলের অন্য দ্বীপ, ডাক্তারের উভয় সংকট, সন্ত জুয়ান—যে কোন বই ওল্টালেই আমরা বুঝতে পারি, একটা কোন কাজের কথা পেশ করার জন্যেই ওদের সৃষ্টি। নাটকের আধারটা তার অবয়ব এবং সেটা যদিও কোন ক্ষেত্রেই গুরুশিষ্য সংবাদ বা দুই সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন নরনারীর কথোপকথনের মত অসৃষ্টি পদবাচ্য বা বস্তুধর্মী রচনা নয়, উপভোগ্য সাহিত্যই। তবু তাদের অন্তর্লগ্ন উপযোগিতার মজবুত কংকালটা অস্বীকার করার উপায় নেই। হয়ত চিরায়ত নয় তার বেশীর ভাগের প্রতি-পাদ্য, অনেক বিষয়ই বেশ একটু সাময়িকতাগন্ধী। কালাতিক্রান্ত হবার পর অনেকগুলির রঙ আজ ফিকেও হয়ে গেছে। আরো যাবে আর দু-এক দশক পার হলে। কিন্তু তাদের সাহিত্য পদবী থেকে খারিজ করা চলে না, বিরোধী সমালোচকরা কেউ কেউ সে কথা জোর গলায় বলা সত্ত্বেও। শ্য নিজেই বলে-ছেন, শেকসপীয়ার, মিল্টন, মলেয়ার, হুগো, ইবসেন, যে কোন সেরা লিখিয়ের লেখা থেকেই প্রমাণ করা যায় যে তাঁরা একটা কিছু প্রচার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপন্ন করার জন্যে কলম চালিয়েছেন। মিল্টনের শ্রেষ্ঠতা যদিও মূলত প্রসিদ্ধিগত এবং তা তাঁর ধর্মীয় বাতিকের জন্যে, নতুবা তাঁর লেখা পড়তে আগ্রহ যা জাগে, অধ্যবসায় লাগে তার চেয়ে বেশী, আর শেকসপীয়ার রঙ্গমঞ্চে জীবনকে পরিস্ফুট না করে জীবনকেই রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছেন যদিও শিল্পগত নাট্যকেপনার দাপটে, তবু দুজনেই চিনির আবরণে ঢেকে উপযোগিতার বড়ি বিতরণ করেছেন। মলেয়ার ও ইবসেনের কাল শেষ হয়েছে। তাঁদের কালের সমস্যার উপরও যবনিকা পড়েছে। তবু মানুষের চিরকালীন ন্যাকামি বোকামি ও কপটতাকে ঘিরে প্রথম জনের বিদ্রূপ ও দ্বিতীয় জনের শানিত সমালোচনা দেশকালের প্রাচীরে টক্কর ফিরে আসে না পাঠকের মন থেকে প্রতিহত হয়ে। বলা বাহুল্য এটা সাহিত্যগুণ এবং এ-গুণ না থাকলে রচনা লেখা মাত্র হয়ে থাকে, শিল্পের কোঠায় ওঠে না, তথাপি সাহিত্যের অন্ত-

নিহিত এই যে উদ্দেশ্য বা উপযোগিতার অনতিক্রম্য উপস্থিতি, এটা কি বা কোন্ জাতীয়? শ্য এককথায় তার উত্তর দিয়েছেন, যা দুঃখ মোচনের এবং স্বস্তি ও সমুন্নতি স্থাপনের সহায়ক, তাই জীবনের উপযোগী এবং যা জীবনের উপযোগী তাই শিল্প, সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির উপযোগী, তা অদ্যতন বা চিরন্তন যাই হক।

সমাজতন্ত্র, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার প্রশ্নে

একথা নিশ্চয় আজ আর সবিস্তারে বলার প্রয়োজন নেই বার্ণর্ড শ্য সোশ্যালিস্ট বা সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন। তবে সমাজতন্ত্রের বিধিবন্ধ ছক অনুসরণ করেন নি তিনি। তিনি তাঁর নিজের অভিপ্রেত একটা চিন্তার কাঠামোতে প্রক্ষেপ করেছিলেন তাঁর সমাজতান্ত্রিক মতামতগুলিকে। প্রথমতঃ তিনি যে কোন রকমের কাজকর্ম ও বৃত্তি ব্যবসাকেই সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকে তুল্যমূল্য মনে করতেন। দ্বিতীয়ত তিনি ধর্মের তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক দিকগুলিকে শুধু অর্থহীন বা ভুয়ো মনে করতেন না, তাঁর মতে তা মানুষের দাসত্ব কায়েম রাখার প্রধান হাতিয়ার, তাই সর্বপ্রযত্নে বর্জনীয় বলে মনে করতেন। তৃতীয়ত তিনি বিবাহ এবং দাম্পত্য আচরণবিধির বেশীর ভাগকেই বর্বর যুগে প্রবর্তিত কতকগুলি জঘন্য কু-প্রথার অন্ধ অনুবৃত্তি বলে মনে করতেন। এর মধ্যে পুরুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায় না বলে মনে করতেন। এ ছাড়া মালিক শ্রমিক ও প্রভু ভৃত্যের ব্যক্তিক অধিকারকে সামাজিক মর্যাদার সমভূমিতে দাঁড় করানোর পক্ষপাতী ছিলেন তিনি এবং গুরু পাদ্রী ও দৈবজ্ঞকে পয়লা নম্বরের সমাজশত্রু বলে গণ্য করতেন। আর নাম লেখানো পতিতা ও দুষ্কৃতকারিণী সতীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীকে তিনি অধিকতর সম্মানাই ভাবতেন। এসব চিন্তা যে ধনতান্ত্রিক খৃষ্টান ইউরোপে একদিন প্রচণ্ড অস্বস্তি ডেকে এনেছিল এবং বহু মানুষ এগুলিতে তাঁর সততাহীন বাকচাতুর্য বলে বোঝাতেন, একথা হয়তো আজ অনেকে ভুলে গেছেন। তবে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন অনেক এবং তাঁরা শ্যকে বিশ শতকের এক 'নূতন মেশায়া' রূপেই খাড়া করতে চাইতেন। আজ ধিক্কার ও জয়জয়কার দুই রকম প্রান্ত থেকে মুক্ত করে মতবাদগুলির মূল্য যাচাই করলে দেখা যাবে, কথাগুলি হয়ত বলা হয়েছে অত্যধিক ঝাঁজ বা ঝালের সঙ্গে। কিন্তু ভিত্তিমূলক সত্য আছে প্রত্যেকটারই। অর্থাৎ আমাদের চিরাচরিত সংস্কার ও গতানুগতিক অভ্যাসের দরুণ এদের যতখানি নগ্ন রূঢ় বা সাংঘাতিক ঠেকে, আসলে যুক্তির আলোয় এরা তত ভয়ানক নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় এর বেশীর ভাগই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে এবং আমরা না বুঝেই সেগুলি অনুসরণ করছি।

এই সব মতামতের নিরিখে বিচার করে যদি ভাবেন মানুষটা তিনি ছিলেন উচ্ছৃংখল উদ্ভট বা সদাসদ্-বোধ-বিরহিত তাহলে কিন্তু দারুণ ভুল হবে। অহিংসা ও মানবপ্রেমে সুগভীর আস্থাসম্পন্ন সত্যসন্ধ মানুষ ছিলেন তিনি। খৃষ্টানদের ক্রুশকে তিনি হিংসার প্রতীক বলে বিবেচনা করতেন, তাই মৃত্যুর পর তাঁর কবরে ক্রুশ দেওয়া নিষেধ করেছিলেন। প্রাণশক্তির সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, এক টুকরো মাংস ফেলে রাখলে এক বেলার মধ্যে তাতে পচন ধরে দুর্গন্ধ আসে, কিন্তু একটি ভাঁড়ে শস্যবীজ রেখে দিলে শতশত বছরেও বিকৃত হয় না। তখনো মাটিতে পুঁতলে তা থেকে গাছ বেরোয়। এতে প্রাণ-শক্তির অমোঘতাই প্রমাণ হয়। বিবাহ সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সন্তান লাভের জন্যে নরনারীর সম্মেলন দরকার। কিন্তু তার জন্যে বিবাহটা অপরিহার্য এমন কথা বলতে পারি না। ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানও প্রতিভায় দিগ্বিজয়ী হয়েছে, আবার তথাকথিত বৈধ সহধর্মিনীর পেটেও জানোয়ার হয়েছে, এ ত সবাই দেখেছেন। তবে পশুর মতো যথেচ্ছা-চার নয়, মানুষের আহার ও যৌনাচারে চাই মাত্রা জ্ঞান। কারণ জীবনটা গড়ে তোলার জন্যে সর্বাগ্রে দরকার আত্মপ্রত্যয় ও অধ্যবসায়। এসব কথা যে শুধু বলার জন্যেই বলতেন তিনি, তা নয়। তাঁর কঠোরতম সমালোচক যাঁরা, তাঁরাও স্বীকার করেছেন এ জায়গায় তাঁর মতে ও পথে ছিল অত্যাশ্চর্য মিল, যা কদাচিৎ হতে দেখা যায় বহু অগ্রগামী মানুষের জীবনেও। বার্ণাড শ্য মানুষটিকে এবং তাঁর মতামতকে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই কাঠামোটা প্রণিধান করা দরকার। মনে রাখতে হবে, নিছক চমক লাগাবার জন্যে এসব কথা বলা হয়নি। এরা উৎসারিত হয়েছে তাঁর সুগভীর জীবন-প্রত্যয় থেকে এবং মানব সংসার মনুষ্যজাতি নূতন করে গড়ার প্রয়ো-জনেই তিনি ধর্মীয় সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দুনিয়ার পুরুষা-নুক্রমিক ছাঁচটা ভাঙার কথা বারবার ভেবেছেন এবং বলেছেন। যথেচ্ছাচারের পথে মানুষকে বেপরোয়া স্বাধীনতা দেবার জন্যে চলতি কাঠামো ভাঙার প্রয়াস করেন নি। আর এইখানেই তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের আদি উৎস নিহিত।

মানবতা বাস্তবদৃষ্টি ও মননশীলতার সংগম

দুঃখের বিষয় বার্ণার্ড শ্য-র এই জীবন-দর্শনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেননি, তাঁর সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট জনও। তাঁদের মধ্যে চেস্টার টন, ওয়েলস, জেরাল্ড, বুনেট শ্রেণীর অগ্রণী সাহিত্যিকরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন রাসেল, ব্র্যাডলে শ্রেণীর বিদগ্ধ পণ্ডিতও। তাঁরা কেউ বলেছেন, শ্য হলেন একজন প্রতিভাধর বাকপটু ভাঁড়, কেউ বলেছেন, তিনি এমন একটা

চশমা চোখে লাগিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছেন, যাতে সব কিছু উল্টো দেখিয়েছে, কেউ বা বলেছেন কূটবুদ্ধির প্যাঁচ কষে সব কিছুর মূল্যায়ন করার ফলে তাঁর চিন্তাগুলিও তাঁর দেহের মত শীর্ণ ও জট পাকান হয়েছে। অবশ্য তাঁর গুণানুরাগীরও সংখ্যা কম নয়। ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস আর্থার সাইমনস জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার, অনেকে আবার তাঁকে প্রায় মেশায়া বা প্রেরিত পুরুষ সাজিয়েছেন। দু পক্ষের এই অত্যুক্তির ভীড় ঠেলে নিজের মন ও চোখ দিয়ে দেখলে, আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ ও বিংশ শতাব্দীর বস্তুধর্মী বুদ্ধিবাদ দুইয়ের সমপরিমাণ সমাবেশেই প্রখর এবং মুখর একটি আশ্চর্য মননশীলতার অধিকারী হয়েছিলেন বার্ণার্ড শ্য। তাঁর নাটকগুলি তাঁর এই মননশীলতার দর্পণ স্বরূপ। তাতে আমরা সমাজ ও মানুষের যে রূপ দেখি, তাতে করুণকে অতি করুণ বা সুন্দরকে আরো সুন্দর করে দেখানর কোন প্রয়াস নেই। তার যথার্থতাই বরং আমাদের পদে পদে ঘাবড়ে দেয়। পুরুষানুক্রমে বাহিত জড়তা মূঢ়তা ও কুসংস্কারের অন্ধতায় যে সত্যগুলিকে আমরা চিরদিন আবৃত করে চলেছি, আজও চলি, হঠাৎ সেগুলো যেন নগ্ন দিবালোকে নিরাবরণ হয়ে পড়ে। আত্মাবিষ্কারের এই ধাক্কা সব সময় সুসহ মনে হয় না বলেই, একদিন এ নিয়ে অনেকে অযথা নিন্দায় কালিমা লিপ্ত করেছিলেন তাঁকে, অনেকে আবার একই কারণে ধন্য ধন্যও করেছিলেন। বলেছিলেন এ দুঃসাহস একমাত্র তাঁকেই মানায় যাঁর দৃষ্টি ঈগলের মত, যার ভাষা গিরিনিঝরের মত অজস্রস্রাবী। সুবোধ্য কারণেই বোঝা যায় যে তিনি সর্বদিনের লেখক ছিলেন। যদিও তাঁর মানব ও অতি-মানব, পিগম্যালিয়ন, সন্ত জুয়ান, জনবুলের অন্যদ্বীপ প্রভৃতি নাটক মহা-সমারোহে মঞ্চস্থ হয়, তবু তিনি গলসওয়ার্দি সিঞ্জ পিনেরো বা জ্যাকবস-এর মত, জনপ্রিয় নাট্যকার রূপে গৃহীত হন নি কোন দিনই তাঁর জীবনকালে।

এ না হবে কেন? ভগবৎপ্রেম দেশপ্রেম মানবপ্রেম দাম্পত্যনিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠা বান্ধবতা সন্ন্যাস ত্যাগ ইত্যাদি সমাজ গঠনের মৌল ভিত্তিগুলিকে ত তাঁরা কেউ বার্ণার্ড শ্য-র মত কোমর বেঁধে সমরাহ্বান জানান নি। সংরক্ষণশীল ইংরেজের মন কখনোই সে রকম ভাঙনের দর্শনকে বরদাস্ত করতে পারে না। যদিও তাঁরা জীবন সমস্যার নানা জটিলতার উপর আলোকপাত করেছেন, বহু জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করেছেন, তবু এক জায়গায় তাঁরা অনড় থেকেছেন। বার্ণার্ড শ্য-র আইরিশ রক্তই তাঁকে স্থিতাবস্থার ঘোর বিরোধী করেছিল আযৌবন, সেই জন্যেই তিনি ইবসেন, হাউপটমান ও পিরানদেল্লো প্রমুখের সহযাত্রী হয়েছিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন গতানুগতিকতার দুর্গপ্রাচীর ভেঙে ফেলে। এঁদের মধ্যে একমাত্র ইবসেন ছাড়া আর কারো রচনার সঙ্গেই সম্ভবত

তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। সমকালের সহমর্মিতাই তাঁকে কমবেশী এক পথের পথিক করেছিল।

আজকের নাট্যরীতি ব্রেখতের (ব্রেশটের?) প্রভাবে এপিক থিয়েটারের দিকে মোড় ফিরেছে। আরো অনেক নূতন নাট্যরীতিই দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পথ প্রশস্ত করে গেছেন এঁরাই। এঁদের মধ্যে বার্ণার্ড শ্য-র ব্যক্তিত্ব ও শিল্প ভাবনার বৈশিষ্ট্য বাঁকা চোখে প্রচলিত সমাজবাস্তবতার ব্যাখ্যান।

জগৎ জীবন প্রেম ধর্ম সংস্কৃতি ও কলাকৃষ্টি সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ্য কোন ধারাবাহিক নিবন্ধ পুস্তক লেখেন নি। 'কৃষ্ণাংগ কুমারীর ঈশ্বর সন্ধান' নামক একখানি ছোট বইয়ে সমাজ সভ্যতা ধর্ম ও ঈশ্বর প্রত্যয় সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করে গেছেন মাত্র। আর 'বুদ্ধিমতী মহিলাদের জন্যে সমাজ-তন্ত্রবাদের পথ নির্দেশ' নামক বইয়ে আছে তাঁর ফেবিয়ান বা শেভিয়ান সমাজ-তন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা। কিন্তু বেশীর ভাগ মতামতই তাঁর বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে নানান নাটকে। কাজেই পাত্র পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে কোনটা তাঁর নিজস্ব মত, তা বুঝতে ধাঁধায় পড়তে হয়। শানিত যুক্তির অসি যুদ্ধে তাঁর বেশীর ভাগ চরিত্রই যে রকম পটু, তাতে সত্য নিরূপণের পথে এই জটিলতাকে অস্বীকার করার সত্যিই উপায় নেই। তবে যে পক্ষের বক্তব্যকে নাটকের উপ-সংহারে তিনি জয়যুক্ত করেছেন, সেগুলির নীচে বোধহয় অনেকটা ভরসার সংগেই লাল দাঁড়ি টানা যায়। তাছাড়া সমস্ত নাটকেই তিনি দীর্ঘ এক একটি মুখবন্ধ সংযুক্ত করেছেন, যা পরে 'প্রিফেসেস' নামক বইয়ে গ্রথিত হয়েছে। এগুলিকে তাঁর প্রত্যয়-প্রবন্ধ বলে গ্রহণই শ্রেয়। এগুলি থেকে সংগ্রহ করেই যে কথাগুলো এক ডাকে মনে আসে তাঁর ও তাঁর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে, তা উপরে বললাম।

তিনের দশকে শ্য যখন খ্যাতির অত্যুংগ শিখরে, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং তা স্বয়ং গ্রহণ না করে আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার সমুন্নতি বিধানের জন্য দান করেছেন, তখনই তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সংগে প্রথম পরিচয় হয়। তিনি এই উপলক্ষে বলেছিলেন, ডিনামাইট আবিষ্কার করার জন্যে আলফ্রেড নোবেলকে আমি সাধুবাদ দিই, কিন্তু নোবেল প্রাইজ আবিষ্কার তাঁর অপকীর্তি ছাড়া কিছু নয়। অর্ধশতাব্দী অন্তে আজ নোবেল প্রাইজ যাঁরা পাচ্ছেন এবং পেয়ে বিশ্বসাহিত্যে বরণীয় হচ্ছেন, তাঁদের অনেকের সৃষ্টি মূল্যায়ন করতে বসে একথা যে কত খাঁটি, তা সহজেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা

ক্ষুদিরাম দাস

সাহিত্যে মানুষের আমন্ত্রণ অবারিত ও অনায়াস। এর জন্য সাহিত্য-তত্ত্ব শেখার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মানুষও সারারাত তন্ময় হয়ে যাত্রা-পাঁচালি-রামায়ণকথা শুনছে, আর মাঝে মাঝে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে, এ দৃশ্য অনেকেরই দেখা। তবু সাহিত্য-জিজ্ঞাসা নামে একটা শাস্ত্র বহুদিন ধরে চলে আসছে। ইউরোপে এককালে এ্যারিস্টটলের মহাপ্রতাপ ছিল। আজও নেই এমন নয়, তবু বিচিত্র নোতুন রীতির সাহিত্য সৃষ্টির ফলে রোম্যান্টিক যুগের পর থেকে আরম্ভ করে রসগ্রহণের তথা বিতর্ক বিচার বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনেকটা বদলে গেছে। বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার প্রারম্ভ মধুসূদন-বঙ্কিম থেকে। ইংরেজির মধ্যস্থতায় যেমন আধুনিক সাহিত্য, তেমনি আধুনিক সমালোচনার রীতিনীতি। মধ্যযুগের বাংলায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের জন্য সংস্কৃতে সমালোচনার পুঁথি লেখা হয়েছিল। কিন্তু সে হল এদেশের প্রাচীনধারার অলংকারশাস্ত্র আর সদ্যপ্রকাশ বৈষ্ণব ধর্মভাবুকতা মিলিয়ে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল কি কৃষ্ণবিষয়ক নাটগীত যা লৌকিক বাংলার মৌলিক কাব্যসম্পদ তা কোনো বিচারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমন হতে পারে যে এগুলি সংস্কৃতের প্রসিদ্ধ কাব্য-মহাকাব্যের ধারায় গড়ে ওঠে নি বলেই বিচারের বস্তু হিসেবে এগুলিকে দেখাই হয়নি। যদিও জন-প্রিয়তার দিক দিয়ে ঐ শ্রেণীর শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য তুলনাহীন। বস্তুত বাংলায় কাব্য-সমীক্ষণ পরোক্ষভাবে গঠিত হয়েছে। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ সমালো-চক, তবে বহুক্ষেত্রে স্বানুভূতি-নির্ভর, মৌলিক।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যভাবে গীতিকাব্যধারার অনুসরণে রসবিচারক। নাটক-নাট্য বিষয়ে তাঁর তেমন কোনো বক্তব্য নেই, উপন্যাস-গল্প নিয়ে কিছু আছে মাত্র। আর মনঃস্বভাবের দিক থেকে তিনি রোম্যান্টিক, অর্থাৎ বাস্তব উপাদানের উপর মন ও কল্পনার আধিপত্য স্বীকার করতে হয় এমন ধারার রসদ্রষ্টা। শ্রেণীতে ফেলে দেখলে বলতে হয় শেলি, কীট্‌স্‌, রাস্কিন, ক্রোচে, ব্র্যাড্‌লে, এবারক্রম্বি, কতকটা প্রি-র‍্যাফেলাইট্‌ গোষ্ঠী এঁদেরই সগোত্র। মনোদর্শন পরিমাপে তিনি নব্য হেগেলীয় সম্প্রদায়ের। তাঁর লেখা সাহিত্য পুস্তকের একটি প্রবন্ধে বস্তুজগৎ থেকে সাহিত্য কতদূরে তা বোঝাতে গিয়ে বলছেন যে

বস্তুবিশ্বের উপর মনের কারখানা বসেছে, তার উপর বিশ্বমানবমনের কারখানা, সেই উপরিতলা থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি। আবার বলেছেন, সাহিত্য একটা আবির্ভাব, কবিকে মাধ্যম করে প্রকাশিত একটা দৈববাণী (কতকটা যেমন ক্রোচের একসপ্রেশন)। ফলে তদানীন্তন দেশকাল ও মতামতের সঙ্গে সাহিত্যের আত্যন্তিক সম্বন্ধ ধরা মুশকিল। কালের বিচারেই সাহিত্যের শেষ বিচার।

কবির আত্মবিলীনতার গর্ব 'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'। একে আরও অতিশায়িত করলে দাঁড়ায় 'আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুণী উঠল রাঙা হয়ে' অথবা 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে'। প্রায় সলিপ্‌সিজ্‌ম-এর মত শোনায়। তবে যে যে প্রসঙ্গে এমনতর কথা বলছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, সুরটা প্রতিবাদের জন্যই খুব চড়া হয়ে পড়েছে। এরকম ধরনের প্রসঙ্গে কবিকে যদি প্রশ্ন করা যায়, যা একান্তভাবে আপনারই মানসিকতা, তার সঙ্গে অন্যের মানসিকতার মিল থাকবে, অর্থাৎ আপনার একান্ত নিজস্ব মানসিকতাই যে সর্বজনীন ব্যাপার তা কোন্ যুক্তিতে বলা যায়? যেমন সাম্প্রতিকের কোনো কোনো গোষ্ঠীর অতিরিক্ত সংকেতাগ্রহ, পরাবাস্তব বা বিচ্ছিন্ন অহংবাদী চেতনা সম্পর্কেও সদৃশভাবে আপত্তি ওঠানো যায়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে কোনো সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়নে নিযুক্ত হন নি, ধরে নিয়েছেন যে ওরকম মনঃসাম্য স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ আমরা সবাই রক্তমাংসের ও হাসিকান্নার জীব। তা ছাড়া ভাষায় একটা সামাজিকতা গুণ আছে, তার উপর ছন্দ অলংকার নিয়ে প্রকাশ পেলে তা অন্যমনের নিকটবর্তী হতে বাধ্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রশক্তির মত সাহিত্যের কম্যুনিকেশন-শক্তিতেও আস্থাবান্। তুলনা করে দেখলে বলতে হয়, আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা ব্যাপারটিকে অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা জোর দিয়েছিলেন কবির সাধারণীকরণ-ক্ষমতার উপর। কাব্যে ঘটনা-পরিবেশ-চরিত্র এমনভাবে নির্মাণ করতে হয় যাতে সেগুলি আমার কি না, পরের কি না, এরকম বিতর্কের অতীত হয়ে পড়ে। একে তাঁরা সাধারণীকরণ নাম দিয়েছিলেন। তবে এরকম নির্মাণের পরিণামে সাধারণের মনে কেন দৃষ্ট অভিনেতাদের অনুরূপ অবস্থা হয় তার কারণ নির্ধারণ করা যায় না বলেই মন্তব্য করেছেন। আজকের দিনে আমরা ব্যাপারটিকে সামাজিকীকরণও বলতে পারি। কবিব্যক্তির ভাব ভাবনা কল্পনার সঙ্গে আর সকলের সহমর্মিতা। হয়ত বা এই ব্যাপারটির অন্য কোনো শব্দে ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয় বলে এ্যারিস্টটল একে পুরানো ইমিটেশন্ আখ্যাই দিয়েছিলেন। এ-ক্ষেত্রে গুরু প্লেটো থেকে তিনি ভিন্নতর পথ বেছে নিয়েছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট কবিচিত্ত

ও কল্পনার কার্যকারিতায় (অর্থাৎ বস্তুজগৎকে রূপান্তরিত করে গ্রহণ ও সত্যভ্রম হয় এমন মিথ্যা সৃজনে) এবং সেই সঙ্গে সংক্রমণতত্ত্বে প্রত্যয়ী তা তাঁর 'সাহিত্য' পুস্তকের লেখাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়। পরিণত বয়সে লেখা সাহিত্যের পথে ও সাহিত্যের স্বরূপ পুস্তিকার ভাষণ ও চিঠিপত্রগুলিতে কবির মনোভাবের আরও বিস্তারিত ও কিছু নোতুন বিবরণ মেলে। আর সেগুলির মধ্যে যদিচ কবির ভাববাদী ও শিল্পশুদ্ধতাবাদী মনের পরিচয় আরও স্পষ্ট, তবু কোথাও এমন উপলব্ধি নেই যে সাহিত্য একটা আধ্যাত্মিক তুরীয় ব্যাপার। ঐ সব পুস্তক ছাড়া আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ প্রভৃতি আলোচনার মধ্যেও কবি-মনের সাহিত্য-উপলব্ধির পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে, আর হয়েছে তাঁর কিছু কবিতার মধ্যেও।

কবি-ঔপন্যাসিক হলেই যে সাহিত্যের যথাযথ বিচারক হবেন এমন ধারণা ঠিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্য আরও দু-চারজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের মতই এ বিষয়ে ব্যতিক্রমী। দেখতে হবে তিনি চিন্তাশীল মনীষীও। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা যেমন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তেমনি শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যও, বরং আরও প্রবলভাবে। সাহিত্য-রস-পথিকদের পথনির্দেশ করতে চেয়েছেন তিনি, তাঁর এরকম দাবির অধিকার অনস্বীকার্য। বিশেষে যখন দেখা যায়, বাঙালির অনুভূতি ও চিন্তার ফসল এই বিভাগটিতে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কবির জীবৎকাল পর্যন্ত সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে বিশ্বে যেসব মতামত প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয়ের চিহ্নও যেমন তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তেমনি সব বিষয়ে একটা মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষরও তিনি রাখার চেষ্টা করেছেন। এই মৌলিকতার বা স্বানুভবের জন্যই তাঁর মতামতের গুরুত্ব, আর ঐ সব মতামতের পর্যালোচনাও আবশ্যক হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্যের সাধারণ নীতি বিষয়ে যে যে জিজ্ঞাসা ঊনিশ শতকে আমাদের আবিষ্ট করেছিল তা মোটামুটি এই : সাহিত্য কাকে বলব, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব বিশ্বের ও মানবিক সুখদুঃখের সম্পর্ক কী, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, আর, বিশুদ্ধ সাহিত্য কতদূর সম্ভব। এই ক'টি মূল ব্যাপারের আনুষঙ্গিক কয়েকটি সমস্যা, যেমন, কাব্যের সঙ্গে প্রকাশ-রীতির সম্বন্ধ, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, সাহিত্য নির্মাণে সাহিত্যিকের মানসিক ক্রিয়াকৌশল আপনা থেকেই এসে পড়েছে এবং কবি নিজ বোধমত এগুলির সদুত্তর দিতে প্রয়াস করেছেন। সব মিলে কবির শিল্প-সাহিত্য-সমীক্ষা বেশ ব্যাপকই হয়েছে এবং বাঙলার ইসথেটিকস ও সাহিত্যবিচারকে বেশ একটা প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে কবির মতামতের একটা সারসংক্ষেপ এখানে রাখা হল।

(ক) কবির মতে সাহিত্যিকের মনের বাসনায় অনুরঞ্জিত বিশ্বব্যাপারের ভাষায় প্রকাশই সাহিত্য। সাহিত্যে একটি মিলনের ভাব আছে, কবি মনের সঙ্গে বিশ্বের মিলন, আবার কবিমনের সঙ্গে মানব মনের মিলন। এই মিলনের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল স্রষ্টার, কারণ, সাহিত্য দৃষ্টবস্তুর বিবরণ নয়, তার উপর নির্ভর করে নোতুন বিশ্বের সৃজন।

(খ) রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের বিষয় চিরকাল মানবিকই থাকবে। স্নেহ-প্রেম, বিরহ-ব্যর্থতা, সৌন্দর্য-অনুভব, বৈপ্লবিক বাসনা—এই সব পরিচিত ও সাধারণ ব্যাপারই কাব্যের। তবে কালে কালে এগুলির বাস্তব উপাদান ও কাব্যরীতি বিচিত্রতর হতে পারে। আধ্যাত্মিক তুরীয় কোনো ব্যাপারের সঙ্গে কাব্যের কোনও সম্বন্ধ নেই। বাস্তব সমাজেও তুরীয়তার আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সর্বজনীন নয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাহিত্যের কাজ চলে সর্বজনীন মনোভাব নিয়ে। 'সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র'। খুচরোভাবে সাহিত্যের উপাদান বলতে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো বাছবিচারের পক্ষপাতী হয়েছেন। তাঁর মতে যে-কোনো বস্তু বা যে-কোনো ঘটনাই সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না। এখানে নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গেই তাঁর মতের মিল হতে পারে না, এমন কি তাঁর নিজের সঙ্গেও সর্বতোভাবে নয়। সাহিত্য কেবল নির্বাচিত বিষয়কেই গ্রহণ করবে এমন নীতি স্বীকার করলে বলতে হয় সাহিত্যের ক্ষেত্র সীমিত। এ বিষয়ে তাঁর অভিপ্রায় এই যে—বাস্তব ঘটনা সব নির্বিকার ভাবে ঘটে যাচ্ছে, একের পর এক, আবার এক সঙ্গে অনেক। শিল্পী তার সব নিতে পারেন না, বাছাই করতে বাধ্য হন। গ্রহণ বর্জনই সাহিত্যের নিয়ম। চরিত্র বলতেও একটা মানুষের সর্বাংশ আমরা নিতে পারি না, বাস্তব কাজের সম্পর্কে যাকে জানি, তার অনেকটাই জানি না। আসল মানুষ থাকে বাহ্য ঘটনার অন্তরালে। তাকে আবিষ্কার করে দেখাতে হলে কল্পনা-নির্ভর গ্রহণ-বর্জনের নীতি মানতেই হয়। কবির এই উপলব্ধি মান্য করতে আমাদের বাধা নেই, একথাও আমরা স্বীকার করি যে "চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন, তখন তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ্য করে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়।" কিন্তু কবি যখন বলেন 'তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পথের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই, অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই, তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়।

কিন্তু কিছুর সঙ্গে কিছুর প্রভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তাহলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে থাকে।" অথবা সামাজিক অমঙ্গল ও পাপকে পরিহার করার নির্দেশ দেন—তখন একটা খটকা লাগে। কারণ, এ তো শিল্পিত বাছাইয়ের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে প্রাকৃত বাছাইয়ের কথা। সেই মধ্য-যুগীয় শ্রেণীবিচারদৃষ্টির কথা। বাস্তবে আমরা প্রায়শই প্রয়োজন সম্পর্কের অর্থাৎ সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে বাছাই করে থাকি। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা এবং তা পরিহার্য এ ভাবনা শিল্পীর কেন হবে। মধ্যযুগে কতক-গুলো নীতি, ধর্ম বা অন্য ধরনের আদর্শবোধকে সামনে রেখে মানুষ বাছাই করা হত। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ নিজেই এরকম শ্রেণীবিচারকে পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপভাবে কুমড়ো ফুল, সজনে ফুলকে সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় বলে ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেও কবিতায় সজনের বেণীর সৌন্দর্য, কুড়চি ও তেঁতুল ফুলের রম্যতা প্রকাশে দ্বিধা করেন নি। সাঁওতাল মেয়ে, দোকানের কুকুর, বেজি, শালিক, চড়ুই, এমন কি পিঁপড়েরও সমাদর করতে তাঁকে দেখা যায়। 'কোপাই' কবিতার শেষের দিকের লাইনগুলোও স্মরণে আসে—

তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক-হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা,
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এরকম বিষয়-নির্বাচনী মনোভাবকে খুব আত্যন্তিক বলে মনে করা যায় না। আমাদের দেশের প্রাচীন সমালোচনায় বস্তুত শ্রেণী-ভেদ প্রতিপন্ন করা হলেও কয়েকজন এমন কথাও বলেছেন যে—বিশ্বে এমন কোনো ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ বা বস্তু নেই যা কবিকর্তৃক গৃহীত হয়ে সৌন্দর্যের কারণ না হতে পারে। পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে আরও সুস্থির অভিমতের আমরা প্রত্যাশী ছিলাম।

(গ) সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঃ এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ আলো-চনার সাহায্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। এবং ভালো সাহিত্য ধর্ম বা দেশহিত বা অন্য কোনো মহত্তর বাস্তব প্রয়োজন সাধন করতে চায় এমন ধারণার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্য এক বিশেষ রীতির আনন্দ দেওয়া

ছাড়া অন্য কোনো কর্তব্য পালন করে না। এদিক দিয়ে তিনি সাহিত্যের জন্য সাহিত্য বা শিল্পের জন্য শিল্প এরকম অভিমতের সঙ্গী। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত কাব্যসমালোচকেরাও একই পথের পথিক। তাঁদের মতে রস বা রমণীয়তাই সাহিত্যের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' পুস্তকের একটি প্রবন্ধে মন্তব্য দেখছি, "আনন্দই হচ্ছে সব শেষের কথা. এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থ নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।" অন্যত্রও জোর দিয়ে বলা হচ্ছে "বলাবাহুল্য বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস সে অহৈতুক।......এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।" এই মনোভাব প্রতীচ্যের বহু রসদর্শীরও। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে এরকম সংকীর্ণ ধারণার সমালোচনাও হয়েছে যথেষ্ট। এই ধারণায় স্থিরভাবে দাঁড়ালে যেমন বিশ্বের প্রথম সারির মহাকাব্য, ট্রাজেডি ও উপন্যাসকে অ-সাহিত্য বলে বর্জন করতে হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও বহু নাটক, কবিতা উপন্যাসকে। একথা ঠিক যে মেঘদূত, ক্ষণিকা অথবা কীট্‌সের কি সুইনবারন-টেনিসনের বহু কবিতার শুদ্ধ-সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোনো আবেদন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই শাজাহান, তপোভঙ্গ, বোধন, রক্তকবরী, তাসের দেশ প্রভৃতি বহু সাহিত্যকৃতিতেই জীবন সান্নিধ্য-পূর্ণ ভাবাদর্শের আবেদন খুবই প্রবল। এরকম সৃষ্টিকে সাহিত্যের উদার ক্ষেত্র থেকে দূর করা যাবে কি? সাহিত্য কেবল শিল্পিত আনন্দের জন্য, মহান জীবনবোধের জন্য নয়, এ মতের বিরোধী পক্ষ মনে করেন যে, সাহিত্যে শিল্পে বিশুদ্ধতার অন্বেষণ মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। কারণ, মানুষের উন্নত চাওয়া-পাওয়ার ধারণা আর আনন্দবোধের ধারণা জড়িত মিশ্রিত, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে লৌকিকে আমাদের যে সব সাধ অপূর্ণ থাকে, কাব্যে স্বপ্নাকারে তারই সিদ্ধি পেতে চাই। উন্নত সাহিত্য মাত্রেই মানুষকে নিয়ে, আর মানুষ একান্তভাবে সামাজিক প্রাণী। লৌকিক জীবনে কোথাও যার স্থান নেই এমন অতিবিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ব্যাপার কাব্যে আভাসিত হলেও শ্রোতা বা দর্শক তাতে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না। কেউ কেউ যদিও বা পারেন, তাঁদের সংখ্যা খুব সীমিত হতে বাধ্য, যেমন সীমিত এই সংসারে ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসীর সংখ্যা। অভিব্যক্তির পথে যাত্রী আজকের মানুষের অভিলাষ হল যা চরম, যা 'সামাম্ বোনাম্' তাকে আমরা জীবনের মধ্যেই পাব, যেমন আজকের বিজ্ঞানের গর্ব হচ্ছে সৃষ্টির মূল রহস্য সৃষ্টি বিশ্লেষণের মধ্যেই ক্রমশঃ ধরা পড়ছে। এ দিকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথও তৎকৃত প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাগুলিতে ধর্মনীতি, সমাজগত আদর্শবোধের দিক থেকেই কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মত কালিদাসের শ্রেষ্ঠ

কীর্তিগুলির রসবিচার করেছেন। ঐ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ট্রাজেডিগুলিরও পরিশোধনধর্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাহিত্য পুস্তকের একটি প্রবন্ধেও সাহিত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে একীভূত করে দেখেছেন। বুদ্ধের গৃহত্যাগ, রামের সঙ্গে লক্ষ্মণেরও অরণ্যযাত্রা, এর কাব্যিক মহনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ বোধ করেছেন।

(ঘ) সাহিত্যের সত্যতা ঃ বাস্তব জগতের ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ তথ্য বলেছেন। সাহিত্যকে এই তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয়েই স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলতে হয়। এই নবনির্মাণ আমাদের মনে অনির্বচনীয় রসসম্পদ দিতে পারে বলে তা সত্য। তথ্যের সঙ্গে সত্যের দুই মেরুর পার্থক্য অনুভব করেছেন কবি। সত্য হল রচনা, নির্মিতি, যা ইতিবৃত্ত থেকে ভিন্ন জাতের। এই প্রসঙ্গে তিনি কীট্স্-এর 'ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ট্রুথ' বাক্য বারংবার উদ্ধার করেছেন এবং বলেছেন যে বাইরের চোখকানের নয়, 'হৃদা মনীষা মনসা' যে উপলব্ধি তাই হল সত্যের উপলব্ধি। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।' স্বভাবসত্য নয়, ভাবসত্য। এই ভিত্তিভূমিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ্যারিস্টট্ল তথা এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মিল লক্ষণীয়। তবে এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে শেলির মত এমন চরম কথা শোনাতে দেখা যায় না যে কবিরাই আসলে দেশ-নেতা ও চালক, অবহেলিত থাকেন এই পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ বরং নীতিধর্মের পথ থেকে কবিদের সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত। নিজের সম্পর্কে তাঁকে বলতে শোনা যায়—আমার পদ গুরুর পদ নয়, আমি দেশের চালক বা নেতা নই, আমি নাচি, গাই, বাঁশি বাজাই। আর তা-ই আমাকে মুক্তি দেয়।

(ঙ) সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যের আনন্দ উপভোগ ব্যক্তিগত, না, সমাজ-গত ? এর বিচারে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সৃষ্টি ও ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ লাভ বলে কখনও কখনও চিহ্নিত করেছেন, আবার এমনও বলেছেন যে রচয়িতা ঐ ব্যক্তির মধ্যেই সমাজ বা শ্রেণী লুকিয়ে রয়েছে, আর আনন্দপ্রাপ্তির ব্যাপারটিও সামাজিক। মানবমনের কতটা অংশ ব্যক্তি, আর কতটাই বা সমাজ, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ না পাওয়া গেলেও সাহিত্যের প্রকাশের দিক যে একটি সামাজিক কাজ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি, ব্যাপারটির একটি সারসংক্ষেপ ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। সাহিত্যের রচনা ও আস্বাদে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক অংশ সুনির্দিষ্ট না থাকায় আজকের বিশ্বে এমন ধরনের উৎকট মনোভাবের সাহিত্যিকও জন্মাচ্ছেন যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ অহংবোধকে যা-হোক-একটা রূপরেখায় চিহ্নিত করে সাহিত্য নামে প্রকাশ করছেন, আর তাই নিয়ে মাতামাতি করারও সুযোগ পাচ্ছেন।

মুদ্রণ, পত্রপত্রিকার প্রকাশ এবং যানবাহন প্রভৃতির সুবিধা এবিষয়ে সহায়তা করছে। মোটামুটি উনিশশতক পর্যন্ত দৃশ্য এবং শ্রব্য সাহিত্যের সামাজিক ভঙ্গিমাই প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা এবং গীতিকাব্যের আত্যন্তিক প্রসার তার আত্মহননের পথ এইভাবে খুঁজছে। ব্যক্তিমানসের বিচ্ছিন্নতাকামী প্রকাশ ও অন্যান্য রুগ্নতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নবত্ব, আধুনিকতা প্রভৃতি প্রবন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা যদ্যপি করেছেন, এসবের মূলে প্রবেশ করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অস্বাভাবিকতার বিষয়টি তেমনভাবে পর্যালোচনার অবকাশ পাননি। অধুনাপূর্ব সাহিত্যকে শ্রেণীসাহিত্য নামে কদাচিৎ চিহ্নিত করা গেলেও তা এমনতর অসামাজিক ছিল না। অন্তর্গূঢ় মনোভাব এবং বিকৃত ভাষার সমবায়ে হট্টগোল জমানোও তখন সহজ ছিল না। আর মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্য তো নিঃশেষে গণসাহিত্যই। এ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট্‌ আর্ট, ডাডায়িজ্‌ম, সুরিয়্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতির উৎসাহ গোষ্ঠীবিশেষের ও সাময়িকের অভিনন্দন লাভ করলেও তার স্থায়িত্ব কালের কসৌটীতে টিঁকবে কি না তা ভাবিকালই বলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নিঃশেষ বিচার কালের উপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। সাহিত্যকে দৈববাণী এবং সাহিত্যিককে প্রকাশের মিডিয়াম হিসেবে বিবেচনা করাতেও তাঁর অহং বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে।

(চ) সাহিত্যে সুরুচিঃ সাহিত্যে রুচিহীন অসামাজিকতার প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন। কিন্তু নীতির দিক থেকে নয়, সাহিত্যের দিক থেকেই করেছেন। পাপ এবং অমঙ্গলের ছবির পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনে সাহিত্যরস বাধিত হয় এই তাঁর অভিমত। এসব চিত্র বর্জন করতে বলেন নি, ইঙ্গিতে আভাসে রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের দৈহিক লালসাকে উদ্দীপিত করে পাঠকের মন জয় করতে চান যাঁরা, তাঁরা শক্তিহীন সাহিত্যিক। ভঙ্গিপ্রবণতার ক্ষেত্রেও শক্তিহীনতার প্রসঙ্গ তিনি তুলেছেন। তিনি বলেন যে এসব উৎকট রচনার মৌকিত্ব পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে। তা ছাড়া এগুলির আয়ুষ্কালও সামান্য।

লক্ষণীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী ও শুদ্ধসৌন্দর্যবাদী হলেও সাহিত্যের নির্মাণ ও প্রকাশে সমাজের দাবি লঙ্ঘন করতে পরামর্শ দেননি।

রোঁমা রোলাঁর সাহিত্যভাবনা :
জীবন ও সৃষ্টির আলোয়

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচ· জি· ওয়েলস রোলাঁকে লিখেছিলেন : "পৃথিবীতে আর এমন একজন লোকও নেই যাঁকে আমি আপনার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি। এর কারণ আপনার সাহিত্যিক প্রতিভা নয়; মানুষের প্রতি প্রেমের ধর্মে আপনার সুগভীর আস্থাই আমাকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করেছে।"

এই মানবপ্রেমকে রোলাঁ স্বদেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন। ফ্রান্সের লোক সেদিন তা ভুল বুঝেছে। ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করবার কথাও ভেবেছিল। রোলাঁ এই বিরূপ পরিবেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে জীবন কাটিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডে। 'জাঁ-ক্রিস্তোফ'-এর বন্ধু ওলিভিয়রের মুখ দিয়ে রোলাঁ বলিয়েছেন : "আমি ফ্রান্সকে ভালোবাসি। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য নিজের আত্মাকে হত্যা করতে পারি না এবং বিবেককেও প্রতারণা করতে পারি না। তা যদি করি তবে তো জন্মভূমিকেই প্রতারণা করা হবে!"

রোঁলার শিল্পভাবনা একমাত্র মানবপ্রেমকে লক্ষ্য করেই বিস্তার লাভ করেছে। এই ভাবনা ধীরে ধীরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং রোলাঁর শিল্পাদর্শ জানতে হলে তাঁর জীবনের সঙ্গে একটু পরিচয় থাকা দরকার।

একটি ছোট্ট নামে বিশ্ববিখ্যাত হলেও মা-বাবা তাঁর এক দীর্ঘ নামকরণ করেছিলেন : রোম্যান এডমে পল এমিলি রোলাঁ মধ্য ফ্রান্সের ক্ল্যামেন্সিতে তাঁর জন্ম হয় ২৯ জানুয়ারী, ১৮৬৬। ইওনে নদী থেকে কেটে আনা একটি নালার উপরে ছিল তাঁদের বাড়ী। চারদিকে সবুজ বনাচ্ছাদিত পাহাড়, একটু দূরে নদী। এই শান্ত পরিবেশে পরিবারের সবাই ছিল মোটামুটি সুখী। রুগ্ন কৃশ রোলাঁর কাছে বাড়ী এবং স্কুল দুই-ই মনে হত জেলখানার মতো। মুক্তি ছিল বইয়ের জগতে। পড়তেন নানা বই। আর ছেলেবেলা থেকে শুরু করেছিলেন লেখা। খাতার পাতা ভরে যেত নাটক-উপন্যাসের খসড়ায়।

প্রখর অনুভূতিশীল বালক রোলাঁর উপর মার প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে

বেশী। বাবা থাকতেন একটু দূরে দূরে। মা তাঁকে দিয়েছিলেন সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা। সংগীত জীবনের অবলম্বন হবে, ছেলেবেলা থেকেই রোলাঁর এই ছিল বাসনা। কিন্তু প্যারিসে এসে একোল নর্মাল সুপিরিয়রে তাঁকে ভর্তি হতে হল শিক্ষকতাবৃত্তির পাঠ গ্রহণ করতে। তথাপি বিশ বছরের যুবক রোলাঁ এখানেই শিল্প-সাহিত্যের আকর্ষণময় এক উজ্জ্বল জগতের সন্ধান পেলেন। পরিচয় ঘটল টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি ও আর্নেস্ট রেনানের রচনার সঙ্গে। টলস্টয়ের সঙ্গে যেন অনুভব করলেন আত্মার আত্মীয়তা। পড়লেন সেক্সপীয়র, থ্যাকারে প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের বই। রোলাঁর প্রথম নাটক 'অর্সিনো' সেক্সপীয়র পাঠের প্রেরণা থেকেই রচিত। এবং থ্যাকারের অনুসরণে লিখেছিলেন 'আমর দ্য-এনফান্ট'। এই বিদ্যালয়ের যে অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছিল তা হল ভাগনারের অপেরার সঙ্গে পরিচয়।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রোলাঁ ইতিহাসের স্নাতক হন। ফল বেরুবার আগে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ড। সেখানে বীঠোভেন, বাখ এবং সাধারণভাবে ধ্রুপদী সংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। এর পর থেকে শিক্ষকতাবৃত্তির প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা বেড়েই চলল। শুধু মা আঘাত পাবেন বলেই তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। না হলে হয়ত তখনই সরবোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংগীতের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিতেন। ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশের জন্য টলস্টয়কে তিনি চিঠিও লিখেছিলেন। এর মধ্যে রোমে গবেষণার জন্য সরকারী বৃত্তি দেবার প্রস্তাব এল। রোলাঁ তা গ্রহণ করলেন। প্যারিসের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁর পক্ষে দিনে দিনে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ রোম শহরের পরিবেশ থেকে হয়ত নতুন কোনো প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে,—এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু তাঁর গবেষণার বিষয়টি ভালো লাগেনি। মাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'হোলি সী ও ফ্রান্স'—এই বিষয়ে গবেষণা করে লাভ কি? দেশের লোক যখন ক্ষুধায় কাতর তখন কি হবে এমন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে?

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রোমে এসে পরিচয় হল তিয়াত্তর বছরের মহিলা ম্যালউইদা ভন মিসেনবার্গের সঙ্গে। তিনি ছিলেন নীটশে, ভাগনার, মোৎসার্ট প্রভৃতির মতো লেখক ও শিল্পীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁর সাহচর্যে রোলাঁ পেলেন সংগীত ও সাহিত্য জগৎ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি।

প্যারিসে ফিরে এলেন দু বছর পরে। জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষকতা করতে হত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। পড়াতেন নানা বিষয়,—ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র, শিল্পের ইতিহাস ইত্যাদি। এই সঙ্গে য়ুরোপীয় অপেরার উপর চলছিল তাঁর গবেষণা। এদিকে দু'একটা লেখার সাফল্য দেখে রোলাঁর

মনে নতুন করে দ্বিধা জাগলঃ চাকরি ছেড়ে লেখা ও সংগীতচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করলে কেমন হয়? শুভার্থীরা অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে নিষেধ করায় কিছুদিন চুপ করে রইলেন। ১৮৯২-এর অক্টোবর মাসে বিয়ে করায় তখনকার মতো চাকরি না ছাড়াই সংগত বলে মনে হয়েছিল তাঁর। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে রোলাঁর আস্থা ছিল না। তাই গির্জায় না গিয়ে বিয়ে হল রেজিস্ট্রারের আপিসে। এতে মা'র ছিল ঘোর আপত্তি, বিয়েতে তিনি আসেননি। বিয়ে অবশ্য বিশেষ সুখের হয়নি। নয় বছর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

সংগীত বিষয়ক গবেষণাপত্র দিয়ে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রোলাঁই প্রথম ডক্টরেট পেলেন। আর সংগীতের অধ্যাপকের পদও তাঁর জন্যই প্রথম সৃষ্টি হল। গ্রন্থাকারে তাঁর থিসিস প্রকাশিত হয় ১৮৯৫-এ; নাম—*L'Histoire de l'opera en Europe avant Lulli et Scarlette.*

সরবোনে অধ্যাপনা করবার সময়ই রোলাঁ কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। মঞ্চে তাদের কিছু সাফল্য রোলাঁকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'জাঁ ক্রিস্তোফ' আট বছর ধরে এক বন্ধুর সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই গ্রন্থের জন্য আনাতোল ফ্রান্সের জোর সুপারিশে রোলাঁ সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। 'জাঁ ক্রিস্তোফে'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দিলেন রোলাঁ। একান্তরূপে সাহিত্যচর্চা করবেন, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তা সম্ভব হল না। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর ভাবনার অনেকটাই অধিকার করে নিল। একমাত্র শিল্পসাহিত্যের চর্চা করে জীবন কাটানো সম্ভব হল না।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁ সুইজারল্যাণ্ড বেড়াতে গেলেন। কিছুদিন পরেই শুরু হল যুদ্ধ। যুদ্ধের বিরোধিতা করে অক্লান্তভাবে লিখেছেন প্রবন্ধ ও পুস্তিকা। 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' পুস্তিকাটি প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করে-ছিল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষই রোলাঁকে সমর্থন করেছে; কিন্তু সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ যাদের মনে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে তারা রোলাঁর উপর ক্রুদ্ধ, অনেক কটূক্তি জুটল তাঁর ভাগ্যে। ফরাসী সরকার একবার তাঁকে গ্রেপ্তার করবার কথাও ভেবেছিল। স্বদেশবাসীর এই বিরূপ মনোভাবের জন্য তিনি বাকী জীবনটা প্রায় বিদেশেই কাটিয়েছেন। ফ্রান্সকে রোলাঁ গভীর-ভাবে ভালোবাসতেন, কিন্তু অন্ধ সংকীর্ণ দেশপ্রেম তাঁর ছিল না। সংকীর্ণ দেশপ্রেমের সঙ্গে উদার মানবতাবাদের সংঘর্ষ যখনই বেধেছে তখনই রোলাঁ বিশ্বজনীন মানবতাবাদকে সমর্থন করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে মানবতাবাদের পরাজয়ে মর্মাহত রোলাঁ বিশ্বাসের আশ্রয়

খুঁজে পেয়েছিলেন বোলশেভিক বিদ্রোহে এবং কম্যুনিস্ট মতবাদে। অবশ্য তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। কারণ রোলাঁ বিপ্লবের সমর্থক হলেও তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে যুক্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি তাঁর সায় ছিল না। নব ভাবনার সূচনাকারী হিসাবে একদিকে তিনি বিপ্লবকে আহ্বান করেছেন, অন্যদিকে হিংসার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল বিরূপতা। বিপ্লব ও হিংসার দ্বন্দ্বে তাঁর ভাবনার জগৎ আন্দোলিত হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

বিশের দশকে রোলাঁ ভারতের ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। বিশেষ করে পরিচয় ঘটল রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর জীবন ও কর্ম-ধারার সঙ্গে। কেউ কেউ মনে করেন, ভারতের সঙ্গে এই যোগাযোগই হয়ত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অল্প কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। জাপানে কবি 'ন্যাশনালিজমের' উপর যে বক্তৃতা দেন তা পড়ে রোলাঁ মুগ্ধ হন। রোলাঁর 'ডিক্লিয়ারেসন অব ইণ্ডিপেনডেন্স অব দি স্পিরিট'-এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রোলাঁর মানবতাবাদের আদর্শ উপলব্ধি করতে হলে এই ঘোষণাপত্রটি অবশ্য পাঠ্য। এর মূল কথা হলঃ

"We serve Truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste . . . We shall work for it . . ."

১৯৩০ থেকে রোলাঁর জীবনের রাশিয়ান পর্ব শুরু এবং তার ব্যাপ্তি মৃত্যু পর্যন্ত। রাশিয়া সম্বন্ধে রোলাঁর আগ্রহ নতুন নয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টা তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর মতে এই বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্যম পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য। তারপরে টলস্টয়ের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে লিখেছেন তাঁর জীবনী। স্বদেশে তেমন অভি-নন্দিত না হলেও রাশিয়ায় এ বই সমাদর লাভ করেছিল। ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল অনেক দিন যাবৎ। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ কিভাবে নতুন করে গড়ে উঠছে সেই নিয়ে তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের বিনিময় হত। গোর্কির মৃত্যুতে তিনি এমন গভীর শোক পেয়েছিলেন যে পিতার মৃত্যুতেও তা পাননি।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। পাত্রী মাদাম কুদাচোভা। বিধবা রাশিয়ান মহিলা। রোলাঁর বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করছিলেন এই মহিলা, সেই সূত্রে পরিচয় ও প্রণয়।

পর বৎসর রোলাঁ রাশিয়া ভ্রমণে গেলেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতি দেননি বা কিছু লেখেননি। এ থেকে

মধ্যে ফারাক ছিল বিস্তর। তিনি হেরমান হেসেকে এই স্বপ্নভঙ্গের কথা একান্তে জানিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এ বিষয়ে সংশয় নেই যে রাশিয়ার সংস্কারমুক্ত, জাতিবিদ্বেষহীন, উদার সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা পেয়েছিল তাঁর অভিনন্দন। বিশেষ করে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন নবযুগের রাশিয়ান তরুণ-দের—যারা দেশপ্রেমিক, জীবনপ্রেমী, কঠোর পরিশ্রমী এবং আদর্শবাদী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোলাঁর আপোষহীন শান্তিবাদ কিছুটা কোমল হয়েছে দেখা যায়। ততদিনে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ফ্যাসিবাদের স্বরূপ। তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিনি হয়ত শান্তিবাদের বিরুদ্ধাচরণ বলে মনে করেননি। শান্তিবাদের প্রতি তাঁর গোঁড়ামি যে কিছুটা শিথিল হয়েছিল তার অন্যতম কারণ বন্ধুপ্রীতি। তাঁর বন্ধু শার্ল পাজি প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যান। শার্ল প্রতিষ্ঠিত কাগজ-এ 'জাঁ ক্রিস্তোফ্' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আশংকায় য়ুরোপের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বইয়ের বিক্রি কমে যাওয়ায় লেখকরা আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হলেন। রোলাঁও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। খোঁজ নিলেন হলিউড 'জাঁ ক্রিস্তোফ' চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবে কিনা। ১৯৩৪-এর ২৯শে ডিসেম্বর ক্ষয়রোগে রোলাঁর মৃত্যু হয়।

রোলাঁর রচনাবলী মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১· সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। এর মধ্যে আছে সঙ্গীত সমালোচনা, সঙ্গীতের ইতিহাস এবং সঙ্গীতশিল্পীদের জীবনী।

২· নাটক। তাঁর লেখক জীবনের প্রথম দিকে নাটক ও মঞ্চ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

৩· উপন্যাস। ৪· প্রবন্ধ ও জীবনী।

পৃথকভাবে এই চার শ্রেণীর রচনার মানবতার সপক্ষে রোলাঁ কি বলেছেন তা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লেখকের ভাবনা ও অনুভূতি, শিল্পাদর্শ ও জীবনাদর্শ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে; নাটক বা উপন্যাস থেকে তাকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না। ধরা যাক সঙ্গীতের কথা। সঙ্গীতও যে শুধুই চিত্তবিনোদনের উপায় নয়, মানবতার সপক্ষে যে তারও কিছু বলবার আছে, সে কথা আমরা 'জাঁ ক্রিস্তোফ' থেকে যতটা উপলব্ধি করতে পারি, সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে ততটা পারি না।

শিল্পের জন্যই শিল্প নয়, জীবনের জন্য শিল্প কী করেছে তা দিয়েই শিল্পকর্মের বিচার করতে হবে। এই ধারণা রোলাঁর মনে দৃঢ় হয়েছে টলস্টয়ের বই পড়ে। তরুণ রোলাঁ টলস্টয়ের কাছ থেকে শিখেছেন বিশ্ব-

ভ্রাতৃত্বের বাণী এবং মানুষকে ভালোবাসার কথা। সমাজের নীচু তলার মানুষদের প্রতি তাঁর যে মমতা তারও অন্যতম প্রেরণা টলস্টয়ের রচনাবলী। 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' থেকে উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের বিরাটত্ব। এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তি যা জীবনকে চালিত করে 'ওয়ার অ্যান্ড পীসে' তার পরিচয় পেয়ে রোলাঁ চমকিত হয়েছিলেন। 'জাঁ ক্রিস্তোফে' টলস্টয়ের প্রভাব স্পষ্টই লক্ষণীয়।

কিন্তু টলস্টয়ের শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে যে গোঁড়ামি ছিল রোলাঁ তা থেকে ছিলেন মুক্ত। ভাগনার ও বীঠোভেন রচিত সংগীত এবং বহু খ্যাতিমান লেখকের রচনা টলস্টয়ের বিচারে বাতিল হয়েছে। রোলাঁ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বিচারে সায় দিতে পারেননি। রোলাঁ ছিলেন বীঠোভেনের ভক্ত। যৌবনে ভাগনার তাঁর প্রিয় ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় অবক্ষয়-ধর্মিতার জন্য আর ভালো লাগত না। টলস্টয়ের 'হোয়াট ইজ আর্ট' গ্রন্থে এমন অনেক মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত যা পড়ে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। রোলাঁ বলেছেন, টলস্টয় সৃষ্টিধর্মী লেখক, সমালোচক নন; তাই তাঁর শিল্প সম্বন্ধে মতামত সর্বত্র বিচারসহ নয়।

শিল্প-সাহিত্য সার্থক হবার প্রথম শর্তই হচ্ছে জীবনধর্মিতা। টলস্টয়ের এই মূল তত্ত্বটি মেনে নিয়ে রোলাঁ শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছেন। জীবনের আবর্ত যাদের টেনে নিয়ে চলছে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যাদের নিরন্তর সংগ্রাম তাদের জন্য এমন শিল্পকর্ম চাই যাতে আছে সংগ্রামশীল জীবনের প্রতিফলন। এই সংগ্রাম অনেকটাই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নাটকে, প্রাণবন্ত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এই জন্যই তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে নাটকের প্রাধান্য। রোলাঁর প্রথম অপ্রকাশিত রচনাও নাটক। নাটকে জীবন, শিল্প ও আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। জনসাধারণ যাতে বিপ্লব-সচেতন হতে পারে সে জন্য ফরাসী বিপ্লবের একেকটি ঘটনা অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। এ ছাড়া ড্রেফুস প্রসঙ্গ নিয়েও রচনা করেছিলেন আর একটি নাটক। এটি মানবতার সপক্ষে রোলাঁর শিল্পিত ঘোষণা। তখন ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবিরা ড্রেফুসের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর, কাগজে প্রবন্ধ লেখায় জোলাকে ইংলন্ডে যেতে হল স্বেচ্ছানির্বাসনে। রোলাঁ নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানা-লেন 'নেকড়ের পাল' নাটকটি লিখে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত এই নাটকের সাফল্যই তাঁকে উৎসাহিত করেছিল ফরাসী বিপ্লবের উপর নাটক-মালা রচনায়।

নাটক রচনা করেই রোলাঁ ক্ষান্ত হননি। অভিনয়ের রীতি, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন 'দি পীপলস্ থিয়েটারে'।

তাঁর মতে জনতার জন্য নাটকের বিষয়বস্তু হবে সমাজবাদী, জীবনের সত্যকে উদ্‌ঘাটন করাই হবে অভিনয়ের উদ্দেশ্য। সত্যের স্থান সুন্দরের উপরে। তিনি বলেছেন:

"A nation might conceivably do without beauty, but it ought not, if it cannot dispense with truth."

তাই কৃত্রিম অভিনয় ও মঞ্চসজ্জার মায়া দিয়ে সত্যকে আচ্ছন্ন করবার বিরোধী ছিলেন। অভিনয় হবে অনাড়ম্বর, সরল ও স্বাভাবিক; মঞ্চে যন্ত্রপাতির ব্যবহার যথাসম্ভব কম হবে, অলঙ্করণ ও সজ্জা যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন না করে। রোলাঁর এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের যাত্রাভিনয়ের সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাংলায় এবং ভারতে যে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয় তার প্রেরণা রোলাঁর 'পীপল্‌স থিয়েটারে',—আমাদের যাত্রা নয়। সকল সমাজবাদী দেশেই, বিশেষ করে য়ুরোপের, রোলাঁর পীপ্‌লস থিয়েটারের প্রভাব পড়েছিল। উইলিয়ম টমাস স্টার রোলাঁর পীপল্‌স থিয়েটার সম্বন্ধে বলেছেন:

"His theatre is not an article of fashion or dilettante activity. It is the expression of a new society. It is a question of creating a new art for new world. New art for the people —champion of the future.

"Rolland considered the theatre not simply as an art form, but as a medium of expression, the purpose of which lies outside the form. His basic premise was that art does not have for its object the suppression or exemplification of the struggle, but the multiplication and intensification of life."

পীপলস্‌ থিয়েটার কেমন হবে তার সার কথাটি রোলাঁ বলেছেন এই ভাবে:

". . . a drama simple and vigorous, played throughout the countryside where energy of talent, the creative power which lies in the heart, and the youthful imagination of an entirely new people will do away with mere physical means, sumptuous stage settings and costumes without which the dramatists of this out-worn age cannot move."

রোলাঁর থিয়েটার সম্বন্ধে এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় তাঁর শিল্প ভাবনায় সমাজবাদ প্রাধান্য লাভ করেছিল; টলস্টয়ের শিল্প বিচারের মানদণ্ড ছিল নৈতিক আদর্শ।

শিল্পের এই সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তোফের' মধ্যেও উপস্থিত। বিশ শতকের এই মহৎ উপন্যাস এক সঙ্গীত-

শিল্পীর সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এ ইতিহাস জীবনব্যাপী, তাই জীবনের মতোই এর বিরাট বিস্তৃতি, যা আট লক্ষ শব্দে সম্পূর্ণ। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক। বাবা-ঠাকুর্দা দুজনেই পাড়াগাঁয়ের গাইয়ে-বাজিয়ে লোক। বাবা স্থানীয় থিয়েটারের বেহালা বাদক। ছেলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বাবা উল্লসিত। কিন্তু ঠাকুর্দা সংযমী; তিনি বললেন, পাড়া মাতিয়ে ওর মাথাটা খারাপ করে দিও না। সহানুভূতির সঙ্গে পথ দেখাও।

ক্রিস্তোফ তখন কৈশোরের দ্বারে উপনীত। একদিন মামী গটফ্রিড এসে তাদের বাড়ী উপস্থিত। তিনি কারো কাছে না শিখেও সুন্দর বাজাতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি সঙ্গীতের সহৃদয় বোদ্ধা। ক্রিস্তোফ তাকে নিজের রচিত একটি গৎ বাজিয়ে শোনাল। কেমন লাগল তোমার?—উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন। গটফ্রিড বলল, কিচ্ছু হয়নি।

বেদনায় বিহ্বল হয়ে আকুল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কেন?

গটফ্রিড শান্ত ভাবে বলল, "When you wrote that *you had nothing to say.* Why did you write it?"

আরও বললেন, "You wrote to be admired, you were proud, you were false, and you have been punished . . . Music must be humble and sincere."

যে সৃষ্টির পশ্চাতে সাধনা নেই তা মৃত্যুকে পরাভূত করতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ী সেই সৃষ্টি এমন অবহেলার বস্তু নয়। সেদিন থেকে ক্রিস্তোফ স্থির করল সে আর কখনো এমন সংগীত রচনা করবে না যা হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত নয়। প্রসংগক্রমে মনে পড়ে 'বিমুগ্ধ আত্মা' উপন্যাসে শিল্পসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে রোলাঁ যা বলছেন সেই কথা। মহৎ শিল্পের সৃষ্টি মানবশিশু জন্মের পদ্ধতির মতোই। শুক্রবীজ থেকে ভ্রূণ, ভ্রূণ থেকে মানব মূর্তির অবয়বের রূপেরেখা, তারপর মানবকের জন্ম। একটু একটু করে মা-বাবার রক্ত দিয়ে গড়ে ওঠে শিশু। তেমনি সৃষ্টিকর্ম শিল্পী বা লেখকের রক্ত থেকে জন্ম না নিলে তা মহৎ হতে পারে না।

যাই হোক, গটফ্রিডের উপদেশ হল ক্রিস্তোফের জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রই তাকে নিয়ে গেছে প্রকৃত শিল্পসাধনার পথে. ক্ষুদ্র লোভ বাধা সৃষ্টি করতে চেয়ে পরাজিত হয়েছে তার দৃঢ় সংকল্পের কাছে। শেষ পর্যন্ত সে সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে সাফল্য লাভ করলেও 'জাঁ ক্রিস্তোফ' প্রকৃতপক্ষে জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস, সফলতার নয়। মেহনতী মানুষের সঙ্গে এইখানে ক্রিস্তোফের নিবিড় যোগ। সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে সাফল্য লাভ করেও এদের সে ভোলেনি। তথাকথিত শ্রমিক নেতারা তাকে 'শিল্পী' বলে বিদ্রূপ

করে। অভিযোগ, ক্রিস্তোফ শুধু আলস্যে দিন কাটায়। সে জবাব দেয়, মিথ্যে কথা, ছেলেবেলা থেকে কঠোর পরিশ্রম করে বাঁচতে হয়েছে, জীবনের জ্বালা ও দুঃখ আমার মতো আর কে জানে?

সে মে দিবসের জন্য শ্রমিক ভাইদের একটি সঙ্গীত রচনা করে দিল। গোলমাল হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও যোগ দিল মিছিলে। এখানেই সে হারাল তার প্রিয়তম বন্ধু ওলিভিয়েরকে। বিপ্লবের সঙ্গে হিংসা ও মৃত্যু যে অবিচ্ছেদ্য তা প্রমাণিত হল।

এই রোলাঁই ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কমিউনিস্ট বন্ধু আঁরি বারবুসকে এক পত্রে লিখেছেন—'পশ্চিম ইউরোপ যেন একটা প্রকাণ্ড পশু। সে তার ক্ষত স্থান চাটছে, কিন্তু থামছে না। নতুন ক্ষতের মধ্য দিয়ে সে তার হারানো শক্তি ফিরে পেতে চাইছে। কিন্তু আমার তো ভয় হয়, যেটুকু রক্ত আছে, নতুন ক্ষত হলে তা-ও থাকবে না...বিরাট বিপ্লবের যে শক্তি আছে তা আমি জানি। জানি বলেই যে-সব জাতি অবসাদে অসাড় ও প্রচণ্ড আলোড়নের সামনে পড়েছে, বিপ্লবের মধ্যে তাদের বাঁচার কোন পথ দেখি না... না বারবুস, আমি নৈরাজ্যবাদী নই। আমি জানি প্যারী কমিউন একদিনে তৈরী হয়নি, আমি জানি মানুষের ঐক্য এক শতাব্দীতে আসবে না...কিন্তু সেই হিংসার বিরুদ্ধে আপনারা এক বিপরীত হিংসাকে অস্ত্র-সজ্জিত করছেন। আমার বিশ্বাস এই উভয় পক্ষই ধ্বংস হবে।' আসলে দুই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের মাঝে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় রোলাঁর 'আলোকপ্রাপ্ত' মানবতাবোধে যে গণ-চেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছিল, সেই স্তরে আসতে তাঁকে অনেক দ্বন্দ্ব ও বেদনা পার হতে হয়েছে। তিনি গোর্কির 'ওরা ও আমরা' প্রবন্ধের বই অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন 'পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ কয়েদীর মত কারাপ্রাচীরের সংকীর্ণ অবরোধে ঘুরে মরছেন। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে আকাশ-থেকে মুক্তির স্বাদ পাবার চেষ্টা করছেন, কখনো ব্যক্ত করছেন নিষ্ফল কৃচ্ছ্র-সাধনের দাম্ভিক অহমিকা। এদের এই বিষণ্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে গোর্কি সন্ধান দিলেন, বিপ্লবোত্তর নতুন সমাজে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের এক বলিষ্ঠ সুন্দর হৃদয় বিনিময়ের। বিপ্লবী জনগণের মধ্য হতে এমন এক আবেগময় শক্তির অভ্যুদয় হয় যা কেন্দ্রীভূত হয়ে আবার জনসাধারণের মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করে' (শিল্পীর নবজন্ম)। রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর চতুর্থ খণ্ডে এই অর্থেই শিল্পের ভূমিকা ব্যক্ত হয়েছেঃ—

'The highest art is above the temporary loss, it is a comet sweeping through the infinite . . . it is like the sun whence it is sprung. The sun in neither moral nor immoral. It is that which is. It lightens the darkness of space. And so does art.'

রোলাঁকে কমিউন পত্রিকা ১৯৩৬ সালে প্রশ্ন করেছিল—'আপনি কেন লেখেন?' জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ 'কেন লিখি আর কাদের জন্য লিখি, এ দুটো প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন ভাবি না।...প্রত্যেক মানুষ শ্বাসযন্ত্র দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। প্রত্যেকেরই কাজ করার নিজস্ব ভঙ্গি আছে। যেমন মানুষ তেমনি কাজ। হয় নৈরাজ্যবাদী, নয়ত আশাবাদী; হয় স্বার্থপর, নয়ত সমষ্টিকল্যাণগত। আমার সব কাজ চিরদিনই গতিমুখী। যারা থেমে নেই চিরদিনই আমি তাদের জন্য লিখেছি। আমি নিজে কোনদিনই থামিনি। আশা করি, যতদিন বাঁচব, থামব না।...সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত গণতন্ত্র সঙ্ঘের সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের উত্তাল তরঙ্গ তাদের নিয়ে চলেছে। তাদের ভাগ্যই আমার ভাগ্য' (শিল্পীর নবজন্ম)।

রোলাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'জাঁ-ক্রিস্তোফ' কেবলই এক সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনকাহিনী নয়, এক সংগ্রামী মানুষের জীবনকথা। এই মহৎ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন এই বলেঃ

'To the free souls of all nations, who suffer and fight on, and shall conquer.'

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে জীবনশিল্পী ক্রিস্তোফ আচ্ছন্ন অবস্থায় এমন ভাবে হাতের সব ভঙ্গি করতে লাগল যেন সে সিম্ফনি-অর্কেস্ট্রার নির্দেশ দিচ্ছে।

সাহিত্যভাবনায় জঁ-পল সার্ত্রে

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ফ্যাসিবাদী বিশ্বযুদ্ধ সারা ইউরোপে যখন দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বর্বরতা ও সমস্ত রকম মূল্যবোধহীনতাকে শিল্প-সাহিত্যের বাস্তবতা বলে প্রচার করছে, সেই সময়ে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তরুণ মনে প্রভাববিস্তার-কারী আঁদ্রে জিদের মত, জঁ-পল সার্ত্রেও সারা ইউরোপীয় যৌবনকে শিরদাঁড়া সোজা রাখার একটা যোগব্যায়াম দিয়েছিলেন তাঁর অস্তিত্ববাদী দায়বদ্ধতার ('আঁগাঝমাঁ') তত্ত্বের আবিষ্কার দিয়ে।

জীবনে ও সাহিত্যে ফ্যাসিবাদী বুর্জোয়া বাস্তবতাকে, পচা নর্দমার ক্লেদাক্ত বিষণ্ণতাকে যখন ইউরোপের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের অধি-কাংশই মাতাল, সেই সময়ে ফ্রান্সের সার্ত্রে বললেন—'স্বাধীন হবার অভিযোগে মানুষ অভিযুক্ত', আর সাহিত্যে এই স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার পদ্ধতি সম্পর্কে বললেন—"পরিবেশের সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের বেগ লেখককে প্রকাশের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা দেয় তা তাঁর নিজস্ব নয়, তার সঙ্গে পাঠক-দের 'ডায়ালেকটিক্যাল কো-রিলেটিভ' হয়।" কাজেই সার্ত্রের সাহিত্যচিন্তা প্রুস্ত্ বা জেম্স জয়েসের মত, জার্মানীর রাইখ্স্ট্যাগ একাডেমীর লেখকদের মত বা স্পেনের 'ফালাঙ্গ' গোষ্ঠীর লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্যদর্শনের মত অবক্ষয়ী ও নেতিবাচক নয়। এই অস্তিত্ববাদী চিন্তা থেকেই তিনি জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের বুকে মঞ্চস্থ করেছেন, তাঁর 'লা মাউচিস' নাটক যা বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসেঃ

১. মৃত্যু ও পরাজয়ের মুখেও সংগ্রামী মেজাজ

২. বিপন্ন ব্যক্তিত্বের জন্য প্রতিবাদী উচ্চারণ

৩. যুদ্ধে নারকীয় তান্ডবের মধ্যে সঞ্চিত গ্লানির জন্য পাপমুক্তির আহ্বান (তুলনীয় 'কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ'—রবীন্দ্রনাথ)।

৪. ব্যক্তি-স্বাধীনতার আর্তি বা 'আঁগোয়াস' ফুটেছে, সেই সঙ্গে রিক্ত ও বিকৃত বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেছেন।

সার্ত্রের সাহিত্যভাবনার সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিফলন পাওয়া যায় তাঁর 'লা নোওজে' উপন্যাসে। এর নায়ক কোথাও মিল খুঁজে পাচ্ছে না, সবই অর্থ-

হীন, নিজের অস্তিত্বটাও বিরক্তিকর। এই নায়কের কাছে বাস্তব জগতটাও কোন কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিচয় রাখছে না, এর মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে এবং এর থেকে মুক্তি চায়—মুক্তি চায় স্বাধীনতাহরণকারী যুক্তিহীন বাস্তবতা থেকে। উপন্যাসের নায়ক এক সময় এক নিগ্রো গায়িকার কণ্ঠের সুরে যে সুষমা ও ছন্দোসংগতি প্রকাশ ঘটল তার মধ্যেই মুক্তি পেতে চেয়েছে।

সার্ত্রে বলেছেন, শিল্প-সাহিত্যের জগতই মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জগত। তিনি যে স্বাধীন সাহিত্যলোক কল্পনা করেছেন তার বাস্তব রূপ নির্মাণ করাই সাহিত্যের আদর্শ—'লে শম্যাঁ দ্য লা লিবের্তে'।

সার্ত্রে বলেছেন, নিজের মধ্যে তো বটেই, পাঠক সাধারণের মধ্যে নানা খাতে সামাজিক উপাদান রয়েছে। যেমন গায়কের জন্য শ্রোতা এবং নাটকের জন্য, ছবি-ভাস্কর্যের জন্য দ্রষ্টা চাই, তেমনি সাহিত্যের জন্য পাঠক চাই, যা না হলে সবই অর্থহীন।

এই প্রসঙ্গে সার্ত্রের 'পুনরাবিষ্কারের তত্ত্ব'টি বোঝা দরকার। এতে তিনি বলছেনঃ

১· কবিতা ও উপন্যাস কবি বা লেখক লেখেন।

২· পাঠক তা পড়েন।

৩· পাঠক তা গ্রহণ বা বর্জন করবেন কিনা নির্ভর করে পাঠকের রুচি ও ভাবনার উপর।

৪ পাঠক যে অর্থে নেবেন সেটাই আসল।

৫· লেখকের মনের রূপ আর পাঠকের মনের অর্থ যদি মেলে তবেই সার্থকতা।

লেখক-পাঠকের এই যোগাযোগ এবং প্রধানত পাঠকের মনন ও অনুভূতির এই পরিস্ফুটন-প্রক্রিয়ার নামই পুনরাবিষ্কার। অর্থাৎ লেখক গতি বা ধারা নির্দেশ করেন+পাঠক গতি নির্ধারণ করেন=পাঠক পুনর্জন্ম লাভ করে বা সাহিত্য সার্থক হয়।

এইখানেই, সাহিত্য রচনার উপযোগিতার বিচারে বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে সার্ত্রের সাহিত্যতত্ত্বের মিল আছে কিনা বিচার করা দরকার। কারণ সার্ত্রের বিশিষ্ট সমালোচক অ্যালফ্রেড স্টার্ণ তাঁর 'সার্ত্রেঃ হিজ ফিলসফি এ্যান্ড সাইকো-এ্যানালিসিস্' বইতে এই মিল দেখিয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্য ভোগ করার ক্ষেত্রে দর্শক-পাঠকদের সক্রিয় হওয়ার যে দাবি ক্রোচের সাহিত্যতত্ত্বে উচ্চারিত, তার সঙ্গে সার্ত্রের পদ্ধতি-প্রকরণের মিল নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে। কিন্তু ক্রোচে যেখানে বলছেন, আস্বাদনই দর্শক-পাঠকের পাবার জিনিস এবং সেই আস্বাদন মূলত সৌন্দর্য, সার্ত্রে সেখানে বলছেন—লেখক বা শিল্পী মনের স্বাধীনতার এষণাকে রূপ দেন আর মানুষ তার রুচি ও অনুভূতি মত

তাকে পুনর্গঠন বা পুনরাবিষ্কার করে। অবশ্য স্টার্ণ এই বিষয়গত ব্যাখ্যা ও পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ না করলেও এক জায়গায় সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ

"Satre concludes that the writers appeal to the readers, freedom to collaborate in the production of the work."

এই বিচারে পাঠক বা দর্শকের স্বাধীনতার অনুভূতির মধ্যেই লেখক বা শিল্পীর অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়।

সার্ত্রের সাহিত্য ভাবনায় যে পরিণামবাদের কথা আছে, তা সার কথা হল, লেখক ও পাঠকের মধ্যে 'উদার চুক্তি'। উভয়েরই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বিকাশ ও পরিণাম রয়েছে। এই পারস্পরিক সচল সম্পর্ক লেখককেও একটা পরিণামবোধেব দিকে ক্রমাগত ঠেলা দেয়। এরই নাম, সার্ত্রের কথায় জগতকে পুনরাবিষ্কার করা এবং এরই মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিণামবাদ।

এখানে ক্রোচের সঙ্গে সার্ত্রের সাদৃশ্য ধরে নিয়েও পার্থক্যটা বোঝা দরকার ঃ

১· ক্রোচের ভাবনায় সৌন্দর্যানুভূতি লেখক ও শিল্পীর নিজের এবং তা পাঠক ও দর্শকের অনুভূতিতে নতুন করে জন্ম নেয়।

২· সার্ত্রের ভাবনায় তা লেখক-পাঠকের যুগ্ম-প্রক্রিয়া।

৩· ক্রোচের তত্ত্বে পাঠক-দর্শকের মন নিষ্ক্রিয় থাকে এই অর্থে, শিল্পে বা লিখিত রচনায় প্রতিফলিত সৌন্দর্যের জন্য অপেক্ষা করে এবং তা পেয়ে সক্রিয় হয়।

৪· সার্ত্রের তত্ত্বে উভয়তই সক্রিয়।

৫· ক্রোচে চান শুধুই প্রকাশ, সার্ত্রের কাছে যুগ্ম-প্রক্রিয়ার ফল বা পরিণাম।

সার্ত্রের মানস-মুক্তি ও সৌন্দর্যের অনুভূতির উৎস হল মানবতা ও বস্তু-জগত। তাঁর সাহিত্যভাবনায় তাই 'বাস্তবতার সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক', সাহিত্যে ও শিল্পে তার গ্রন্থন এবং পরিণামে পুনর্নির্মাণের কথাই বড় হয়েছে। তিনি মনে করেছেন, সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য হল, মানুষকে এই অনুভূতিতে জাগানো—এ জগতে আমাদের প্রয়োজন আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্য স্ববিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে এটাই বেরিয়ে আসে যে, অর্থহীন জগতকে অর্থপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় করে গড়ে তোলে মানুষই এবং তা ঘটে শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে, যাতে তার স্বাধীনতা-বোধ পরিতৃপ্ত হয় এবং জগতকে পুনর্গঠিত করে।

সার্ত্রের সাহিত্য ভাবনায় যে রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে তার মর্মকথা হল ঃ পাঠক বা ভোক্তা মানুষ তার স্বাধীনতার আনন্দকে কখনই উপভোগ বা গ্রহণ করবে না, যদি কোন লেখক বা শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অন্যায়কে

বা অত্যাচারকে সমর্থন জানায়। লেখক-শিল্পী এ ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা চেয়েও পাবে না, উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গ বা চুক্তিভঙ্গ হবে। সার্ত্রে স্পষ্টই বলেছেন, যদি কোন গল্পে বা উপন্যাসে নিগ্রো-নির্যাতন ও শ্রমিক-পীড়নের ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে প্রচার করা হয়, তবে সাধারণ পাঠক তা গ্রহণ করবে না, সে সাহিত্য মহৎ হওয়া তো দূরের কথা, কিছুমাত্র সফল বলে ধরা যাবে না। এটাই হল, সার্ত্রের সাহিত্যভাবনার 'সমাজতান্ত্রিক' দিক এবং এটাই হল, তাঁর 'অস্তিত্ববাদকে, প্রতিভাস-বিজ্ঞানের মতই মূর্ত বাস্তবদর্শন বলার কৈফিয়ত। কিন্তু সার্ত্রের সাহিত্যভাবনায় পরিবেশ ও বাস্তব বন্ধনগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-মূলক সম্পর্ক ও সংগ্রামের কথা আসেনি। যে ঐতিহাসিক পরিবেশকে তিনি বাস্তব বাধা বলে নির্দেশ করেছেন এবং যা থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে পাঠকের সঙ্গে সংযোগ-সাধনের চেষ্টার কথা বলেছেন, তার মধ্যে যতই শ্রেয়-বোধ থাকুক না কেন, কিভাবে তা ঘটবে, সেই সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ রাখতে পারেননি।

অবশ্যই সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও মুক্তির ধারণা সম্পর্কে চিরন্তনতার বাণীকে অস্বীকার প্রভৃতি ধ্যান-ধারণা নিঃসন্দেহে সার্ত্রের সাহিত্যতত্ত্বকে ইতিবাচকতার মর্যাদা দিয়েছে। তথাপি তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন যতটা বের্গসঁ-এর গতিবাদের কাছাকাছি, ততটা মার্কসবাদের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে না। সার্ত্রে বলছেন—'সাহিত্য সমাজের ব্যক্তিসত্তা যা অবিরাম বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই বিপ্লবী ব্যক্তিসত্তা অবিরাম সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনগুলিকে পরিবর্তন করছে, যাতে সামাজিক ভিত্তিতে পচন না ধরে।' উল্লেখযোগ্য যে, এতে অবিরাম গতি, পরিবর্তন এবং পচনশীল সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবই আছে, এমনকি মার্কস তাঁর ফয়েরবাকের গবেষণা বিষয়ে জবাব দিতে গিয়ে যে বলেছেন, 'শুধু ব্যাখ্যা নয়, জগতকে বদলাতে হবে'—এমন রেশও সার্ত্রের দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভাবনায় রয়েছে। তবু কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বের্গসঁ ও মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে সার্ত্রের ভাবনার পার্থক্য হলঃ

(১) বের্গসঁ-এর গতিতত্ত্বের প্রভাবে এবং উপনিষদের 'চরৈবেতি' ভাবনায় প্রাণিত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে'। সার্ত্রেও অবিরাম ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনের কথা বলেছেন। কিন্তু বের্গসঁ যেখানে জীবন ও জগতের সবকিছু পরিবর্তনের পক্ষে বলেছেন, সার্ত্রে সেখানে কেবল ব্যক্তি-চৈতন্য ও মানবিক অংশের উপর জোর দিয়েছেন।

(২) যদিও সার্ত্রে একস্থানে মার্কসের শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, সেই সমাজের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব, তবু ব্যক্তি-

সত্তার প্রাধান্য এবং সাহিত্য-শিল্পের জগতে মানবমুক্তির কল্পনা তাঁকে মার্কসীয় দর্শনের উল্টো দিকেই রেখেছে। অর্থাৎ সমাজ-সংবিদই যে ব্যক্তি-চেতনার জন্ম দেয় এবং মূল অর্থব্যবস্থাসহ সামাজিক ভিত্তির অনুগামীতাই যে মন ও চিন্তাগত উপরিথাকের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে—এই মৌলিক দর্শনকে সার্ত্রে ছুঁতে পারেন নি। এমনকি একস্থানে বিরোধিতাও করেছেন এই বলে যে, এতে মানুষের স্বাধীন নির্বাচন বাধা পায়।

মজার কথা, মার্কসবাদ-বিরোধী কিছু বুর্জোয়া পণ্ডিত সার্ত্রেকে সামনে রেখে এবং সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী সাহিত্য-দর্শনকে অভিজ্ঞান করে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিক বেশ কিছু তথাকথিত 'ইয়ং জেনারেশন' সার্ত্রেকে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিকল্প বানিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ব্যক্তিসত্তার সংগ্রাম ও প্রাধান্য প্রচার করছে। কিন্তু ঘটনা হল—

"Sartre's Existentialism appears as the ideological expression of the decadent bourgeoise at the period when capitalism is breaking up. It translates this decadence into escape from the real, the isolation of the individual and the affirmation of the ego's absolute autonomy and superiority to the world." বস্তুত সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী সাহিত্যভাবনা ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া দুনিয়ার ঐতিহাসিক শ্রেণীগত প্রতিফলন। হাঙ্গেরীর প্রখ্যাত মার্কসবাদী সমালোচক জর্জ লুকাস্, এই অস্তিত্ববাদী দর্শনকে তার যথাযথ স্থান দিয়েও সার্ত্রের কটাক্ষ এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের গর্ববোধকেও 'অবক্ষয়ী মানসিকতা' বলে চিহ্নিত করেছেন।

অবশ্য, সার্ত্রে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বকে গাল দিলেও সোভিয়েত বিপ্লব এবং কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখে বলতে চেয়েছেন যে, এ জগতে প্রকৃত শান্তি সাম্যবাদীরাই আনতে পারে, এটাই হল শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের প্রকৃত অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী সাহিত্যভাবনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই দিকই রয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার পচনশীলতায় আত্মধিক্কার ও অস্বীকার, অর্থাৎ স্থিতাবস্থার মোসাহেবী না করা এবং বিদ্রোহ করা। নিঃসন্দেহে এটা ইতিবাচক দিক। আবার সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট রাজনীতির সংগ্রামী ধারা থেকে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকাকে সরিয়ে রাখার বা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য প্রচারের দিক অবশ্যই নেতিবাচক।

জীবনের শেষ পর্বে সার্ত্রের সাহিত্যভাবনায় লুই আরাগ'র মত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের স্তরে সারা ইউরোপের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের মত 'সমাজ ও জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্ন' বেশ চড়া সুরেই ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষকরে ফরাসী বামপন্থী লেখকরা এই সময়ে 'দায়বদ্ধতার সাহিত্য' নামে যে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করেন, তার উৎস বলা যায় সার্ত্রের 'সাহিত্য কি' বইখানি। এর সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক বই 'শেষ শব্দাবলী'র সঙ্গে মিলিয়ে নিলে সাত্রীয় সাহিত্যতত্ত্বের নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। রাজনৈতিক সংকটই যে বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত রকম নৈতিক ও আদর্শগত সংঘাতের মূলে কাজ করে, এটা আরাগ'র 'প্যাসেঞ্জারর্স অব ডেসর্টিনি' এবং সার্ত্রের 'রিপ্রাইভ' উপন্যাসে ফুটেছে। আরগ'র নায়ক গর্ব করে রাজনৈতিক ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে বলে, সে সংবাদপত্র পড়ে না। এক সময়ে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে সে প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়। কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে, অর্থাৎ বাক্‌শক্তিও লোপ পেতে থাকে। এই সময়ে সে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করার শক্তি পেয়েছিল—'এটা রাজনীতি'! এক সময়ে, গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে নেপোলিয়ান রাজনীতিকেই বলেছিলেন মানুষের ভাগ্য—'লা ফর্মে মদার্নে দু দেস্‌তিন'! বিংশ শতাব্দীতে এটাই ঘটছে। এমনকি সার্ত্রের ১৯৩৮ সালের মিউনিখ সংকটের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসের নিরক্ষর কৃষক গ্রস্‌লুই কারো কোন ক্ষতি না করেও একদিন ঘটনাচক্রে দেখল সে জেলবন্দী। সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত হল এবং এটাই তার রাজনৈতিক জেল, যার সম্পর্কে সে কিছুই বোঝে না, জানে না। এই ভাবেই দেখা যায়, বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিশ্বে সব দেশের নাগরিককেই রাজনীতির ভাগ্যে জড়িয়ে থাকতে হয়, সে চাক বা না চাক। ম্যাক্‌স আঁদ্রে তাঁর ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'কমিটমেন্ট অব দি মডার্ণ ফ্রেঞ্চ লিটারেচার' গ্রন্থে বলেছেন—

"In the age of nuclear energy this is the dilemma which faces us. How can sensitive men escape from it ? Some writers affect to be quite cynical about it, others tend to dismiss the issue as too big and too remote for them, but both their attitudes could be a form of protest or an expression of suffering and anxiety."

সার্ত্রের মতে, দায়বদ্ধ লেখক একা নয়, তিনি হলেন 'মানুষের মধ্যে মানুষ'। এই দায়বদ্ধতার ধারনাকে সংক্ষেপে বলা যায়—লেখকের সৃজনশীল স্বাধীনতা সমাজে স্বীকৃত থাকা চাই, এবং সমাজও আশা করে সামাজিক

দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট মনোভাব। অবশ্য সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ সমাজ-নিরপেক্ষ না হলেও কমিউনিস্ট পার্টি নিরপেক্ষ, বিশেষ করে সমকালের ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি। এ সম্পর্কে সার্ত্রের সাহিত্যভাবনার মূল্যায়নে স্বভাবতই বিতর্ক ওঠে।

সার্ত্রের সোভিয়েত বিপ্লব, বলশেভিক পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সম্পর্কে সহানুভূতিশীল থাকলেও, তিনি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ নেন নি, বাইরে থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে সমালোচনা করেছেন—গোঁড়ামী ও গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তিনি লেনিনীয় সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হলেও স্তালিন আমলের ঝ্দানভীয় 'পার্টিগত প্রশাসনিক ও যান্ত্রিক দায়বদ্ধতা'কে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সার্ত্রে লেনিনের টলস্টয়-মূল্যায়ন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হলেও তাঁর 'পার্টি-সংগঠন ও পার্টি-সাহিত্য' সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি।

সার্ত্রে তাঁর সাহিত্যিক দায়বদ্ধতাকে 'সৃজনশীলতার অন্তর্নিহিত সত্য' বলে, 'এমবার্কি' বলে উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই 'অংশগ্রহণ' (ইনভলভমেণ্ট) এবং 'দায়বদ্ধতা' (কমিটমেণ্ট)—এই দুয়ের মধ্যে মিল-গরমিল দেখাতে গিয়েই সার্ত্রের সাহিত্যভাবনায় স্ববিরোধটি ধরা পড়ে। একবার বলছেন, সামাজিক ঘটনায় অংশগ্রহণ-প্রক্রিয়া অচেতনভাবেও হতে পারে এবং তা যখন সচেতন ও ইতিবাচক হয়, তখনই ঘটে 'দায়বদ্ধতা'। কিন্তু সার্ত্রে সম্ভবত সমাজ ও জনগণকে নিষ্ক্রিয় ও বিকাশহীন ঘটনা ভেবেই লেখক-শিল্পীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন এবং সেটা চেয়েই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। লেখক-শিল্পীও যেমন সচেতন হতে থাকেন, জনগণও তেমনি এক জায়গায় থাকেন না—পার্টি রাজনীতির অগ্রণী শক্তির বিকাশ ঘটে জনগণেরই অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর ইতিবাচক ঐক্য ও সংগ্রামের ভূমিকায়—এই রাজনৈতিক সত্য সম্পর্কে সার্ত্রের কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই স্বাধীনতার ধারণাকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে সাধারণভাবে পরিমাপ ও নির্দিষ্ট করেছেন।

তবে ইউরোপীয় সাহিত্য আন্দোলনে সার্ত্রের স্থান নির্ধারণে এটা মোটা দাগের কথা হলেও, কিছু বক্তব্য আছে। সার্ত্রে কোনদিনই 'এসট্যাবলিশমেণ্ট'-এর সঙ্গে আপোষ করেন নি। তিনি যখন বলেন, সাহিত্য হল, 'ইণ্টিগ্রেটেড এ্যাণ্ড মিলিট্যাণ্ট ফাংসন' তখন তাঁর সাহিত্যকে শুধুই ব্রিটিশ সমালোচক ম্যাণ্ডারের মত 'এ্যাংলো-স্যাকসন এম্পিরিসিজম' বলা ঠিক নয়। সার্ত্রের 'দায়বদ্ধতা'র সংজ্ঞা সম্পর্কে ম্যাক্স আঁদ্রে বলছেন—

'Commitment is not a hapazard or instinctive reaction but a valid and changing method of approaching artistic creation—

both from literary theories and from the works which endeavour to illustrate them.'

এই দায়বন্ধতা সম্পর্কে সার্ত্রে দুটি প্রশ্ন রেখেছেন—কেন লেখেন? এবং কার জন্য লেখেন?

তাঁর 'সাহিত্য কি' বইতে এই কথাই আলোচিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী-কালে লেখা তাঁর 'শব্দাবলী' (আত্মজীবনী)-তে তিনি নিজেই এই বক্তব্যের অনেক অংশই বর্জন করেছেন। 'শব্দাবলী'তে বলছেন—"আমার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এখনও লেখা হচ্ছে...আমার লক্ষ্য আগামীকাল আরও ভালো করবো, তার পরের দিন আরও ভালো"। বলে রাখা ভাল, সার্ত্রের দায়বন্ধতা একান্তই তাঁর নিজস্ব, একে মার্কসীয় দায়বন্ধতা বলে ভুল করার কোন কারণ নেই।

সার্ত্রে যখন বলছেন—সাহিত্য হল সামাজিক কাজ এবং এই কাজের পিছনে জনগণের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর ও জগতকে বদলানোর ইচ্ছাই প্রধান—তখন কোন আপত্তির কথা আসে না, বরং অবক্ষয়ী সাহিত্য-ভাবুকদের ভিড়ে তাঁকে যথেষ্ট শক্তিশালী সাহিত্য-দার্শনিক বলেই প্রতিষ্ঠা দিতে হয়। কিন্তু যখন তিনি বলেন—ভাষাই এই সংযোগ ঘটায়—তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে কার ভাষা? বিষয়বস্তু কি? এবং কোন্ দায়িত্ববোধ? নিঃসন্দেহে এগুলির সদুত্তর না পেলে 'সাহিত্যের দায়বন্ধতা' বা সামাজিক কাজ-এর ধারণা স্পষ্ট ও পূর্ণ হতে পারে না। এ ছাড়াও সার্ত্রের সাহিত্যভাবনায় আর একটা স্ববিরোধ নজর এড়ায় না। একবার তিনি বললেন—'ভাষার লক্ষ্য সংযোগ করা, একজন যা অর্জন করেছে তাকে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া. একটা অবস্থা বা ঘটনাকে তুলে প্রকাশ করা......প্রথমে আমি তাকে নিজের মধ্যে ফোটাই, পরে অপরের মধ্যে জাগাই যাতে সেই অবস্থার পরিবর্তন করা যায়।' কিন্তু প্রশ্ন হল, যা ঘটেছে বা যে অবস্থা আছে তাকে নিজের এবং অপরের মধ্যে প্রকাশ করলেই কি 'পরিবর্তনের উদ্দেশ্য' সাধিত হয়? অথবা পরি-বর্তনের তাগিদও জাগে? এতে মন বিষণ্ণ ও নেতিমুখীও তো হতে পারে। সার্ত্রে তাঁর বক্তব্যে বলেছেন—সাহিত্যে লেখক তাঁর অর্জিত ফলাফল সংযোগ করেন, পাঠকের কাছে সেই মূল্যবোধ গ্রহণের আবেদন করেন। আবার এটাও বলছেন—

'A work of art is an end in itself . . . a work of art is a value because it is an appeal.'

বলা বাহুল্য এই রকম অনুসিদ্ধান্ত শুধু স্ববিরোধীই নয়, খণ্ডিতও বটে।

সার্ত্রে যখন বার বার বলছেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য 'দুনিয়াকে বদলানো', তখন তিনি দর্শনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে (যে অর্থে কার্ল মার্কস বলেছেন), সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে একই কোঠায় ফেলেন। অথচ আমরা জানি, **বিপ্লবী**

দর্শন যুগে যুগে শিল্প-সাহিত্যকে পথ দেখিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে। আবার যদি সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বকে পরস্পর অনুপূরক হিসাবেও ধরি তো সিদ্ধান্তটা এটাই হওয়া দরকারঃ দর্শন ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য 'উজ্জীবন-মূলক', অর্থাৎ অবস্থা বা পরিবেশকে বদলে দেয়া নয়, বদলানোর উপযোগী 'মন' তৈরী করে দেওয়া। মূল কাঠামো বদলালে তবেই দুনিয়া বদলায়।

সার্ত্রে তাঁর সাহিত্যচিন্তায় যেভাবে অতীতের মূল্যায়ন করেছেন তা গ্রহণ করা যায় না। একদিকে তিনি বলছেন, তাঁদের সমকালে 'আলোকপ্রাপ্ত' দার্শনিক-লেখকদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ, অপরদিকে পূর্বসূরীদের পাইকারী হারে নাকচ করেছেন। আসলে খণ্ডিত ও অপ্রতুল ঐতিহাসিক জ্ঞানের কারণেই তিনি, একমাত্র ভিক্টোর হুগো ছাড়া উনবিংশ শতকের সাহিত্যকে 'বিশ্বাসঘাতী' বলে নির্দেশ করেছেন। ইতিহাসবোধ সামগ্রিক ও সুস্থ না হলে সাহিত্য-ভাবনায় গরমিল ঘটাই স্বাভাবিক। সার্ত্রের 'সাহিত্য কি' প্রবন্ধ-মালার 'ইতিহাস' অংশে এই দুর্বলতা যথেষ্ট সোচ্চার। বস্তুত দায়বদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবোধের অভাবে কখনই বিশ্বাসযোগ্য ও সার্থক হতে পারে না, যেমনটা হয়নি তাঁর ফ্লবেয়ার সম্পর্কে মূল্যায়ন। সম্ভবত সার্ত্রে এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি এটা স্বীকার করেছেন এই বলে—'আমি সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম বলে ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্লেষণ ভাসা-ভাসা থেকে গেছে।' অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যভাবনায় যে ইতিহাস গুরুত্ব পায়নি, এটাই বেরিয়ে আসে।

সার্ত্রে তাঁর বইয়ের পাঠক সাধারণ সম্পর্কে ১৯৪৭ সালেও কিছুটা উন্নাসিক ছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার লেখা জনগণ একদিন বুঝবে। ১৯৪৪ সালে 'লা মন্দে' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে বললেনঃ

'I have changed my public . . . Now I receive letters from public from workers, from secretaries. They are the most interesting ones.'

সাহিত্যে সমাজভাবনা কোন্ স্তরে ও কি ভাবে রয়েছে সেটার বিচারেই দায়বদ্ধতা ও সাধারণ পাঠকের সমর্থন নির্ভর করে। সার্ত্রে সাহিত্যকে সামাজিক কাজ বলেছেন এই ভাষায়—'the social function par excellence.'

এই থেকে কি বেরিয়ে এল? ১· দক্ষতার সাথে ভাষার ব্যবহার করতে পারলেই যখন লেখা হবে, তখন আর নিজের জীবন ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করার দরকার নেই, এবং ২· বাস্তব জীবনে সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা যখন ধরাই পড়ছে, তখন আর সাহিত্যের মূল্য কি? এই রকম মনোভাব তাঁর নিজের কথাতেও বেরিয়ে এসেছে—পশ্চিমের অধিকাংশ শিল্প ও সাহিত্য

ক্ষুধার রাজ্যে সময়ের অপচয় (তুলনীয়ঃ 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'—সুকান্ত)। আসলে সার্ত্রের 'দায়বদ্ধতা'র পেণ্ডুলাম দুটো চূড়ান্ত বিন্দুতে ঠোকাঠুকি করেছে। প্রথমেই তিনি ভুল করেছেন এই ভেবে সাহিত্যিকরাই বুঝি দুনিয়াকে বদলে দেবেন। দ্বিতীয় ভুল—শব্দ নিয়ে অলস খেলার ধারণা, যেহেতু ভাষা বা শব্দ মূলত সামাজিক ঘটনা। আর্নেস্ট ফিশার তাঁর 'নেসেসিটি অব আর্ট' গ্রন্থে এই দুই চূড়ান্ত বিন্দুতে যাতায়াত সম্পর্কে বিশ্লেষণ রেখেছেন।

অবশ্য ১৯৪৪ সালের শেষে সার্ত্রের নিজেরই 'শেষ শব্দাবলী'তে দায়বদ্ধতার মোহান্তগিরি নাকচ করেছেনঃ

"I have given up the priesthood of literature, but not the frock . . . I am still writing books and I shall go on doing so; they are needed; they have their uses after all."

এই সময়ে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারেও বলেছেন—'কলমের বিন্দুতে নায়ক হওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবকে, সমকালের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া এবং কলম থামানো চলবে না।' কাজেই দেখা যাচ্ছে, সার্ত্রের সাহিত্যভাবনা ক্রমেই তাঁর 'সাহিত্য কি' গ্রন্থের বাঁক ফেলে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। অবশ্যই এর বাস্তব পটভূমিকা আছে। 'সিমন দ্য বোভেয়ার'-এর বন্দীশালা থেকে পালিয়ে বললেন—'সোসিয়েলিজম্ এ লিবের্তে।' আত্মগত ভাবে নয়, বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তনে স্বাধীনতা বাস্তব হবে। এই গণতান্ত্রিক নীতিরই বাস্তবসম্মত প্রকাশ সমাজতন্ত্রে। উল্লেখ্য, এর আগে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে দূরে ছিলেন। ক্রমে সমাজতন্ত্রই যে মানবজাতির মুক্তির পথ—চিন্তাগত ভাবে তার স্বীকৃতি ঘটল।

এরই ক্রম-বিবর্তনে ১৯৪৮ সালে গড়লেন 'রাসাঁব ল্যমাঁ দেমক্রাতিক রেভল্যুসিয়ানের' বা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। ১৯৫১ সালে লিখেছেন-'কম্যুনিস্ত এ লা পে' বা 'কমিউনিস্ট ও শান্তি' প্রবন্ধ। যে সার্ত্রে এই সময়ে 'রেভলিউসিয়'তে অপরিহার্য সংগ্রামে প্রাণিত করার রচনা ও দর্শনকে স্বাগত জানালেন, সেই সার্ত্রেই তো 'শেষ শব্দাবলী'তে এমন কি স্তালিনীয় রুশ-সমাজকে সমর্থন করে বললেন—'আমি এ কথা ভাবিনি যে আমার একার চিন্তায় দুনিয়া বদলে যাবে। কিন্তু এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে এমন সব সামাজিক দর্শন ও শক্তি, আমার স্থান তাদের সঙ্গে।'

দ্বিতীয় পর্ব

টলস্টয়ের শিল্পচিন্তা

পার্থ দে

টলস্টয় যেমন তাঁর সমগ্র জীবনের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে ও অসচেতনভাবে রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল অন্তর্বস্তুটিকে প্রতিফলিত করেছিলেন, যেমন তিনি উদ্ঘাটন করেছিলেন ইতিহাস কর্তৃক বাতিল একটি সমাজব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার দৈন্য, একটি বিপুল পরিবর্তনের আবশ্যিকতাকে প্রতিভাত করেছিলেন এবং ঠিক যেমনভাবে তাঁর শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছিল এই বিপ্লবের কৃষকসুলভ দুর্বলতা, অতিসরলতা ও ধার্মিকতা, প্রায় ঠিক তেমনভাবেই তাঁর শিল্প-বিষয়ক নিবন্ধে তিনি প্রতিফলিত করেছেন সাংস্কৃতিক সংকটের একটি নিষ্করুণ উদ্ঘাটন, আমূল অগ্রবর্তী পরিবর্তনের আবশ্যিকতা এবং সেই সঙ্গে কৃষকসুলভ দুর্বলতা, অতিসরলতা ও ধার্মিকতা। রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে, তৎকালীন চিন্তা জগতের আলোড়ন কৃষকের সামাজিক ও মানসিক অবস্থান ও শিল্পী হিসাবে টলস্টয়ের বিরাট অভিজ্ঞতা—এই চারটি বিষয়কে স্মরণে রেখেই টলস্টয়ের শিল্পভাবনার ইতিবাচক, বস্তুবাদী, মানবদরদী ও শিল্প-প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের ত্রুটি দুর্বলতা ও ছেদগুলি সত্ত্বেও গণশিল্পের সুবিশাল ধারাকে কিভাবে শক্তিশালী করে, তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হতে পারে।

প্রগতিশীল ধারা

খ্যাত শিল্পীর আত্মাভিমান অথবা ঋষিসুলভ আপ্তবাক্য প্রচারের মানসিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করেই টলস্টয় আপন জিজ্ঞাসা ও দায়িত্ববোধের তাগিদে শিল্পের স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'শিল্পের স্বরূপ' গ্রন্থটি তাঁর এক সৎ ও শ্রমসাধ্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি। তিনি নিজেই বলেছেন পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী একটি একান্ত অনুশীলনের মাধ্যমে, বারবার নানা নতুন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়ে ও সেগুলির মীমাংসা করে তিনি একটি সংহত শিল্পচিন্তায় উপনীত হবার প্রয়াস করেছিলেন। তথ্য, অভি-

জ্ঞতা, তত্ত্ব ও ইতিহাসের একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন, বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করেছেন শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ও সংহত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রয়াসে। যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তা হোল এই যে চিন্তার ক্ষেত্র, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, শিল্পের ক্ষেত্র এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রগুলি আলাদাভাবে না দেখে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত করেই দেখতে পেরেছিলেন এবং এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির স্বরূপ ও গতি সম্পর্কে নিশ্চিত সূত্র চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। অকৃত্রিম চিন্তাকর্ম ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে টলস্টয় নিম্নরূপ ধারণায় পৌঁছেছিলেন,

"যেহেতু চিন্তার ফসলকে একমাত্র তখনই অকৃত্রিম বলা যায়, যখন তা পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের অনুবৃত্তি না করে নতুন ধারণা ও চিন্তা সঞ্চারিত করে, তেমনি শিল্পসৃষ্টি একমাত্র তখনই অকৃত্রিম বিবেচনার যোগ্য—যখন তা মানুষের জীবনপ্রবাহে নতুন অনুভূতি (তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন) আনয়ন করে।"

শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থের উপসংহারে বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের সংযোজন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পের জগতের বাইরে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে অন্যান্য মানবিক সাংস্কৃতিক ধারাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে শিল্পের লক্ষ্য ও অভিমুখীনতা কি হওয়া উচিৎ তা বুঝতে চেয়েছিলেন। এই অনুসন্ধান তাঁকে বার বার বস্তুগতভাবে সমাজ ও অগ্রগতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি দেখিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার দাবী নস্যাৎ করে টলস্টয় মন্তব্য করেছেন, "বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপৃত অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের সর্বাপেক্ষা অভিপ্রেত বিষয় হলো এমন পদ্ধতির সংরক্ষণ যার সাহায্যে তারা নিজের বিশেষ সুবিধাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন।"

টলস্টয় বলেছেন যে, বিজ্ঞান মনে করে সমাজ অপরিবর্তনীয়, নতুন জীবন রীতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা বিজ্ঞানের কাজ নয়—এটা বিজ্ঞানের ভ্রান্ত পথ। বিজ্ঞানকেও সামাজিক উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। উদ্দেশ্যহীন গবেষণা সমাজের অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে না। তাই,

"প্রকৃত বিজ্ঞান হচ্ছে এইটে জানা—আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিৎ, কি বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবন কিভাবে গঠিত হওয়া উচিৎ, কিভাবে উচিৎ নয়..." এবং আরো সুনির্দিষ্ট করে তিনি বলেন,

"শিশুমৃত্যু, বেশ্যাবৃত্তি, উপদংশরোগ সমগ্র জাতির অধোগতি এবং মানুষের সামগ্রিক হত্যার নিবারণ করাই বিজ্ঞানের কর্তব্য।"

বিজ্ঞানের সাধিতব্য কর্তব্য সম্পর্কে টলস্টয়ের মন্তব্যের তীক্ষ্ণতাই প্রমাণ করে কতখানি স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে তিনি শিল্পকেও সমাজের অগ্রগতির কর্তব্যে যুক্ত করার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যেও যে একটি রক্ষণশীল ধারা ও একটি প্রগতিশীল ধারা থাকতে পারে এই বিষয়টি চিহ্নিত করাই একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বচ্ছ চিন্তার পরিণতি। সমস্ত বিজ্ঞানই দুঃখের কারণ অথবা বিজ্ঞান শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা এরূপ কোন অন্ধ ধারণাই টলস্টয়কে বশীভূত করতে পারেনি। বস্তুমুখী ও স্বচ্ছ চিন্তার সাহায্যেই টলস্টয় শিল্প বিচারে অভিনিবেশ করতে পেরেছিলেন।

যে বস্তুগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে টলস্টয় বিজ্ঞান ও শিল্পকে সামাজিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজজীবনে সংস্কৃতির দ্বন্দ্বমূলক বিকাশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমাজের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে যে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় পক্ষপাত অকুণ্ঠভাবে প্রদর্শন করেছিলেন সেইটিই টলস্টয়ের শিল্প ভবনার সবচেয়ে বলিষ্ঠ উপাদান। যে কোন যুগে, যে কোন পর্যায়ে বিজ্ঞানকে, শিল্পকে, মননশীলতাকে বাছাই করতে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে কোন্ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা তাদের খুঁজতে হবে।

টলস্টয় সমকালীন যুগের একটি বিশিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও শিল্পের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এমন কথাও তিনি বলেছেন যে রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলি আপাতঃ তুচ্ছ, কেননা এর থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কর্তব্য সেই মুহূর্তে বিজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত ছিল। এই কর্তব্যগুলি নির্ধারিত হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট যুগের ধর্মীয় ধারণার দ্বারা। তাঁর যুগের বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চার সম্মুখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির ক্রম তিনি নিম্নরূপভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন. "যৌন সম্পর্ককে কিভাবে দেখতে হবে, শিশুদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ, ভূমির ব্যবহার কেমন হবে, অপরকে নির্যাতন না করে কিভাবে নিজের চেষ্টায় কর্ষণ করা যায়, বিদেশীয়দের এবং পশুদের প্রতি আচরণ কি রকম হওয়া উচিৎ এবং মানুষের জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক কিছু।"

এটা অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে সিদ্ধান্তগুলির খুঁটিনাটিতে কৃষকসুলভ মানসিকতা বা তাঁর নিজস্ব ধার্মিকতা প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে সূত্রায়নের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন সেই সূত্রায়নটি বলিষ্ঠ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সূত্রায়নের খুবই সন্নিকটবর্তী।

শিল্পের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

এরূপ একটা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেখেছেন বলেই টলস্টয় সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে শিল্প বিষয়টিকে দেখতে পেরেছেন। সামাজিক ও

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখার ফলেই তিনি সঠিকভাবে শিল্পের স্বরূপকে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। শিল্প কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া সে সম্পর্কে টলস্টয়কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

"পূর্বগামী মানুষের চিন্তাধারা আপনচিত্তে গ্রহণ করবার ক্ষমতা এবং অপরের চিত্তে আপন চিন্তাধারা সঞ্চারের ক্ষমতা যদি তার না থাকত তবে মানুষের অবস্থা হতো বন্য পশুর কিম্বা কাসপার হৌসের (Kasper-houser) মত।"

শিল্প এমন একটি সামাজিক মাধ্যম যার দ্বারা যুগে যুগে নবতর উন্মেষ-শালী আবেগ মানবজীবনকে সঞ্জীবিত করে থাকে। টলস্টয়ের কথায়,

"সুতরাং শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে ক্রিয়া এমন কি বাক্-শক্তির মতই সম-গুরুত্বপূর্ণ এবং বাকশক্তির মতই সর্বব্যাপ্ত।"

মানবসমাজে ভাষার ভূমিকার সঙ্গে শিল্পের ভূমিকার তুলনা করে টলস্টয় এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শিল্পের সামাজিক আবশ্যিকতা সম্পর্কে তিনি কতখানি নিশ্চিত। ভাষা ও শিল্পের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে 'শিল্পের স্বরূপ' গ্রন্থে টলস্টয় বলছেন,

"ভাষার মাধ্যমে চিন্তাপ্রকাশের ক্ষমতার অধিকারী বলে পূর্ববর্তী মানব-সমাজের অবদান কি, পরবর্তীকালে প্রত্যেক মানুষ তা জানতে পারে। অপরের চিন্তাধারা উপলব্ধিতে সক্ষম বলে বর্তমানকালের মানুষ পূর্ববর্তীদের ক্রিয়া-কলাপের অংশীদার হতে পারে। এ যুগের মানুষ অপর ব্যক্তির যে চিন্তাধারা আত্মসাৎ করেছে কিংবা তার মনের জগতে যে চিন্তাধারা জন্ম নিয়েছে, তা তার সমসাময়িকদের বা পরবর্তী বংশধর-দের দিয়ে যেতে পারে। সুতরাং শিল্প মাধ্যমে অপরের অনুভূতি দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে বলে সমসাময়িক মানুষের সর্বপ্রকারের অভিজ্ঞতা এযুগের মানুষের আয়ত্বগম্য। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যে অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তা সে যেমন অনুভব করতে পারে, তেমনি এযুগের মানুষের পক্ষেও অপর চিত্তে তার হৃদয় সংবেদনা সঞ্চারিত করে দেওয়া সম্ভব।"

এই তত্ত্বটিকে একটি পরিচ্ছন্ন সূত্রাকারে তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন,

"মানবিক চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চারক ভাষাই মানুষের মধ্যে এই মিলন সূত্র রচনা করে। শিল্পও সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে। শেষোক্ত মানব সম্পর্ক বিধায়ক উপায়টির বৈশিষ্ট্য শাব্দিক যোগসূত্রের উপায় থেকে পৃথক। সে বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ এই: ভাষার সাহায্যে মানুষ নিজের চিন্তা সম্পদকে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, অপরপক্ষে

শিল্পের মাধ্যমে সে নিজ অনুভূতিকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে।"

টলস্টয়ের শিল্পভাবনার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি মানব সমাজব্যাপী প্রবাহিত সমগ্র শিল্প ও এক একটি বিশেষ কাল পর্যায়ে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত শিল্পকর্মগুলির মধ্যে একটি সীমারেখা টেনেছেন। শিল্প হিসাবে যা আলোচিত ও সমালোচিত হয়ে থাকে, সংবাদপত্রে অথবা অভিজাতদের মধ্যে, সেইটুকুই সমগ্র শিল্প নয়। পাদপ্রদীপের আলোকে আলোকিত অংশের বাইরে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, মানবসমাজের প্রতিটি প্রত্যন্তে আবহমানকাল প্রবাহিত শিল্পধারা রয়েছে। শিল্পের এই অনস্বীকার্য সর্ব-ব্যাপী অস্তিত্ব প্রায়শঃই অস্বীকৃত হতে দেখা যায়। তিনি দেখিয়েছেন এক একটি সমাজে বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী শিল্পধারাকে একদিকে যেমন সচেতন-ভাবে সমর্থন দেওয়া হয়ে থাকে অপরদিকে সেই ধারার বিপরীত শিল্প প্রয়াসকে অবদমিত অথবা নির্বাসিত করার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে, যে সব শিল্প প্রয়াস সরাসরি সমসাময়িক প্রবলতর সামাজিক স্বার্থের প্রতিকূল নয়, তাদের প্রতি মর্যাদাহীন এক প্রকার সহনশীলতা প্রদর্শন করা হয়।

প্রাচীনকালের গ্রীকদের ও তাঁর সমসাময়িককালের অভিজাতদের উদাহরণ দিয়ে টলস্টয় এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেছেন। তিনি প্লেটো প্রমুখ মানবজাতির কোন কোন শিক্ষকের শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে বলেছেন,

> "যেমন প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ, আদি যুগের খ্রীষ্টানদের মত কোন কোন ব্যক্তি, গোঁড়া মুসলমান এবং বৌদ্ধরা শিল্পভাবনায় এত চরমপন্থী ছিলেন যে, তাঁরা সকল প্রকার শিল্পকেই অস্বীকার করেছেন।"

আবার তাঁর সমকালীন অভিজাতগণ আনন্দদায়ক সব কিছুকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করে এবং যা আনন্দদায়ক নয় এরূপ সব কিছুকে শিল্প হিসাবে অস্বীকার করে মারাত্মক ভুল করেছেন। দ্বিতীয় ধরণের ভুলটি প্রথমটি অপেক্ষা অনেক বেশী কুৎসিত,

> "আমার মতে শেষোক্ত ভ্রান্তি প্রথমোক্ত ভ্রান্তি অপেক্ষা অনেক বেশী কুৎসিত এবং পরিণামে অনেক বেশী ক্ষতিকর।"

শিল্প সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী যে মানব সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের পরিপন্থী এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে পেরেছিলেন।

শিল্প সম্পর্কিত এই আলোচনার মধ্য দিয়ে টলস্টয় আরো দুটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনাকে বস্তুগতভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ মানবেতিহাসব্যাপী শিল্পে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুটি ধারা। শিল্পের প্রগতিশীল ধারাকে টলস্টয় এইভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন,

"ভাষার মত শিল্পও আদান-প্রদানের এবং সেইহেতু প্রগতিরও উপায় বিশেষ, অর্থাৎ চরম উৎকর্ষের অভিমুখে মানবতার অগ্রসৃতি।" এবং "ভ্রান্ত এবং অপ্রয়োজনীয় ধারণাকে অপসারিত করে অধিকতর সত্য ও প্রয়োজনীয় ধারণাকে সে স্থলে স্থাপন করায় জ্ঞানের বিবর্তন যেমন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়, তেমনি শিল্প মাধ্যমে অনুভূতিও বিবর্তিত হয়—মানবমঙ্গলের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অকরুণ এবং অনাবশ্যক অনুভূতির স্থলে অধিকতর দয়ার্দ্র ও আবশ্যক অনুভূতি প্রতিস্থাপিত হয়। শিল্পের উদ্দেশ্যও তাই।"

প্রত্যেক সমাজে জীবনের সর্বাধিক উচ্চতম স্তরে উপনীত হবার একটি চেতনা কার্যকরী থাকে। এই চেতনা অভিব্যক্তি লাভ করে কয়েকজন প্রগতি-শীল ব্যক্তির মধ্যে কিন্তু তা সমাজের সাধারণ মানুষের দ্বারাও ক্রমে উপলব্ধ হয়। এই চেতনাই প্রগতিশীল চেতনা এবং এই চেতনাদ্যোতক শিল্পই সমাজে সমাদর ও উৎসাহ লাভ করে থাকে। অন্যদিকে যে চেতনা 'বিগত যুগের নিষ্প্রাণ, ধর্মীয় উপলব্ধি সঞ্চারক' সেই চেতনাসঞ্চারী শিল্প সমাজে ধিক্কৃত এবং ঘৃণ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। এবং টলস্টয় মনে করেন এইভাবেই শিল্পের মূল্যমান নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ।

এটা স্ববিরোধী মনে হতে পারে যে গ্রীকরা ও সমসাময়িক অভিজাতরা যেভাবে শিল্পের একটি বিশেষরূপকে সমর্থন করতেন ও অপরাপর শিল্প-কর্মগুলিকে নির্বাসিত করতেন তার সমালোচনা করার পরও টলস্টয় বিশ্বাস করেন যে শিল্পের একটি ধারাকে বিশেষ এক একটি যুগে সমর্থন করা উচিত ও বিপরীত ধারার শিল্পকে ধিকৃত করা উচিৎ। কিন্তু ঘটনাটি এরূপ স্ববিরোধী নয় কেননা টলস্টয়ের শিল্প সমালোচনায় অপর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটনাগতভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা হলো সমাজে প্রবলতর শ্রেণীগুলি অথবা তাদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের সহিত শিল্পের সম্পর্ক।

টলস্টয় তাঁর সমসাময়িককালের কর্তৃস্থানীয় শ্রেণীগুলির সমর্থিত ও উপস্থাপিত, অপেক্ষাকৃত প্রবল শিল্প কর্মগুলিকে শিল্প হিসাবে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর নিকট এটা স্পষ্ট ছিল যে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি জনগণের সাধারণ স্বার্থের সহিত মুষ্টিমেয় অভিজাত-পুঁজিপতিদের স্বার্থের কোন মিল ছিল না এবং সেজন্যই উপরতলার মানুষের সমর্থিত শিল্প কখনই সমর্থনযোগ্য প্রগতিশীল শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে না। শিল্পে শ্রেণী প্রাধান্যের অস্তিত্ব কেবলমাত্র স্বীকৃত হয়েছে তাই নয় তিনি সেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পক্ষপাতও অবলম্বন করেছেন।

নবজাগৃতির পূর্ব যুগের শিল্পধারা সম্পর্কে সম্ভবত একটি মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে যে সেই ধারাগুলি সবই ছিল সর্বজনগ্রাহ্য এবং তখনো

শিল্পে শ্রেণী প্রাধান্য দেখা দেয়নি। শিল্পে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল অভিজাত শ্রেণীগুলি ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার পর। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রীকদের শিল্পের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের বিষয়টি যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে বা দাস ব্যবসায়ী গ্রীকদের নৈতিক মান সম্পর্কে যেখানে মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলি নিবন্ধ দৃষ্টিতে দেখলে প্রতিভাত হয় যে টলস্টয় কোন ক্ষেত্রেই শোষকদের সমর্থিত শিল্পকে প্রসংশার দৃষ্টিতে দেখেন নি। সমাজ উত্তরণের পক্ষে যে শিল্প তারই প্রসংশা করেছেন।

গ্রীকরা কি ধরণের বিষয়বস্তুকে শিল্পে উৎসাহিত করতেন সেই সম্পর্কে টলস্টয় নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন,

> "প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে সৌন্দর্য, শক্তি ও সাহসের অনুভূতি সঞ্চারী শিল্প হেসিয়ড (Hesiod), হোমার, ফিডিয়াস (Phidias) নির্বাচিত অনুমোদিত এবং উৎসাহিত হয়েছিল।"

আপাতদৃষ্টিতে তৎকালীন এই ধরণের শিল্পের ভূমিকা অনুমোদন করলেও গ্রীক রাষ্ট্রের ও সমাজের শ্রেণীগত রূপটি তিনি বিস্মৃতও হননি সমর্থনও করেননি। নিম্নের উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক,

> "যে তত্ত্বটি দু' হাজার বৎসর পূর্বের একটি ক্ষুদ্র, অর্ধবর্বর, দাস নিয়োগকারী জনগোষ্ঠীর জীবনাদর্শ থেকে গৃহীত যে গোষ্ঠীর মানুষ নগ্ন মানব দেহের চমৎকার অনুকরণ এবং নয়ন সুখকর হর্ম্য নির্মাণ করতে পারত। অর্থাৎ উনিশ শত বৎসর কালব্যাপী খৃষ্টবাণী প্রচারের পরেও য়ুরোপীয় জাতিসমূহের কাছে এর চাইতে উচ্চতর কোন আদর্শ নেই।"

সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচার

সৌন্দর্যতত্ত্বের উপর আলোচনা টলস্টয়ের শিল্পচিন্তায় একটি সুবিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত সৌন্দর্যতত্ত্বের বিভ্রান্তিকর কোলাহলের অন্তর্নিহিত স্থূল স্বার্থপরতা, স্বৈরাচারিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগ প্রবণতাকে তিনি অকরুণভাবে উন্মোচিত করেছেন। সৌন্দর্যতত্ত্বের বিভিন্ন প্রবক্তার বক্তব্যগুলিকে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে সমগ্র নন্দন তত্ত্বের একটি বিরাট ক্ষেত্র তিনি পরিক্রমা করেছেন। সৌন্দর্যের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই, সৌন্দর্য সর্বদা মানবমংগলের সহিত সমার্থক নয়, সৌন্দর্য এক অলস ভোগবিলাসী অংশের জীবনধারণের অবলম্বন ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভোগপ্রবণতা ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টির দায় থেকে শিল্পকে মুক্ত করে

টলস্টয় শিল্পকে আপন সত্তায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, "শিল্প একটি মানবিক ক্রিয়া।"

দ্বিতীয়ত এটা তিনি সপ্রমাণ করেছেন যে সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণাটি আবহমানকাল প্রবাহিত কোন ধারণা নয়। সৌন্দর্যতাত্ত্বিকরা যে দাবী করেন, যে গ্রীকরাও এরূপ সৌন্দর্যতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন, টলস্টয় যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা তা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন অপরের শ্রমের সম্পদ আত্মসাৎকারী ভোগবিলাসী ও সৃষ্টিক্ষমতাহীন একটি শ্রেণী সাম্প্রতিক অতীতে আত্মিক সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সৌন্দর্যতত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর বৌমগার্টেনই প্রথম সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশিষ্ট প্রবক্তা। রেনেসাঁর পূর্ববর্তী যুগগুলিতে শিল্পকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য ও উপভোগ সৃষ্টির দায়ভাগী করা হোত না।

তৃতীয়ত উৎকৃষ্ট শিল্পের সৌন্দর্যবোধ সঞ্চারক ও তৃপ্তিদায়ক ভূমিকা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু কেবলমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং তৃপ্তিদানই শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য ও সার্থকতা এই ধারণাটির রহস্যময়তা ভেদ করে সেই দর্শনের অতিস্ফীত দাবিটি নস্যাৎ করেন। সৌন্দর্য ও ভোগের এই প্রবণতাটি স্থিতাবস্থার সমর্থক, সমাজ অগ্রগতির বিপরীত মনোভাবাপন্ন অলস শ্রেণীগুলির একটি বিশেষ প্রবণতা তাই কেবলমাত্র সৌন্দর্য ও প্রীতিপ্রদতাই কোন শিল্পকর্মের উৎকৃষ্টতা বিচারের মানদণ্ড হতে পারে না।

ধর্মীয় চেতনা

টলস্টয় মনে করেন, "সমাজ সজীব হলে তবে অবশ্যই তার একটি ধর্মীয় চেতনাও থাকবে—যা ঐ সমাজের সকল মানুষের অল্পাধিক সচেতনভাবে অনুসৃত জীবন ধারার নির্দেশক।" তিনি মনে করেন এই ধর্মীয় ধারণাই "সে-সমাজের অভীপ্সিত সর্বোচ্চ মঙ্গলের নির্দেশক।" এক একটি যুগের অগ্রগামী চিন্তা ও চেতনার কিভাবে উদ্ভব ও বিকাশ হয়ে থাকে সেই সম্পর্কে তাঁর সূত্রায়নটি একটি রহস্যময় ধর্মীয় ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এক বা একাধিক মহৎ ব্যক্তি আসন্ন অগ্রগতির পথ নির্দেশ করে থাকেন এবং তাঁদের প্রচারিত মতবাদই সমাজে সর্বজন গৃহীত মত হিসাবে গ্রাহ্য হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন, প্রবহমান নদীর যেমন একটি লক্ষ্য থাকে তেমনি সমাজেরও একটি লক্ষ্য আছে। অতএব সমস্ত যুগেই এমনকি বর্তমান যুগেও একটি অন্তঃসলিলা ধর্মীয় ধারণা আছে এবং মানবজাতির প্রগতির একজন নিয়ন্তাও থাকতেই হবে। এই তাঁর মত।

কার্যত এই প্রক্রিয়া ঘটে থাকে ঠিক এর উল্টো পথে। সমাজের অভ্যন্তরে নবোদ্ভূত বিকাশশীল শ্রেণী তথা শ্রমজীবি জনগণের জীবনের অভিজ্ঞতাও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হবার পথ খুঁজতে থাকে, চলতে থাকে একটি বিকল্প পথের অনুসন্ধান। বিকল্প ও উন্নততর উত্তরণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সমাজে সঞ্চিত হতে থাকে। যতই উত্তরণের উপাদানগুলি বলিষ্ঠ ও নির্ভর-যোগ্য হয়ে ওঠে ততই নানাভাবে ক্ষীণ ও অব্যক্ত স্তর থেকে ক্রমশ স্পষ্টতর-ভাবে উচ্চারিত হতে থাকে অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা। এক একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে, একটি পরিণত স্তরে এক বা একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে ও নেতৃত্বে এই আকাংখা ও আবেগ অপ্রতিরোধ্য রূপ গ্রহণ করে। পিছিয়ে পড়া ধারণা ও মানসিকতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ী সংগ্রামে, তা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তি ও সমাজের এই সম্পর্ক টলস্টয়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সম্ভবত ধর্মীয় বিশ্বাসের অবলম্বন পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে একজন সরলমতি কৃষকের নিকট ভূমিসম্পর্ক পরিত্যাগ করার ধারণার মতই অসম্ভব ছিল।

অথচ আবার তিনি এই সর্বোত্তম ও সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিতত্ত্বের কার্যত বিরোধিতাও করেছেন। তিনি বলেছেন শ্রমজীবি জনগণের জীবন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাই শিল্প অনুভূতির সর্বোত্তম উৎস। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও সংগ্রাম থেকে সুরক্ষিত কোন ব্যক্তির মধ্যে মহৎ আবেগ জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। "জনগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি বলিষ্ঠ আবেগ অনুভব করার পর অপর চিত্তে সঞ্চারের জন্য যখন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন একমাত্র তখনই হয় সার্ব-জনীন শিল্পের জন্ম।"

সমকালীন শিল্পের স্বরূপ

টলস্টয় সমকালের প্রতিষ্ঠান পোষিত শিল্পের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করে একটি বিবৃত চিত্র উপস্থিত করেছেন। বাস্তব উদাহরণ ও নিজ অভিজ্ঞ-তার পুংখানুপুংখ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সেই যুগের কোন অপেরায় নিযুক্ত পরিবেশক কর্মীবৃন্দ, সুরকার ও পরিচালক আবেগহীন, বিরক্তিকর একঘেয়েমীর মধ্যে, বাধ্যতামূলক শ্রম ও সময়ের বিনিময়ে, এক একটি প্রযোজনায় অংশ নিয়ে থাকেন। উচ্চমূল্যে যে শিল্প বিক্রয় হয় তার স্রষ্টা ও পরিবেশকরা কোন শিল্পসৃষ্টির আনন্দ অনুভব করেন না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে সমাজের অভিজাত শ্রেণীগুলি শিল্পের থেকে কেবলমাত্র উপভোগ প্রত্যাশা করেন। শিল্প জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। কোন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সেক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয় না। অপরপক্ষে

অলস ও আমোদপ্রিয় অংশের মানুষদের উপভোগের উপকরণ সরবরাহ করা অতীব জটিল ব্যাপার। নানা ধরণের চটক ও বিভ্রম ছাড়া তাঁদের যথেষ্ট উত্তেজনা পরিবেশন করা যায় না। জনগণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ শিল্প বিষয়বস্তুর বৈচিত্র হারিয়ে ক্রমশ দীন হয়ে পড়ছে। বিষণ্নতা, আত্মাভিমান, যৌন উত্তেজনা ছাড়া অন্য কোন বিষয় অভিজাতদের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি তেমন শিহরণ সৃষ্টি করতে পারছে না বলে তার মধ্যে চমক, জটিল, অস্পষ্ট, ইঙ্গিতময় প্রকাশভঙ্গী অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। শিল্পের পরিবেশকরা বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুন কোন পরীক্ষা করতেও সাহস করছেন না, পাছে তার বিক্রয়যোগ্যতা হ্রাস পায়। কাজে কাজেই ব্যবসায় সফল কোন শিল্পকর্মের চটকদার অনুকরণ সমানে চলেছে। এইভাবে সমসাময়িক শিল্পের সংকট তিনি বর্ণনা করেছেন।

ইউরোপীয় অপেরা, নাটক, উপন্যাস, কাব্য, চিত্র ও সংগীত শিল্পের বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করে টলস্টয় দেখিয়েছেন বিষয়বস্তুর কি ভয়াবহ দৈন্য শিল্প জগতে দেখা দিয়েছে। বোকাচিও থেকে মারচেন প্রভোস্ট পর্যন্ত উপন্যাস ও কাব্যকবিতায় 'যৌন ব্যাভিচার যে শুধু সর্বাধিক প্রিয় বিষয় তাই নয়, সমস্ত উপন্যাসের একমাত্র অবলম্বন।' ফরাসী চিত্র ও সাহিত্যে এমন কোন নিদর্শন দেখা যায় না যেখানে 'নগ্নতার বর্ণনা নেই।' চতুর, শিক্ষিত অথচ পুরোপুরি নাগরিক এবং নন্দনতাত্ত্বিকেরা মনে করেন কৃষক ও শ্রমিকের জীবন বৈচিত্রহীন। বিত্তবান মানুষের জীবন, প্রণয় বৃত্তান্ত এবং অতৃপ্তি অফুরন্ত বিষয়বস্তুতে পূর্ণ। টলস্টয় তাঁদের এই অহমিকাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন, শ্রমিকদের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে যাঁদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, যারা নিজেরা শ্রম করে না, পরের উৎপাদিত ভোগদ্রব্য ব্যবহার ও ধ্বংস করে "বাস্তব পক্ষে সেই শ্রেণীর মানুষের প্রায় সমস্ত অনুভূতি তিনটি মাত্র অতি তুচ্ছ এবং অতি সরল অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধঃ—আত্মগরিমার অনুভূতি, যৌন আকাংখার অনুভূতি এবং জীবন অবসাদের অনুভূতি।"

শ্রমজীবি জনগণের অনন্ত বৈচিত্রময় জীবন ও অভিজ্ঞতার—"সমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠে শ্রম সংশ্লিষ্ট বিপদাপদ, শ্রমিকের অস্থায়ী প্রবাস জীবন, নিয়োগকর্তা, ওভারসীয়ার, সহকর্মী, অপর ধর্মীয় ও জাতীয় লোকের সঙ্গে তার ভাবের আদানপ্রদান, প্রকৃতি ও বন্য পশুদের সঙ্গে তার সংগ্রাম, গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সাহচর্য, অরণ্যে, বৃক্ষহীন শুষ্ক প্রান্তরে, শস্য ক্ষেত্রে, উদ্যানে, ফলের বাগানে তার কাজঃ স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে শুধুমাত্র নিকট সম্পর্কীয় মানুষ হিসাবে নয়, শ্রমের ক্ষেত্রে সহযোগী ও সহায়ক এবং প্রয়োজনে তার বদলী হিসাবে তাদের কাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি"--থেকে এই শিল্প শুধু বঞ্চিতই

নয় এই শিল্প বিশাল শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে এর বৈচিত্র্যহীনতা, তুচ্ছতা, দুর্বোধ্যতা ও নিম্নমানের জন্য তাচ্ছিল্য ও বিরক্তিই উৎপাদন করতে পারে। কেবলমাত্র উচ্চমূল্যের কারণেই শ্রমজীবিদের নিকট এই শিল্প গ্রহণের অযোগ্য নয়, এই শিল্প তাঁদের দ্বারা সৃষ্টও নয় নির্বাচিতও নয় এবং তাঁদের অনুপ্রেরিত করার মত এর মধ্যে কোন অন্তর্বস্তুও নেই।

কিন্তু এই শিল্পগুলি জনগণের মনের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং রুচিবিকৃত, 'অর্ধচরিত্রভ্রষ্ট' জনতার একটি অংশ এই ধরণের শিল্পগুলি উপভোগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিল্পের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক সীমাবদ্ধতা ও অধঃপতনের কারণ হিসেবে টলস্টয় দেখিয়েছেন যে অভিজাত অংশের মানুষের উপভোগের আগ্রহ অনেকাংশে দায়ী। উপভোগের অনুভূতিগুলি সীমাবদ্ধই শুধু নয় সেগুলি সবই পুরাতন ও পুনরাবৃত্তিমূলক। দ্বিতীয়ত শ্রম ও সৃষ্টি কর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন পরশ্রমজীবিদের অনুভূতিসমূহও সজীবতাহীন ও বৈচিত্র্যহীন অতএব কয়েকটি সীমাবদ্ধ জান্তব অনুভূতি ছাড়া আর কোন বিষয়েই তারা আকর্ষণ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু সমগ্র নিম্নগামিতার প্রক্রিয়াটির মূলগত কারণ হিসেবে তিনি যা বুঝতে পারছিলেন তা হোল পরশ্রমজীবি শ্রেণীগুলির সমাজে অসত্য ও অপ্রয়োজনীয় অবস্থানজনিত। নিজেদের অযৌক্তিক অস্তিত্বের সপক্ষে শ্রমবিমুখ শ্রেণীগুলির কিছু কল্পিত ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকার ও তাকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করবার ও বিশ্বাস করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে কল্পনা-বিভ্রম যত অযৌক্তিক ও হাস্যকরই হোক না কেন তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার একটা বেপরোয়া প্রচেষ্টা চলতে থাকে এবং তাকে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করারও প্রয়াস নেওয়া হয়ে থাকে। নিজেদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রম বা মোহ সঞ্চারের চেষ্টা হয় শিল্পের মাধ্যমে। এই প্রচেষ্টারই একটি প্রতিফলন নীটশের দর্শন --পৃথিবীটা জয় করার জন্য এবং উপভোগের জন্য, শক্তিমানেরাই যোগ্যতম। কুসংস্কার, জাত্যাভিমান ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই প্রকৃত ও অপ্রীতিবোধ্য সত্য থেকে নিজেদের ও জনগণকে সরিয়ে রাখার শেষ উপায়। টলস্টয় সঠিকভাবেই সমকালীন শিল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফরাসী সমালোচক ডুমিক-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন.

"..জীবনের বিষন্নতা, বর্তমান যুগের প্রতি ঘৃণা, শিল্প-বিভ্রান্তিজনিত অপর যুগের জন্য খেদ, আত্মবিরোধিতায় রুচি, অনন্যসাধারণ হবার আকাংখা, সরলতার প্রতি আবেগময় অভীপ্সা, আশ্চর্যবস্তুর শিশুসুলভ পূজা, জাগর স্বপ্নের প্রতি অসুস্থ প্রবণতা, স্নায়ুর বিক্ষিপ্ত অবস্থা—এবং সর্বোপরি অত্যুগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দাবী।"

কাজেই এই শিল্প বিকৃত। শিল্প আরো বিকৃতি লাভ করছে পেশাদারী সমালোচক ও শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে। এই শিল্প অভিজাত শ্রেণীর হলেও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর। বিভ্রম সৃষ্টি, কুসংস্কার, যৌনতা প্রভৃতির প্রসার ছাড়াও এতে শ্রমশক্তির বিপুল অপচয় হয়ে থাকে। জনগণের একটি অংশের রুচি ইতিমধ্যেই এর প্রভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। প্রকরণ ও উপস্থাপন কোশলের দিক থেকে এরূপ শিল্প অনেক বেশী সুচতুর ও কৌশলী বলেও এই শিল্প জনগণের মধ্যে অসুস্থ প্রভাব রাখতে সক্ষম।

ভাবীকালের শিল্প

যে শিল্পের চর্চা প্রবল প্রতিপত্তির সংগে তাঁর সময়ে চলছিল টলস্টয় তার কদর্যতা উন্মোচন করে বলেছেন সেটা শিল্পই নয়, একটা বিকৃত ব্যাপার যা ক্ষতি ও অধঃপতন ঘটায়। এই অবস্থাতেও কিন্তু তিনি হতাশাগ্রস্ত নন। এরই পাশাপাশি একটি অগ্রগামী শিল্প আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে বলে তিনি উপলব্ধি করেছেন। সমকালীন প্রগতিশীল শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেন নি, তবে প্রগতিশীল শিল্পের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে তিনি কিছুটা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় নীতি-ভিত্তিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব, আত্মদানের খ্রীস্টীয় ধারণা, মেরীর আত্মানু-শোচনা ইত্যাদিই হোল প্রগতিশীল শিল্পের উপযুক্ত বিষয়বস্তু। আপনসৃষ্ট শিল্পকর্মগুলিকে তিনি প্রগতিশীল বলে মনে করেন কিনা এরূপ স্পষ্ট কোন ধারণা তিনি প্রকাশ করেন নি। যদিও তিনি একস্থানে বলেছেন যে তাঁর শিল্পকর্মগুলি কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবই সমসাময়িক শিল্পদর্শন ও অভ্যাস প্রভাবিত।

সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নেই টলস্টয় ঐ উপরোক্ত খ্রীস্টীয় ধর্মভাবে দ্বারা পরিচালিত। শ্রেণীগুলির অনিবার্য সংঘাতের প্রশ্নে তাঁর মধ্যে একটা উদাসীনতার ভাব লক্ষণীয়। ভবিষ্যতের ও বর্তমানের প্রগতি-শীল শিল্পকে তিনি সৎ ও সার্বজনীন শিল্প নামে অভিহিত করেন। কিন্তু তবুও বস্তুগতভাবে যে শ্রেণীগুলিকে ও যাদের সংস্কৃতিকে তিনি নিষ্করুণ-ভাবে উদ্ঘাটন করেছেন, বর্তমান ও ভাবীকালের সজীব শিল্পীরা সেই আরাম-প্রিয়, অপদার্থ, অপ্রয়োজনীয় উপসত্ত্বভোগীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আচার আচরণের উদাহরণ ও দর্শনকে পরাস্ত করেই ক্ষান্ত থাকবে না, তাদের অযৌক্তিক অস্তিত্বকেও সবলে পরাস্ত করে সমাজ অধগতির একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণী লক্ষ্যেই তাঁরা পেঁছবেন।

ভাবীকালের শিল্পের যে রূপরেখা তিনি এঁকেছেন তা প্রাণ-প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। ভাবীকালে অগণিত শিল্পী শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করবেন আপন অনুপ্রেরণায়। শ্রমজীবি মানুষের দাবী পূরণ করবে এই শিল্প এবং শিল্পীরা সকলেই হবেন শ্রমসাধ্য কোন কাজে নিযুক্ত মানুষ। ভাবীকালে শিল্পই রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে সমাজকে সুসংহত রাখবে। কি প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি হবে অথবা রাষ্ট্র অবলুপ্তির পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে শিল্পের রূপ ও লক্ষ্য কি কি হবে এসব বিষয় তিনি আলোচনায় স্থান দেন নি। এই সমস্ত বিষয়গুলিতে একটি নির্বিরোধী অবস্থান তিনি গ্রহণ করেছেন। তথাপি টলস্টয়ের শিল্প চিন্তা কেবলমাত্র প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেই শক্তিশালী করে।

[উদ্ধৃতিগুলি দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ অনূদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত টলস্টয়ের 'শিল্পের স্বরূপ' থেকে নেওয়া]

সাহিত্য-শিল্প চিন্তায় লেনিন

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

লেনিনের কাছে সাহিত্যশিল্প হল, আত্মেতর বাস্তবের প্রতিফলন। অতীত সংস্কৃতির মহান স্রষ্টাদের চেতনায় বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে···লেনিনবাদ শেখায় কেমন করে কোন্ শিল্প-সাহিত্যতে তার ঐতিহাসিক মর্ম বের করতে হয়, কেমন করে আলাদা করতে হয়, তার মধ্যেকার মৃত থেকে সজীবকে কেমন করে নির্ণয় করতে হয়, কোন অংশ অগ্রমুখী কোন্ অংশ পশ্চাদ্‌পদতার দাসত্বে আচ্ছন্ন—লেনিনের শিল্প-চিন্তার সার কথাটি এইভাবে বলেছেন প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক লিফ্‌শিৎস্।

লেনিন জন্মেছিলেন প্যারী কমিউনের আগের বছর ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল, আর জীবনাবসান ঘটেছিল ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী। এই সময়সীমাকে মানবসভ্যতার ইতিহাসে 'যুগসন্ধিকাল' বলে চিহ্নিত করছি এই জন্য যে, এই যুগে একদিকে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, পুঁজিতন্ত্রের পরজীবীতার স্তরে পেঁৗছেচে; অপরদিকে ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব ও ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের শিক্ষার্জিত পথের ক্রমবিকাশে দুনিয়ার দিকে দিকে শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের, তথা সমাজ-তন্ত্রের সূচনা হয়েছে। এই হল লেনিনের কর্ম ও চিন্তা জীবনের পটভূমিকা।

১৯২৫ সালের ২১শে জানুয়ারী 'রাবোচায়া গাজেতা' বা শ্রমিক গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত লেনিনের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত এক পত্রে কমরেড স্তালিন বলেছিলেন—'গড়ে তোলো নতুন জীবন, নতুন অস্তিত্ব, নতুন সংস্কৃতি—লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী।' এই জীবন ও সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ঠিক বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত 'ব্রেণ প্রসেস'-এর মতো ভিতের উপরিতল। বুর্জোয়া দার্শনিকরা কিন্তু মানুষের ইতিহাসকে দ্বন্দ্ব-মূলক বিবর্তনের নিয়ম বা শ্রেণী-সংগ্রাম বলে না মেনে সাহিত্য-শিল্পকে সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিমনের বিচিত্র রহস্যানুভূতির বা ঐন্দ্রজালিক স্বপ্নকল্পনার প্রতিফলন বলে প্রচার করেন। অতঃপর ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস্ 'ঐতি-হাসিক ঘোষণাপত্র' তথা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে—মহান ব্যক্তিগণই

ইতিহাসের স্রষ্টা, এই ধারণা নস্যাৎ করে বললেনঃ "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গিয়েছে তাদের লিখিত ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।...সামন্তসমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ শেষ হয়ে যায়নি...গোটা সমাজ দুটি বিশাল শত্রুশিবিরে বিভক্ত হয়েছে—পরস্পরের মুখোমুখি দুই বৃহৎ শ্রেণীতে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে।" শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি এই আলোকেই বিচার্য। বুর্জোয়া ধারণা হল, শ্রমজীবী জনগণ কখনও শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টিশীল প্রতিভা হতে পারে না, তা হল কোন কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রতিভার ফল। এই থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম। ১৮৯৬ সালে রচিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির খসড়া কর্মসূচীর ব্যাখ্যামূলক নোটে তিনি মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে আক্রমণ করে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ও বিচারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন এই বলে যে, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিল্পের সমস্ত উত্তরাধিকার শ্রমজীবী জনগণের। শতাব্দীর পর শতাব্দী যা মুষ্টিমেয় সম্পদশালী ও সুবিধাভোগী অংশের করায়ত্ত ছিল, আজ তাকে বিদ্যুৎ ও রেল পথের সঙ্গে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দিতে হবে। লেনিন মনে করতেন, সমাজজীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রশ্নটিও জড়িত। বুর্জোয়া 'পুরোহিত'গণ তাঁদের প্রভু 'ঘাতক'-এর রণনীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে স্থিতাবস্থার গুণকীর্তন করেন এবং শিল্প-সাহিত্যে নানা রকম ভাববাদী ইজম্-এর আমদানী ঘটিয়ে বৃহত্তর শোষিত জনগণকে 'তফাৎ যাও' হাঁক ছাড়েন। এই জন্যই শোষণ-নির্ভর দুনিয়াটাকে বদলানোর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে 'ঘাতক' বা শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিততন্ত্র বা বুর্জোয়া লেজুড়বাদের বিরুদ্ধেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংগ্রামী হাতিয়ার শানিয়ে তুলতে হবে।

লেনিন বলেছেন, অতীতের সকল জাতির মধ্যেই শোষিত শ্রেণী রয়েছে এবং অতীতের সকল মহৎ শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে বিপ্লবী উপাদান থেকে যাবেই। কাজেই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, অর্থাৎ সেই সময়কার অর্থনৈতিক ভিতের পরিচয় নিয়ে শিল্প সাহিত্যের শ্রেণী-চরিত্র ও মহৎ সৃষ্টির মধ্যেকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাত্রা বুঝে বিচার করতে হবে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সমকালের সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু শক্তির বিরুদ্ধে অবহেলিত, অথচ বর্ধমান ও বৃহত্তর বাস্তব শক্তির অনুগামী 'সৃষ্টিমূলক মানসিক প্রক্রিয়া' বা শিল্প-সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশ করতে হবে। লেনিনবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, অতীতের শিল্পসংস্কৃতির মধ্যে পরস্পর জড়িত থাকা বিপ্লবী উপাদান ও স্থিতাবস্থার অনুকূল প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানকে আলাদা করতে শিখতে হবে এবং জীর্ণ

ও জরাগ্রস্ত উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করে জীবন্ত ও গণতান্ত্রিক উপাদান-গুলির মুখ আগামীকালের ঐতিহাসিক বিকাশের পথে সঞ্চালিত করতে হবে, এমনি করেই ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনে শিল্প-সাহিত্য মহৎ ও বিপ্লবী ভূমিকা নিয়ে থাকে। ১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর যুব-লিগের ৩য় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়ার সমস্যা প্রসঙ্গে, লেনিন বলেছেন—"যদি না আমরা গোটা মানবজাতির বিকাশধারায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতির সঠিক চরিত্র বুঝতে পারি এবং যদি না সেই সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে শিখি, তাহলে আমরা কোন দিনই প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারব না। প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে পাতলা বাতাস থেকে মুঠো করে ধরা যায় না, বা তা কোন বিশেষজ্ঞের উর্বর মাথা থেকেও জন্মায় না। এসব ধারণা নেহাতই বাজে। পুঁজিপতি, জমির মালিক ও আমলা-তান্ত্রিক সমাজের জোয়ালের নীচে থেকে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে তারই বিজ্ঞানসম্মত বিকাশ হতে হবে!" (সংকলিত রচনাবলী, খণ্ড ৩১)। উল্লেখযোগ্য যে, লেনিন অতীতের অর্জিত জ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের মন্থনে যেমন লেখক-শিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছেন, তেমনি গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি প্রয়োগের প্রশ্নটিও বার বার রেখেছেন।

১৯১৩ সালে 'আন্তর্জাতিক সংগীত'-এর রচয়িতা ফ্রান্সের শ্রমিক কবি ইউজেন পতিয়েরের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ভাষণে লেনিন বলেছেন, তিনি ছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর লড়াকু কবি। তাঁর সংগীতে ফ্রান্সের সকল মহৎ ও বৈপ্লবিক ঘটনা অনুরণিত হয়েছে এবং পিছিয়ে পড়া বৃহত্তর অংশের চেতনা ভাষা পেয়েছে। লেনিন পতিয়েরের নির্বাসন কালে রচিত 'ফ্রম আমেরিকান ওয়ার্কার্স টু দি ওয়ার্কার্স অব ফ্রান্স' সংগীতটিরও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গানে তিনি ধনতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য, মেরুদণ্ড-ভাঙা শ্রম, শোষণ অত্যাচার এবং সর্বোপরি তাদের মনে শৃঙ্খলমুক্তির লড়াই-এ জয়ের বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন।

॥ ২ ॥

ভাববাদীরা শিল্প-সাহিত্যে বাস্তবসত্যের ওপর জোর না দিয়ে বলেন, পার্থিব জগতের সঙ্গে তার যোগ আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, শিল্পী-সাহিত্যিকের আত্মগত ভাবনার পটে ফুটে ওঠা ছবি। অপরপক্ষে প্রকৃতিবাদীরা বলেন, সত্য হল বস্তুর নিখুঁত ফোটোগ্রাফী। লেনিন বস্তুবাদীদের মতাদর্শকে আরো সুনির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় জারিত করে বলেছেন, কেবল সরল ও তাৎক্ষণিক বাস্তবতা নয়; ঘটনার অতীত,

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিকাশের বাস্তবতার যে সামগ্রিক রূপ তাকে সৃষ্টিশীল, কল্পনায় মূর্ত করে তোলার নামই বাস্তবসত্য। শিল্প-সাহিত্যের সত্যে সেই রকম কল্পনা থাকবে যা সামগ্রিক বা অখণ্ড বাস্তবতাকে মূর্ত করার উপযোগী ইমেজের দ্বারা প্রতিফলিত হবে। লেনিন শিল্প-সাহিত্যের কাছ থেকে, একই সঙ্গে জীবন্ত মানবিক ডকুমেণ্ট ও তার ওপর ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন পেতে চেয়েছেন। এইখানেই বস্তুবাদীদের সঙ্গে মার্কস-বাদীদের পার্থক্য।

নাদেঝ্দা ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি যে, লেনিন সাই-বেরিয়ায় নির্বাসন কালে, নানা বিপ্লবী কাজকর্ম ও রাজনৈতিক তত্ত্বমূলক রচনার অবকাশে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে রাশিয়ার, ইংলণ্ডের, জার্মানীর ও ফ্রান্সের চিরায়ত সাহিত্য পাঠ করতেন। লিও টলস্টয় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ও বিচার-বিশ্লেষণ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তথা শিল্প-সাহিত্যের মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি বুঝতে বিশেষ সহায়ক। লেনিন বলেছেন, "যদি আমরা কোন প্রকৃত মহৎ শিল্পী পাই, তবে দেখব কোন না কোন ভাবে তাঁর সৃষ্টিতে কিছু অন্তত বিপ্লবের মূল উপাদান রয়ে গেছে।"

লিও টলস্টয়ের সাহিত্যকর্মের সময়টা ছিল মোটামুটি ১৮৬১ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এই সময়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শার্ফপ্রথা সূক্ষ্মভাবে ঢুকে গেছে, আবার পুঁজিবাদও ভেতর থেকে মাথা তুলেছে ও বাইরে থেকে ঘাড়ে চাপছে। টলস্টয়ের রচনা-বলীতে যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে, তা কেবলই লেখকের ব্যক্তিমানসের দ্বন্দ্ব নয়, বিভিন্ন চরিত্রের শ্রেণীমনস্তত্ত্বে সেই সময়কার সামাজিক প্রভাবের জটিলতা ও ঐতিহাসিক মূল্যবোধের অস্থিরতার কথাও বুঝতে হবে। টলস্টয়ের গল্প-উপন্যাসে এই কারণেই কৃষক আন্দোলনের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও শক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। লেনিনের বিচারে, 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের লেভিন চরিত্র সেই যুগের পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধি চরিত্র। টলস্টয়ের ধর্মমত ও দার্শনিক মতবাদ ইউটোপীয় হলেও, তাঁর সৃষ্টিকর্মে স্বাভাবিকভাবে বিপ্লবের নানা উপাদান এসে গেছে। তাঁর সাহিত্য ছিল 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ।' লেনিন প্রায়ই টলস্টয়ের সঙ্গে সালতিকভ-শেচেদ্রিনের উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনাগুলিতে ষাটের দশকের রাশিয়ায় পুঁজিবাদের প্রসার ও তজ্জনিত গ্রাম জীবনে বর্ধমান দারিদ্র্য নিখুঁত বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে।

যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেনিন দেশ-বিদেশের কয়েকজন চিরায়ত সাহিত্য-শিল্পীর রচনার বস্তুনিষ্ঠ শিল্পের মর্মসত্য উপলব্ধি করেছেন, তা শিল্প-সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির মূল্যবান নিরিখ হয়ে আছে। অতীতের সাহিত্য-শিল্পের অধিকাংশ গবেষকই তুলে ধরেছেন, কবি ও

শিল্পীর আত্মগত ভাবানুভূতির দিক, যা তাঁদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেছে; কিন্তু গ্যেটে, বালজাক, টুর্গেনিভ, পুশকিন, চের্নিসেভস্কি, টলস্টয় প্রমুখ মহৎ সাহিত্যিকদের মূল্যায়নে লেনিন নিপুণ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তাঁদের স্ব-কালের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বগুলিকে, এবং আদর্শগত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব উপাদানগুলিকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে আগামীকালের বাস্তবতার গর্ভে সেগুলির সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। তার মানে এই নয় যে, তিনি অতীতের লেখক-শিল্পীদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। লেনিন অবশ্যই সঠিক বিশ্লেষণে টলস্টয়ের ও টুর্গেনিভের রাজনৈতিক গোঁড়ামি ও বিভ্রান্তিকর ধারণার উল্লেখ করেছেন; বিশেষ করে টলস্টয়ের ধর্ম ও আত্মগ্লানি প্রচারকে সমালোচনা করতে ছাড়েন নি।

১৯১২ সালের ৮ই মে 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হারজেন স্মরণে' রচনায় লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে হারজেনের কর্মজীবন স্মরণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও তাঁর নারোদবাদী রুশীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমাজতন্ত্রের এক কণাও ছিল না, তবু তাঁর রচনাবলীতে হেগেলের প্রতিফলন ক্রমে ফয়েরবাকের পথ ধরে বস্তুবাদের চৌকাঠে পা রেখেছে বলে লেনিন লক্ষ্য করেছেন। লেনিন বলেছেন, রাশিয়ার বাইরে স্বাধীন রুশ পত্রিকার স্থাপয়িতা রূপে হারজেনের অবদান অবিস্মরণীয়। লণ্ডন ও জেনিভায় তাঁর প্রকাশিত 'পলিয়ারনায়া ভেঝদা' বা 'দি পোল স্টার' (১৮৫৫-৬২) বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের ঐতিহ্য বহন করছে এবং 'কলোকল' বা 'দি বেল' (১৮৫৭-৬৮) নিপীড়িত কৃষকদের মুখে ভাষা দিয়েছে ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের ডাক দিয়েছে। লেনিন উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে পোল-বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করার প্রতিবাদে 'কলোকল' গর্জে উঠেছিল ও রুশ গণতন্ত্র তথা বিবেকী মানবতাবাদের সম্মান রক্ষা করে ছিল। লেনিনের বিচারে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামন্ত-জমিদার শ্রেণীর জাগরণ থেকে ডিসেম্ব্রিস্টদের স্বদেশ-প্রেম এবং এই স্বদেশ-প্রেম থেকেই হারজেনের বিক্ষোভ ভাষা পেয়েছিল।

১৯১২ সালে লেখা 'তবু আর একটি গণতন্ত্র-বিরোধী প্রচার' পুস্তিকায় লেনিন বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের অন্যতম লেখক ও দার্শনিক বেলিনস্কির সাহিত্যকর্মকে জনগণের চেতনার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন এবং সেইসঙ্গে উদারপন্থী প্রতি-বিপ্লবী 'ভেখী' বুদ্ধিজীবীদের, বেলিনস্কিকে নিছক 'ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতিভাধর শিষ্য' বলে চালু করার অপপ্রয়াসকে লেনিন অত্যন্ত সতর্ক অথচ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বেলিনস্কির চিন্তার উৎসভূমি ১৯শ শতকের কৃষক বিদ্রোহের কর্মসূচী-ভিত্তিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। কাজেই এই

শতকের রুশীয় সাহিত্য-দর্শনের বিচারে ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের সামাজিক চিন্তাকে ভিত্তি হিসেবে নিলে কেবল ভুলই হবে না, বরং অনেকক্ষেত্রে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করা হবে বা বিভ্রান্তিকর পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। লেনিন অবশ্য তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার প্রশ্ন এড়িয়ে যাননি। উদারপন্থী বুর্জোয়া পণ্ডিতগণ তাঁর সাময়িক পলায়নী মনোভাবের কারণ হিসেবে হেগেলের—'যা কিছু বাস্তব তাই-ই র‍্যাশনাল এবং যা র‍্যাশনাল তাই-ই বাস্তব'—এই ধরনের দার্শনিক ভাবধারার প্রভাবজাত ব্যক্তিগত হিস্টিরিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। এর জবাবে লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বেলিনস্কির যা কিছু ব্যর্থতার কারণ, সেই সমসকার বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে নিজের বিপ্লবী দর্শনকে পেতে চাওয়ার দুঃখজনক প্রয়াসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। লেনিন অপরিসীম গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সংগে বেলিনস্কির 'লেটার টু এন ভি গোগল' লেখাটির উল্লেখ এইজন্য করেছেন যে, এটি একাধারে তাঁর বিপ্লবী সাহিত্য-সমালোচনার দিগ্‌দর্শন ও গত শতাব্দির চল্লিশের দশকের বিপ্লবী সার্ফ কৃষকদের ও প্রগতিশীল অংশের ম্যানিফেস্টো। 'ভেখী' বুদ্ধিজীবীরা তাঁর এই রচনাটিকে বিষণ্ণ ও বুদ্ধিজীবীসুলভ সেণ্টিমেণ্টে পূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। লেনিন তাঁর ১৯০৯ সালে লেখা 'ভেখী প্রসংগে' রচনায় এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বিকৃত সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

লেনিন রুশ ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের নাম দিয়েছেন—বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের যুগ, যা সেভস্তপোলের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর পর থেকে শুরু হয়েছে। এই যুগের সাহিত্য দর্শনের নেতৃত্ব চের্নিসেভস্কি, নেক্রাসভ ও সাল্টিকভ-শ্চেদ্রিন-এর রচনাবলীতে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৩১ সালে লেখা 'লেনিন ও চের্নিসেভস্কি' নামের স্মৃতিকথায় নাদেঝ্‌দা ক্রুপস্কায়া বলেছেন, যদিও লেনিন কোথাও সরাসরি উল্লেখ করেননি যে, তাঁকে নিকোলাই চের্নিসেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯) নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন, তবু লেনিন তাঁকে 'প্রায়ই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করতেন।' লেনিনের 'কি করিতে হইবে' লেখায় চের্নিসেভস্কির প্রভাব অপরিসীম। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৮ সালে যখন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে উঠছে, তখন বিগত দিনের যে সকল বিপ্লবীর কর্মজীবন শ্রমিকদের বেশি প্রভাবিত করেছিল, তাঁদের মধ্যে চের্নিসেভস্কি অন্যতম। ১৮৬১ সালের সংস্কার-যুগে কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক উদারপন্থী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তিনি আপোসহীন বলিষ্ঠতায় গণতন্ত্রের পক্ষে কলম ধরেছিলেন। লেনিন তাঁর 'জনগণের বন্ধু কারা... ইত্যাদি' প্রবন্ধে বলেছেন—"চের্নিসেভস্কির সময়ে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম আর সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম এক অবিচ্ছিন্ন সমগ্র চেহারায় আত্মপ্রকাশ

করেছিল।" লেনিন তাঁর 'রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ' গ্রন্থে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে চের্নিসেভস্কির বাস্তববাদীতা ও গ্রামজীবনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানেক উল্লেখ করেছেন। প্রথম জীবনে প্লেখানভের লেখা 'চের্নিসেভস্কি সম্বন্ধে' লেখাটি পড়েও তেমন গুরুত্ব দেননি! কিন্তু ১৯০৮ সালে দার্শনিক ফ্রন্টে সংগ্রাম তীব্র হলে তিনি আবার চের্নিসেভস্কি পড়ে বলেন, তিনি ছিলেন মহান 'রুশ হেগেলীয়' এবং বস্তুবাদীও। ১৯১৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় প্রশ্ন প্রধান হলে লেনিন তাঁর 'জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে' লেখায় স্বীকার করেন, মার্কসের মতো চের্নিসেভস্কিও পোল-অভ্যুত্থানের সঠিক তাৎপর্য বুঝেছিলেন। লেনিন তাঁকে হারজেনের চেয়েও অগ্রসর গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর লেখা 'জমির কমিউনিটি মালিকানার বিরুদ্ধে দার্শনিক গোঁড়ামির সমালোচনা' (১৮৫৮), 'জমি উদ্ধার কি কঠিন' (১৮৫৯), 'কৃষি-প্রশ্ন সমাধানের উপাদান' (১৮৫৯) প্রভৃতি রচনায় 'শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা রয়েছে।' তবে একথাও ঠিক যে, রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশের পরিণামে উদ্ভূত পরিস্থিতিই সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটাবে, এটা তিনি যেখানে ধরতে পারেননি সেখানে তিনি ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক। লেনিন লক্ষ্য করেছেন, চের্নিসেভস্কি চেয়েছিলেন রাশিয়ায় বুঝি গ্রামজীবনের পরিবর্তনে সমাজতন্ত্র আসবে। অবশ্য তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, যেখানে তিনি উদারপন্থী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে, ১৮৬১ সালের কৃষি-সংস্কারের নামে জারের ভণ্ডামি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে তিনি যথার্থই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও বস্তুবাদী দার্শনিক।

॥ ৩ ॥

রুশ সাহিত্যের তৃতীয় ঐতিহাসিক পর্বকে লেনিন বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে 'প্রলেতারিয় অধ্যায়' নামে অভিহিত করেছেন। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পী রূপে ম্যাক্সিম গর্কির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সপ্রেম উদ্বেগ উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। ভ্লাদিমির শেচরবিনা তাঁর 'লেনিন ও সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থে বলেছেন—"লেনিন কেবলই প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের কাজের মধ্যেকার গণচরিত্র বার করেন নি, সেই সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পীর গণসংযোগের বৈশিষ্ট্যও উদ্ঘাটন করেছেন এবং কেমন করে সেই গণ-জীবন তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাও বিশ্লেষণ করেছেন। বেলিনস্কি ও চের্নিসেভস্কির কণ্ঠে যেমন বিপ্লবী মনোভাবের লক্ষ লক্ষ শার্ফ কৃষকদের কথা ভাষা পেয়েছে, টলস্টয় যেমন পিতৃতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ ফুটিয়েছেন, গর্কি তেমনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের পর্বে আবির্ভূত হয়েছেন।" লেনিন সব-সময়ের সাহিত্যে বাস্তবসত্য ও শিল্পসত্যের সমন্বয় চাইতেন এবং গর্কির লেখায় তিনি এই দুটির সার্থক প্রতিফলন পেয়েছিলেন। লেনিন ও গর্কির সম্পর্ক প্রসঙ্গে ক্রুপস্কায়া তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—লেখক হিসেবে গর্কি সম্বন্ধে ইলিচের খুব উঁচু ধারণা ছিল, তিনি বিশেষ করে গর্কির 'মাদার' ও নভয়া ঝিন্ পত্রিকায় প্রকাশিত ফিলিস্টাইনিজ্ম সম্পর্কে রচনাগুলি পছন্দ করতেন। গর্কির 'দি লোয়ার ডেপ্থ', 'দি সঙ্ অব দি ফ্যালকন' এবং 'দি সঙ্ অব দি স্টর্মি পেট্রেল' লেনিনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। আমার মনে পড়ে, শেষ জীবনে তিনি আর্ট থিয়েটারে 'লোয়ার ডেপ্থ' দেখার জন্যে ও 'মাই এ্যাপ্রেন্টিস্শিপ্' শোনার জন্যে কি প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠতেন। গর্কি প্রধানত শ্রমিক, শহরের গরীব মানুষ ও নীচের তলার মানুষদের নিয়ে লিখে-ছেন। তিনি জীবনকে তার বাস্তব চেহারায় দেখেছেন এবং দেখেছেন এমন একজন মানুষের চোখে, একজন বিপ্লবীর চোখে যিনি শোষণ, নির্যাতন, নগণ্যতা ও চিন্তার দৈন্য ঘৃণা করতেন।

বলাবাহুল্য, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সমালোচকরা গর্কির লেখার অপ-ব্যাখ্যা করে জনগণের মধ্যে গর্কি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৭ সালে মার্কিন মুলুক থেকে প্রকাশিত 'সোভিয়েত সাহিত্যের অভিধান' গ্রন্থে গর্কিকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রবক্তা হিসেবে না দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন বিগত ১৯শ শতকের রুশীয় বাস্তবতার শেষ অধ্যায়। অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিরোধে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরই তৎপর তা নয়, গর্কির সমকালের 'শিল্পীর স্বাধীনতা' মার্কা ভণ্ডামিপূর্ণ মতবাদে বিশ্বাসী উদারপন্থী বুর্জোয়া ও শোধনবাদী পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীগণ ('ভেখী' গোষ্ঠী ও মেনশেভিক দল) তাঁদের 'ম্যাকিজম' ও ফিলিস্টাইনিজম-এর হাতিয়ারে বলশেভিক দলের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে নানা কায়দায় আক্রমণ করেছেন। এই সময়ে লেনিন তাঁর 'ইস্ক্রা' পত্রিকার মাধ্যমে বার বার শিল্প সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তথা গর্কি প্রমুখ প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে কলম ধরেছেন। "বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদীদের আমরা অবশ্যই বলব, পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য নিছক ভণ্ডামি। যে সমাজ অর্থ-ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল, যে সমাজে শ্রমজীবী জনগণ দারিদ্র্যে বাস করে এবং মুষ্টিমেয় ধনীরা পরগাছার মতো বেঁচে থাকে সেই সমাজে কোন প্রকৃত 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না।... বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বাধীনতা টাকার থলি, দুর্নীতি ও বেশ্যাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল নিছক একটি মুখোশ।" ১৯০৫ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে প্রথম সাক্ষাৎকারে লেনিন গর্কির

'মাদার' উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেন—'বইটি খুব প্রয়োজনীয় ও সময়োপ-যোগী। বহু শ্রমিক না জেনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন; এখন তাঁরা বইটি পড়ে নিজেদেরকে সচেতন করার সুযোগ পাবেন।" 'মাদার' সম্পর্কে 'সময়োপযোগী' মন্তব্যটির গুরুত্ব এই যে, লেনিন শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিপ্লবী সংগ্রামের যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকার ওপর জোর দিতেন। 'মাদার'-এ তিনি বিশ্বসাহিত্যে এক নতুন যুগ-নায়ককে দেখেছিলেন, বীরত্বপূর্ণ রোমান্টিকতায় অনুপ্রাণিত সচেতন ও বিপ্লবী-শ্রমিক-শ্রেণী। গর্কির রোমান্টিক ও রূপকাত্মক 'ইমেজ' লেনিনের খুব ভাল লাগত; তবে 'ফ্যালকন' ও স্টর্মি পেট্রোল-এর মতো বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা তিনি সমর্থন করতেন। তখনকার নারোদবাদী ও উদারপন্থী সমালোচকগণ গর্কির রোমান্টিকতাকে সাধারণ জীবন থেকে মুখ ফেরানো বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই যুক্তিতেই তাঁকে ক্ষয়বাদীদের সারিতে দাঁড় করিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ ধরনের সমালোচনা উদ্দেশ্যমূলক। অবশ্য লেনিন কখনই বাস্তবতার এক পেশে নেতিবাচক রোমান্টিকতা পছন্দ করতেন না। যেমন. ১৯১৮-১৯ সালে গর্কি 'একটি কঠিন প্রশ্ন' প্রবন্ধে কাল্পনিক নায়ক সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি দিলে, লেনিন আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, তিনি চান শিল্পবৈচিত্র্য। ভি· আই· কাচালভ তাঁর স্মৃতি কথায় ১৯১৯ সালে কোন এক থিয়েটার হলে গর্কির সঙ্গে লেনিনের কথাবার্তার উল্লেখ করেছেন। গর্কি যখন বললেন, দর্শকেরা কেবল বীরত্ব চান, লেনিন জবাব দিয়েছিলেন, না—তাঁরা লিরিকও চান, চেখভও চান, অর্থাৎ পূর্ণ জীবনসত্য। লেনিনই গর্কিকে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক শিবির থেকে, বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে পার্টি-পত্রিকা ইস্ক্রা মাধ্যমে বলশেভিক দলে টেনে এনেছিলেন। এই বলশেভিকবাদই গর্কিকে জীবনের সঠিক পথ দেখিয়েছে। "আমি আর কোন রাস্তা দেখি না। অন্য সমস্ত রাস্তাই জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। কেবল এই পথই জীবনের পথ" (সংকলিত রচনাবলী, খণ্ড ২৮)। মার্কসবাদ ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে মেলাতে চান, এমন কিছু বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গর্কি এক সময়ে সাধারণ গণতান্ত্রিক ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার আশা পোষণ করলে, লেনিন গর্কির মোহ কাটাতে বলেছিলেন, এটা তাঁর নিজেকে নষ্ট করার দুঃখজনক প্রয়াস। ১৯০৫ সালের বিপ্লব পরাজিত হলে লেনিনের উৎসাহে ও সাহায্যে গর্কি বলিষ্ঠভাবে ক্ষয়শীলতা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে 'ব্যক্তিত্বের ধ্বংস' প্রসঙ্গে ও অন্যান্য প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে গর্কি অত্জোভিস্ট ও ম্যাকিস্টদের দিকে ঝুঁকে 'নতুন ধর্ম' ও 'ঈশ্বর নির্মাণ' মতবাদের গল্প 'কন্ফেসন' রচনা করেন, লেনিন এই সময়ে এক পত্রে গর্কিকে জানালেন—"God-seeking differs from God-building or God-creating or God-

making etc. no more than a yellow devil differs from a blue devil."
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় লেনিন ও গর্কির মধ্যে সাময়িকভাবে ছাড়াছাড়ি হয় এবং সেই সুযোগে গর্কির মধ্যে মেনশেভিক ও ফিলিস্টাইনদের কিছু 'শভিনিস্ট' সংস্কার ঢুকে পড়ে। এটা বুঝতে পেরে লেনিন সঙ্গে সঙ্গে 'টু দি অথর অফ দি সঙ্ ফ্যালকন' রচনা করেন এবং তাতে ভণ্ডামিপূর্ণ দেশাত্মবোধক প্রতিবাদের বদলে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন প্রতিবাদ আহ্বান করেছেন।

মানবসংস্কৃতির ওপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কিভাবে পড়ছে ও বিশ্বের বিবেকী শক্তি কোথায় কিভাবে জেগে উঠছে, এইসব ঘটনার প্রতি লেনিনের আগ্রহ কত প্রবল ছিল, তা ফ্রান্সের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী আঁরি বারবুস তাঁর 'ক্লার্তে' গোষ্ঠী, রঁমা রঁলা, আনাতোল ফ্রাঁস, এইচ· জি· ওয়েল্‌স ও আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৯সালে আঁরি বারবুসের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশ্বসংস্থারূপে 'ক্লার্তে' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২২ সালে অসুস্থ অবস্থাতেও লেনিন এই সংস্থার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন। ক্লার্তের প্রতি লেনিনের সংগ্রামী অভিনন্দন এটাই প্রকাশ করেছে যে, কি বিপুল শক্তিতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বিশ্বের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের ও শিল্প-সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। 'লে ফু' সম্পর্কে লেনিন বলেছেন—"পুরোপুরি অজ্ঞ অত্যন্ত সাধারণ স্তরের মানুষজন, যারা সাধারণভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ও নিছক বিষয়ী এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তারাও কিভাবে যুদ্ধের প্রভাবে বিপ্লবী হয়ে যায়, সেটাই অসাধারণ দক্ষতা, প্রতিভা ও সততার সহিত এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।" (সংকলিত রচনাবলী খণ্ড ২৯)।

শিল্প-সাহিত্যের বিচারে লেনিনের অসামান্য প্রতিভা রঁমা রঁলাকে কি গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল তার নিদর্শন তাঁর বিখ্যাত লেখা 'লেনিন—আর্ট এ্যাণ্ড এ্যাকসন এবং অন দি রোল অব দি রাইটার্স ইন মডার্ণ সোসাইটি' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে রয়ে গেছে। লেনিনের দুনিয়া বদলের কর্মসূচীর সঙ্গে সবেগ ভাবকল্পনার সমন্বয় রঁলার মধ্যে তীব্র আবেদন সৃষ্টি করেছিল। তিনি লেনিনের 'জনগণ অবশ্যই স্বপ্ন দেখবে' এবং গ্যেটের 'জনগণ অবশ্যই কাজ করবে'—এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যের ও জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন।

শিল্প-সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি কি হবে বা কিসের নিরিখে তার বিচার হবে, এ সম্পর্কে লেনিনের 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতা নির্ভর সমালোচনা' (১৯০৮) গ্রন্থটি একটি মূল্যবান দিগদর্শন হয়ে আছে। ভাববাদী বুর্জোয়ারা প্রধানত জড়বাদকে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে স্থাপন করেন, এমন কি সমাজতান্ত্রিক

বাস্তববাদীদেরও গাল পাড়েন। কিন্তু লেনিন বলেছেন, শিল্প-সাহিত্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সৃষ্টিশীল বস্তুবাদ, যার মধ্যে সামাজিক পরিবেশ-নির্ভর কল্পনা অবশ্যই সক্রিয়। এঙ্গেলসের পূর্বেও লেখকগণ শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখদুর্দশার বর্ণনা করেছেন এবং এদের সাহায্যের জন্য আবেদনও করেছেন। কিন্তু এঙ্গেলসই প্রথম লেখক-দার্শনিক যিনি বললেন, শ্রমিক শ্রেণী কেবলই দুঃখদীর্ণ শ্রেণী নয়। এই গ্লানিকর অর্থনৈতিক অবস্থা ঐতিহাসিক নিয়মেই তাদের সংগ্রামী শ্রেণীতে পরিণত করেছে এবং এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তির জন্য আপোসহীন সংগ্রামের বাস্তবতা যদি না আজকের শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তবে তা প্রতিক্রিয়ার শিকারে বা স্থিতাবস্থার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে বলে ধরতে হবে। লেনিনের ব্যাখ্যায় এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উল্টো পিঠের নাম 'ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদ', স্বাভাবিক বাস্তবতা, চেতনার স্রোত ও নয়া বৈরাগ্যবাদ—এইসব জটিল ও উদ্ভট মানসিক ব্যায়ামের বুর্জোয়া শিল্পতত্ত্ব।

নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া স্মৃতিকথায় বলেছেন—তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে আমি জ্যাক লন্ডনের 'লাভ অফ লাইফ' গল্পটি পড়ে শোনাচ্ছিলাম। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে অতিকষ্টে তার লক্ষ্যস্থল নদীর তীরে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে বরফে ঢাকা এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি পেরিয়ে। তার সঙ্গে আর একটি ক্ষুধার্ত প্রাণীও চলেছে--নেকড়ে। শেষ পর্যন্ত শীর্ণ নেকড়ে ক্ষুধার জ্বালায় মাঝপথে মরল। কিন্তু মানুষটি অর্ধমৃত অবস্থাতেও তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছল। লেনিন এই গল্প শুনে উল্লসিত হয়েছিলেন। পরদিন ঐ লেখকের আর একটি গল্প শোনালাম। একজন ক্যাপ্টেন জাহাজের মালিককে শস্যপূর্ণ জাহাজটা বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ঐ জাহাজটা কিনলে মালিকের মুনাফা বেশি হবে। অতঃপর ক্যাপ্টেন নিজের জীবন দিয়ে তার প্রতিজ্ঞা রাখল। এই গল্প শুনে লেনিন তাচ্ছিল্যভরে হেসে হাত নেড়ে বাতিল করলেন। দেখা যাচ্ছে, প্রথম গল্পটি স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল কল্পনায় সমৃদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি স্থিতাবস্থার পক্ষে ক্ষয়শীল ও বন্ধ্যা মানসিকতায় ক্লিন্ন। প্রথম ধরনের কথাসাহিত্য মার্কসবাদী স্বপ্নকল্পনায় উজ্জ্বল, আর দ্বিতীয় ধরণের রচনা সামাজিক ও নৈতিক আদর্শে দেউলিয়া বুর্জোয়া অবক্ষয়ে কলঙ্কিত। ১৮৯৭ সালে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবনে এক অবিশ্বাসী যুবক ঠাট্টা করে লেনিনের সামনে আবৃত্তি করেছিল—হে-স্বপ্ন! ব্যর্থ স্বপ্ন, কোথায় তোমার মাধুর্য! এতে লেনিন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ স্বপ্ন! যার দেখার মতো কোন স্বপ্ন নেই সে পশুতে পরিণত হয়। স্বপ্নই প্রগতির শক্তি! এবং সমাজতন্ত্রই হ'ল সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন!

লেনিন উগ্র ও অন্ধভাবে জাতীয় সংস্কৃতির নামে বুর্জোয়া সংস্কৃতির আদর্শগত প্রভাব সম্বন্ধে বার বার সাবধান করে বলেছিলেন, মার্কসবাদীরা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্যেই জাতীয় সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক উপাদানগুলির প্রতি আগ্রহী হন। তিনি উগ্র বামপন্থীয়ানা বা প্রলেতারিয় সংস্কৃতির নামে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা বা 'প্রলেতকাল্ট' প্রবণতাকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেছিলেন, প্রলেতারিয় সংস্কৃতি হ'ল—সেই দাস যুগ, সামন্ত যুগ ও বুর্জোয়া যুগের মানবিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তা ও সংস্কৃতিরই স্বাভাবিক পরিণতি। ১৯১৯ সালে গঠিত এই বামপন্থী ফ্রন্ট বা 'প্রলেতকাল্ট' হাজার বছরের অতীত থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত করে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী-সংস্কৃতি বানানোর চক্রান্ত করেছিল। লেনিন এই 'প্রলেতকাল্ট' আন্দোলনকে মূলত প্রাক-বিপ্লব যুগের বুর্জোয়া ম্যাকিজম-এর কোট বা রঙ বদল করা প্রতিবিপ্লবী দর্শন বলে সমালোচনা করেছেন।

শিল্প-সাহিত্য চিন্তায় মাও সে তুঙ

প্রভাতকুমার গোস্বামী

মাও সে তুঙ বর্তমান যুগের অন্যতম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাবিদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একজন উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন, একে বিকশিত করেছেন এবং চিন্তা জগতের নতুন স্তরে উন্নীত করেছেন। শিল্পসাহিত্য সম্পর্কেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন—এমন কি সাংস্কৃতিক কর্মসূচীরও নির্দেশও করেছেন।

কোনও দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি হচ্ছে সেই দেশের তৎকালীন সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতির ভাবাদর্শগত প্রতিফলন।'(১) শাসকশ্রেণী তার সংস্কৃতিকে নানাভাবে জনসাধারণের ওপরে চাপিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিল্প-সাহিত্য রচনা করে। আবার চেতনাপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে যখন সংগ্রামী প্রবণতা জেগে ওঠে তখন নতুন সংস্কৃতি দানা বেঁধে ওঠে। তার ফলে সুরু হয় দ্বন্দ্ব।

মাও সে তুঙ তাঁর 'নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে' বইতে দেখিয়েছেন—"চীনে একটি সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি আছে, আর তা হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বা তার আংশিক প্রতিফলন। এই সংস্কৃতিটি কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিই লালন করে না, উপরন্তু কিছু কিছু নির্লজ্জ চীনাদের দ্বারাও লালিত হয়ে থাকে। দাসসুলভ মতাদর্শের সব রকম সংস্কৃতিই এর আওতায় পড়ে।"

কিন্তু ঐ অবস্থা স্থায়ী হয়নি। মাও সে তুঙ লিখেছেন—"৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর থেকে অবস্থা ভিন্ন প্রকারের। চীনে দস্তুরমতো এক নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটলো। ৪ঠা মে-র আন্দোলন হয় ১৯১৯-এ এবং ১৯২১-এ প্রতিষ্ঠিত হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টী। * * * নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো এবং তার ফলে এই সাংস্কৃতিক শক্তি নতুন সাজসজ্জায় এবং নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমস্ত সম্ভাব্য মিত্রদের একত্র করে সমস্ত শক্তিকে যুদ্ধের কায়দায় নিয়োজিত করলো এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাহসিক আক্রমণ সুরু করলো। এই নতুন

শক্তি সমাজ-বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, আর্ট (এর মধ্যে থিয়েটার, সিনেমা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য এবং অঙ্কন প্রভৃতিও আছে) সমস্ত ক্ষেত্রেই বিপুলভাবে এগিয়ে গেল" (নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে)।

মাও সে তুঙ-এর এই সব উক্তি থেকেই এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে যে, শোষিত জনগণকে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে লড়াই নয়, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-তন্ত্র বা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সাংস্কৃতিক লড়াই চালাতে হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় থেকে সংস্কৃতির নামে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নানাভাবে মাদক দ্রব্যের পসরা সাজায়। কিন্তু একে শুধু ব্যবসায়িক প্রয়োজন বললে ভুল হবে, এর একটা রাজনৈতিক প্রয়োজনও আছে। সংস্কৃতির নামে ঐ সব মাদক দ্রব্য দিয়ে মোহ সৃষ্টি করে তারা শ্রেণীশাসন অটুট রাখে। দেশে বৃহৎ বুর্জোয়া আর সামন্ত শ্রেণীর শাসন যতদিন থাকবে ততদিন ঐগুলির ওপরে কোন আঘাত আসবে না। কিন্তু আঘাত হানতে হবে তাদের যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আনবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিপ্লবের পর তো বটেই, তার আগেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করার প্রয়োজন আছে। কারণ ঔপনিবেশিক এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিবেশে আটকে থেকে কখনও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানো যায় না। তাই এ অবস্থায় "কমিউনিস্ট ভাবধারাই হবে এই সংস্কৃতির দিক্‌নির্ণয়কারী চিন্তা এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ভাবধারা ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং কৃষক ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে সঠিকভাবে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"

জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে তাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাই বিপ্লবী সংস্কৃতি। "বিপ্লবী সংস্কৃতি ব্যাপক জনগণের হাতে একটা ক্ষুরধার বিপ্লবী হাতিয়ার। এটি বিপ্লবের আগে আদর্শগতভাবে বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করে এবং বিপ্লবের সময় সাধারণ বিপ্লবী ফ্রন্টের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বস্তুতঃ একান্ত প্রয়োজনীয় সংগ্রামী ফ্রন্ট হিসাবে কাজ করে।"

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, বা মানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম—এই উভয় সংগ্রামের ক্ষেত্রেই একদিকে চাই যেমন সামরিক বাহিনী, অন্যদিকে চাই সাংস্কৃতিক বাহিনী। সামরিক এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে চলবে না—এক সঙ্গে চলবে। কি করে তা সার্থক করে তোলা যায় ১৯৪২-এর ২ মে শিল্প সাহিত্য সম্পর্কিত ইয়েনান ফোরামে মাও সে তুঙ তা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। এখানে তার সার-সংকলন করছিঃ

সমস্যাগুলি কি ?

লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে সমস্যাগুলি কি ? ঐ সমস্যাগুলি হচ্ছে লেখক এবং শিল্পীদের শ্রেণীগত অবস্থান, তাঁদের মনোভাব, তাঁদের পাঠক বা দর্শক, তাঁদের কাজ এবং তাঁদের পড়াশুনার সমস্যা।

প্রথম সমস্যা শ্রেণীগত অবস্থানের সমস্যা। লেখক ও শিল্পীরা প্রলেটারিয়েত শ্রেণীর দিক থেকে বিষয়কে কতটা বিচার করেন তা ভাববার বিষয়।

তারপর মনোভাবের সমস্যা। যার যে শ্রেণীগত অবস্থান সেখান থেকেই কোনও বিশেষ বিষয়ের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ধরা যাক কারও প্রশংসা করা বা তার মুখোশ খুলে দেওয়ার ব্যাপার। এক্ষেত্রে কি করা হবে ? দুই করা যেতে পারে। তবে কোন্ মনোভাব অবলম্বন করা হবে প্রশ্ন সেটাই। এটা নির্ভর করবে কার সম্পর্কে আমরা বলছি তার ওপরে। শত্রু আছে, মিত্র আছে, এবং সর্বোপরি আছে বৃহত্তর জনসাধারণ। এই তিন শ্রেণী সম্পর্কে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে তিনরকম। যারা জনসাধারণের শত্রু তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে, তাদের নির্দয়তাকে তুলে ধরতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের পরাজয় যে অনিবার্য সেটা নির্দেশ করতে হবে। জনসাধারণ পরিশ্রম করে চলেছে, সংগ্রাম করে চলেছে। তাদের ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তাদের সংস্কার তাদের ওপরে বোঝা হয়ে চেপে থাকতে পারে। ধৈর্য ধরে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে, শেখাতে হবে। লেখক ও শিল্পীর সৃষ্টি যাতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে, তাদের প্রাচীন ধ্যানধারণা দূর করে বিপ্লবী আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এর পর যে জনসাধারণের জন্য শিল্প ও সাহিত্য, তাদের সমস্যা। জনসাধারণ বলতে বিভিন্ন গোষ্ঠী—কৃষক, মজুর, ছাত্র যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন গোষ্ঠী। কেউ বই পড়তে চায়, আবার অশিক্ষিত যারা তারা নাটক, গান, ছবি বেশী পছন্দ করে। সুতরাং সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির সময়—একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের বুঝতে হবে। মাও সে তুঙ জোর দিয়েই বলেছেন, "লেখক ও শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্ব জনসাধারণকে জানা এবং বোঝা।" কারণ যাঁরা জনসাধারণের কথা লিখবেন বা জনজীবনকে চিত্রিত করবেন তাঁরা যদি তাঁদের না জানেন তবে তাদের সম্পর্কে কিভাবে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করবেন ? জনসাধারণের ভাষা শক্তিশালী ভাষা। কিন্তু যাঁরা জনসাধারণ থেকে দূরে থাকেন তাঁরা জনসাধারণের ভাষা বুঝতে পারেন না। তার ফলে তাঁদের রচনায় নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার বক্তব্য থাকে না, নিজেদের

সংগৃহীত শব্দাবলী প্রয়োগের দ্বারা তাঁরা বক্তব্য বিষয়কে কঠিন করে তোলেন। তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সামন্তরালভাবে তাঁদের সাহিত্য চলতে থাকে। অনেকে "গণরীতি"র কথা বলেন। তার অর্থ কি? এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে লেখক ও শিল্পীদের চিন্তা এবং অনুভূতির সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতির চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটতে হবে—তবেই "গণরীতি" আসবে। এর জন্যে জনসাধারণের ভাষাকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

শেষ সমস্যাটি হচ্ছে পড়াশুনার সমস্যা। এই সমস্যা বলতে বোঝায় সমাজ এবং মাকর্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে লেখকের পড়াশুনা এই কারণেই থাকা দরকার যে, তা হলে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রাম দ্বারা আমাদের চিন্তা এবং বাস্তব অনুভূতি নির্ণীত হয়। অনেকে এই ব্যাপারটা অস্বীকার করে সুরু করতে চান 'প্রেম' থেকে। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রেমটাও শ্রেণীগত প্রেম। প্রেম, স্বাধীনতা, সত্য, মানব-প্রকৃতি—এ সব কিছু বিমূর্ত নয়। শ্রেণীগতভাবে এগুলির বিশেষ বিশেষ রূপ রয়েছে—একথা ভুললে চলবে না।

শিল্প-সাহিত্য বিচার পদ্ধতি

কোনও সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হলে কোনও সূত্র থেকে আরম্ভ না করে বাস্তব অবস্থা থেকে আরম্ভ করা দরকার। অথচ আমরা অনেক সময় প্রচলিত সূত্র অনুসারে শিল্প-সাহিত্য বিচার করতে বসি। কিন্তু আমাদের বিমূর্ত সূত্র ধরে আরম্ভ করলে চলবে না, আরম্ভ করতে হবে বাস্তব বিষয়গুলি থেকে। মূল কথা হলো, জনসাধারণের জন্য কাজ করা এবং এই কাজ কেমন করে করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া।

প্রথম প্রশ্ন হলো, শিল্প ও সাহিত্য কার জন্যে? এই প্রশ্নের উত্তর লেনিন অনেক আগেই দিয়েছেন। ১৯০৫-এ লেনিন জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন, "শিল্প ও সাহিত্য লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষের সেবা করবে।"(২) জমিদার শ্রেণীর জন্য যে শিল্প ও সাহিত্য সেটা সামন্ততান্ত্রিক শিল্প ও সাহিত্য। তেমনি আজকের যুগের বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য যে শিল্প ও সাহিত্য তা বুর্জোয়া সাহিত্য। জমিদার এবং পুঁজিপতিদের জন্য নয়—অগণিত সাধারণ মানুষের জন্য শিল্প ও সাহিত্য চাই—সেই সাহিত্যই 'লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষের সেবা করতে পারে।' বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে যা সৃষ্টি হয় তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। তবে আমাদের শিল্প ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হবে না, নিজেদের দেশের এবং বিদেশ থেকে অতীতের যে সুন্দর জিনিস আমরা পেয়েছি সেগুলি গ্রহণ

করাবো। তবে দেখে নিতে হবে যে, সেগুলি এখনও জনসাধারণের সেবায় সক্ষম কিনা। অতীতের শিল্প ও সাহিত্যের আঙ্গিকগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। তবে এই আঙ্গিককে নতুন করে গড়তে হবে এবং নতুন বিষয়বস্তু সংযোজিত হবে যাতে সেগুলি বৈপ্লবিক হয়, জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, জনসাধারণ বলতে কাদের বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে মাও-এর বক্তব্য ঃ জনসাধারণ বলতে—জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন মানুষকে বোঝায়। এঁদের মধ্যে আছেন মজুর, কৃষক, সংগ্রামী সৈনিক, শহরের পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী। তাই সাহিত্য ও শিল্প প্রথমত সেই শ্রমিক শ্রেণীর জন্য যারা আদর্শগত হাতিয়ারেও বিপ্লবের নেতৃত্ব দান করবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে সাহিত্য রচিত হতে হবে প্রোলেটারিয়েট-এর দিক থেকে, পাতি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর দিক থেকে নয়। পাতি বুর্জোয়াদের রচিত সাহিত্যে অনেক সময় তাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরই আশা আকাঙ্ক্ষার ছবি এতে থাকে। বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই, কর্মে ও চিন্তায় যাদের সঙ্গে মিত্রতা বা আত্মীয়তা নেই তাদের কথা লেখক কিভাবে লিখবেন? তাই দেখা যায় ঐ সব লেখকদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির পোষাক শ্রমজীবীদের কিন্তু তাদের মুখগুলি পাতি বুর্জোয়াদের।

কার জন্য শিল্প ও সাহিত্য—এই প্রশ্নটি মৌলিক, এটা নীতিগত প্রশ্ন। এই সমস্যার সমাধান না হলে অনেক সমস্যাই অমীমাংসিত থেকে যাবে।

সাহিত্য ও শিল্প কাদের সেবা করবে—এই প্রশ্নের পরই প্রশ্ন ওঠে—কিভাবে সেবা করা হবে? প্রশ্নটিকে অন্যভাবে সাজালে দাঁড়ায় ঃ আমরা সাহিত্য ও শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবো, না তা জনপ্রিয় করার চেষ্টা করবো? মান উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে ঠিকই, তবে এদিকে এক তরফাভাবে জোর দিলে চলবে না। যেহেতু সাহিত্য-শিল্প মূলগতভাবে শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য তাই সাহিত্য-শিল্প জনপ্রিয় করার অর্থ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা। শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি শ্রেণী যা চায় এবং যা সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রহণ করতে পারে, তাই তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। তাদের শিক্ষাদান করার আগে নিজেদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে জানতে হবে।

মান-উন্নয়ন সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে কোন্ জায়গা থেকে উন্নয়ন করতে হবে? ভিত্তিভূমি কোন্‌টা? সামন্ত শ্রেণী না বুর্জোয়া শ্রেণী—কাদের ভিত্তি ধরা হবে। কোনটাই নয়—ভিত্তিও হবে মজুর-কৃষক। এর অর্থ এই নয় যে মজুর-কৃষকদের জন্য রচিত শিল্প-সাহিত্যের মান উন্নত করে সামন্ততান্ত্রিক বা বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যের স্তরে তুলে দিতে হবে। মজুর-কৃষকের

অগ্রগতি যেদিকে ঘটছে—তাদের উন্নতি যেভাবে ঘটছে সেইভাবে শিল্প-সাহিত্যের মান উন্নত করতে হবে। এখানে পুনরায় শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে জানবার প্রশ্ন আসে।

শিল্প-সাহিত্যের উৎস

শেষ বিশ্লেষণে যে কথা আসে তা হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যের উৎস কি? ঠিক আদর্শবাদের মতই শিল্প ও সাহিত্য একটি বিশেষ সমাজের মানুষের চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি। বিপ্লবী শিল্প ও সাহিত্যও তাই বিপ্লবী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মস্তিষ্কে যে মানুষগুলি রয়েছে তার প্রতিচ্ছবি। শিল্প ও সাহিত্যের কাঁচামাল হচ্ছে জনগণের জীবনযাত্রা। তবে সেটা প্রাকৃতিক, সেটা অপরিশোধিত তবে মৌলিক, প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ। শিল্প ও সাহিত্যের এই উৎস অফুরন্ত।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, অতীতের সাহিত্য বা বিদেশী সাহিত্য কি আধুনিক সাহিত্যের উৎস নয়? প্রকৃত পক্ষে অতীতের শিল্প ও সাহিত্য-কর্ম উৎস নয়—সেটা একটা ধারা। আমাদের পূর্ব-পুরুষ এবং বিদেশীরা তাঁদের সময়ে তাঁদের দেশের মানুষের জীবনে যে কাঁচামাল পেয়েছিলেন তা দিয়ে ঐ সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আমাদের শৈল্পিক সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে ভাল জিনিস অবশ্যই গ্রহণ করবো। সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে আমাদের পক্ষে উপযোগী যা তা গ্রহণ করবো এবং আমাদের সমসাময়িক জীবন নিয়ে যখন সাহিত্য ও শিল্পরচনা করবো তখন ঐগুলিকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবো, ঐগুলি সামন্ততান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক যে শ্রেণীর সৃষ্টিই হোক না কেন।

মানুষের সামাজিক জীবনই শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র উৎস এবং এই সমাজ শিল্প ও সাহিত্যের তুলনায় জীবন্ত ও সমৃদ্ধ। কিন্তু তবুও মানুষ জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট না থেকে সাহিত্য ও শিল্প চায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মাও সে তুঙ বলেছেন যে, বাস্তব যীবন ও সাহিত্য দুই-ই সুন্দর, তবু শিল্প ও সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন উচ্চতর, অনেক বেশী সংহত, অনেক বেশী 'টিপিক্যাল' এবং এইজন্য দৈনন্দিন জীবনের চেয়ে বেশী সর্বজনীন। বিপ্লবী শিল্প ও সাহিত্যকে বাস্তব জীবন থেকে বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে এবং জনসাধারণ যাতে ইতিহাসকে এগিয়ে নিতে যেতে পারে তার জন্য সাহায্য করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ একদিকে শীতে কষ্ট পায়, ক্ষিদেয় কষ্ট পায় এবং অত্যাচারিত হয়, অন্যদিকে একদল মানুষের দ্বারা অন্য মানুষ শোষিত হয়, অত্যাচারিত

হয়। এই ব্যাপার সর্বত্র রয়েছে, এবং জনসাধারণ এ ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক মনে করে। সাহিত্যিক ও শিল্পীকে এই স্বাভাবিক বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, ওইগুলির অভ্যন্তরে যে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বগুলি রয়েছে সেগুলিকে প্রতিকী করতে হবে এবং তারপর এমন জিনিস সৃষ্টি করতে হবে যাতে জনসাধারণের চেতনা জাগে, তারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করতে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা লাভ করে।

আজকের দিনে পৃথিবীতে সমস্ত শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকারে এবং সেগুলি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দিক থেকে চালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'শিল্পের জন্য শিল্প' বলে কিছু নেই, এমন কোনও শিল্প নেই যা শ্রেণীর উর্ধে উঠতে পারে, যা শ্রেণী বিচ্যুত বা যা রাজনীতি নিরপেক্ষ। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য ও শিল্প সমগ্র প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী কর্মধারার অংশ। লেনিনের ভাষায় বলতে গেলে 'বিপ্লবী যন্ত্রের চাকা এবং তার খাঁজ।'(৩)

সাহিত্য ও শিল্প রাজনীতি-সাপেক্ষ বা তার অধীন; অন্যদিক থেকে আবার রাজনীতির ওপর এদের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমেই আমরা বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে পারি এবং সাহিত্য ও শিল্প ছাড়া বৈপ্লবিক সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

বিপ্লবী রাজনীতিক, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বিপ্লবী-রাজনীতির কলাকৌশল জানেন—তাঁরা লক্ষ লক্ষ রাজনীতিকের অর্থাৎ জনসাধারণের নেতা। তাঁদের কাজ হচ্ছে গণ-রাজনীতিকদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা, সেগুলি পরিশুদ্ধ করা এবং আবার তা জনসাধারণকে পরিবেশন করা; জনসাধারণই তা ব্যবহার করবে। সোজাকথায় জনসাধারণের কাছ থেকে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যা জানবেন, সংগ্রহ করবেন তাই সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। এঁদের লোকলোচনের অন্তরালে বদ্ধ দরজার আড়ালে জ্ঞানের একচেটিয়া কারবারী সেজে বসে থাকা উচিত নয়। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের থাকতে হবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—হতে হবে তাদের 'জীবনের শরিক'।

শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনা

সাহিত্য ও শিল্পের জগতে সমালোচনা সংগ্রামেরই একটি পদ্ধতি। তবে সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনা একটা জটিল প্রশ্ন।

সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনার ক্ষেত্রে দুটো নিরিখ রয়েছে। রাজ-নৈতিক নিরিখ বিচার করলে বলতে হয় জনসাধারণকে যা ঐক্যবদ্ধ করে,

অত্যাচার অনাচারকে যা প্রতিরোধ করতে শেখায় এবং অগ্রগতির পথ নির্দেশ করে তা-ই ভাল। অন্যদিকে যা ঐক্যের বিরোধী, যা জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, যা অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এবং মানুষকে পেছনে টানে তা-ই খারাপ। এই ভাল ও মন্দকে আলাদা করে দেখবো কিভাবে? উদ্দেশ্য (আত্মগত ইচ্ছা) অথবা ফলাফল বা পরিণতি (সামাজিক ব্যবহার) বিচার করে? ভাববাদীরা উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেন এবং পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখেন না। আবার যাঁরা যান্ত্রিক বস্তুবাদী তাঁরা পরিণতির ওপরে জোর দেন, উদ্দেশ্যের দিকটা এড়িয়ে যান। কিন্তু যাঁরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী তাঁরা উদ্দেশ্য ও পরিণতি দুই-এর ঐক্যের ওপরে জোর দেন। জনসাধারণকে সেবার উদ্দেশ্য-এর সঙ্গে তাদের সমর্থন লাভের পরিণতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে সেবা করা নয়, বৃহত্তর জনসাধারণকে সেবা করা এবং তাদের উপকার হওয়াটাই বড় কথা। আমাদের বিচার করতে হবে সমাজজীবনে বা জনজীবনে তাঁদের সৃষ্টির ফলাফল কিরূপ।

শৈল্পিক নিরিখে বিচার করলে বলা যায় যে, যে শিল্প ও সাহিত্যের উচ্চ শৈল্পিক গুণ আছে সেগুলি ভাল বা তুলনামূলকভাবে ভাল। অন্য দিকে যেগুলির নিম্নমানের শৈল্পিক গুণ আছে সেগুলি মন্দ বা তুলনামূলকভাবে মন্দ। এ ক্ষেত্রে সামাজিক পরিণতি বিচার করতে হবে—অর্থাৎ সমাজের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা দিয়ে বিচার করতে হবে। প্রত্যেক লেখক বা শিল্পীই তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন এবং তাকে সুন্দর মনে করেন। তাই সব রকম রচনার স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা হওয়া দরকার—নন্দনতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের বিচার হওয়া দরকার।

এখন প্রশ্ন এই যে, রাজনৈতিক নিরিখ আর শৈল্পিক নিরিখের মধ্যে পার্থক্য কি? রাজনীতি এবং শিল্পকে যেমন এক করে দেখা যায় না, তেমনি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে শৈল্পিক সৃষ্টি এবং সমালোচনাকে এক করে দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীরই তার নিজস্ব রাজনৈতিক এবং শৈল্পিক নিরিখ আছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সব শ্রেণীই রাজনৈতিক নিরিখের পর শৈল্পিক নিরিখের স্থান দেয়। তাই দেখা যায় যে, বুর্জোয়ারা সব সময়ই প্রলেটারিয়ান সাহিত্য ও শিল্পকে বাতিল করে দেয়, তা সেই শিল্প-সাহিত্যের যত শৈল্পিক মূল্যই থাক না কেন।

বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যকে এক কথায় নস্যাৎ না করে দিয়ে তার বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার অর্থাৎ পরীক্ষা করে দেখা দরকার তার মধ্যে জন-সাধারণের প্রতি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, তার ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল তাৎপর্য আছে কিনা। এমন কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রচনা আছে যার কোনও শৈল্পিক গুণ রয়েছে। যার উচ্চ শৈল্পিক গুণ আছে

অথচ বিষয়বস্তু প্রতিক্রিয়াশীল তা সবচেয়ে ক্ষতিকর। সেগুলি পরিত্যাগ করতেই হবে।

সমস্ত শোষক শ্রেণীর অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্যে ও শিল্পে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং তা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে শৈল্পিক আঙ্গিকের দ্বন্দ্ব। তাই, আমরা চাই রাজনীতি ও শিল্পের ঐক্য, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সামঞ্জস্য, বিপ্লবী রাজনৈতিক বিষয়-বস্তু এবং উচ্চতর শৈল্পিক আঙ্গিকের ঐক্য। শিল্প ও সাহিত্যের যদি শৈল্পিক গুণ না থাকে তবে তা যতই রাজনৈতিক দিক থেকে প্রগতিশীল হোক তার শক্তি থাকে না। তাই, মাও সে তুঙ বলেছেন, "ভুল রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির যেমন আমরা বিরোধিতা করি তেমনি শৈল্পিক গুণ নেই অথচ ঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে এমন 'পোস্টার ও শ্লোগান ধর্মী' সাহিত্য-শিল্পেরও আমরা বিরোধিতা করি।"

মানুষের জীবনের উজ্জ্বল দিকও আছে আবার অন্ধকার দিকও আছে। "সাহিত্য এবং শিল্পকর্ম উজ্জ্বল এবং অন্ধকার এই দু দিকের ওপরেই জোর দিয়ে থাকে।" এই মন্তব্য মাও সে তুঙ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কারণ, সাহিত্য ও শিল্প সব সময় দু দিক সমানভাবে তুলে ধরেনি। এমন বহু পাতি বুর্জোয়া লেখক আছেন যাঁরা কোনও দিন জীবনের উজ্জ্বল দিক তুলে ধরেন নি। অতীতেও দেখা গেছে, সাম্প্রতিক কালেও আমরা দেখছি একদল সাহিত্যিক জীবনের শুধু অন্ধকার বা কুৎসিত দিকটাই তুলে ধরছেন। এঁরা এঁদের সাহিত্যকে বলেন "লিটারেচার অফ এক্সপোজার" অর্থাৎ তাঁরা বাস্তবের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন বলে গর্ব করেন। এঁরা দুঃখবাদ এবং অসহায় অবস্থা এবং ক্লান্তিকর জীবনের কথাই বলে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বাস্তবকে প্রকাশ করার নামে তাঁরা নোংরামি পরিবেশন করে থাকেন। বিপ্লবী সাহিত্যিক ও শিল্পী যে অন্ধকারের শক্তি জনসাধারণের ক্ষতি করছে তাকে আলোকে নিশ্চয়ই আনবেন, তেমনি জনসাধারণের সংগ্রামকে উজ্জ্বল করে তুলবেন। আক্রমণ-কারী শোষক-অত্যাচারীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে, তাদের কু-মতলব-গুলিকে তুলে ধরে জনসাধারণকে সে সম্পর্কে সাবধান করতে হবে।

মার্কসবাদী সাহিত্যিকরা কিভাবে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করবেন এ সম্পর্কে মাও সে তুঙ বেশ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। সৃজনমূলক সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর মতামতের মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। সাহিত্য ও শিল্পে মার্কসবাদ অনুসরণ করার অর্থ রচনার মধ্যে দার্শনিক বক্তৃতা দেওয়া নয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে বিশ্বকে, সমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মার্কসবাদ সাহিত্য ও শিল্পে সৃষ্ট বাস্তবতাকে গ্রহণ করে—তার পরিবর্তে কোনও নতুন জিনিস

বসায় না, ঠিক যেমন মার্কসবাদ পদার্থবিদ্যার পারমাণবিক বা ইলেকট্রনিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে, তার জায়গায় নতুন কোনও সিদ্ধান্ত আনে না ব আনতে পারে না। মার্কসবাদ কি সৃজনধর্মীতাকে নষ্ট করে? মাও সে তুঙ জোরের সঙ্গে বলেছেন—"হ্যাঁ নষ্ট করে। সামন্ততান্ত্রিক, পাতি বুর্জোয়া উদারনৈতিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শিল্পের জন্য শিল্প, নিহিলিজম্, অবক্ষয়ী দুঃখ বাদীতা—আরও যে সব উপাদান ও প্রবণতা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর ত মার্কসবাদীরা সহ্য করতে পারে না।"

এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, মার্কসবাদ-বিরোধী যে কোনও ভাবধারাকেই মার্কসবাদীরা ধ্বংস করতে চায়। এই ধারণা দূর করার পক্ষে মাও সে তুঙ-এর শতপুষ্প বিকাশের নীতিই যথেষ্ট।

'শতপুষ্প বিকশিত হোক...'

এক সময়ে "শতপুষ্প বিকশিত হোক, শত চিন্তার প্রতিযোগিত চলুক"(৪) এবং "দীর্ঘমেয়াদী সহাবস্থান ও পারস্পরিক পর্যবেক্ষণ"—এই ধ্বনি কেন দেওয়া হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও সে তুং বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও সমাজে নান ধরণের দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন ছিল। শতপুষ্প বিকশিত হওয়া এবং শত চিন্তাধার প্রকাশের মধ্য দিয়ে চীনের শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে—সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে—এটাই আশা করা গিয়েছিল। শিল্পে বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিক ও রীতি মুক্তভাবে বিকশিত হবে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটবে—এটাই আশা করা গিয়েছিল। মাও সে তুঙ-এর ভাষায়, "যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা শিল্পের কোনও বিশেষ রীতি বা বিশেষ কোনও চিন্তাধারাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে অন্যটিকে নিষিদ্ধ করা হয় তবে তা শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে বলে—আমরা মনে করি। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক এবং বেঠিক নির্ধারিত হওয়া উচিত শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক মহলে স্বাধীন আলোচনার দ্বারা এবং ঐ সব ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজের দ্বারা...কোপার্নিকাসের সিদ্ধান্ত বা ডারউইনের ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্ত এক সময় ভুল বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঐ সব সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে তবে দাঁড়িয়েছে। তাই শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক এবং বেঠিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে স্বাধীনভাবে আলোচনা করার সুযোগ দিতে হবে।"

মাও এ কথা বলেছেন ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তিনি বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা চালাতে দিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনায় ভয় করার কিছু নেই। কারণ এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

যারা বিপ্লবী সংস্কৃতির কাজে নিযুক্ত তারা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কমান্ডারের মতো। "বিপ্লবী থিওরি ছাড়া কোনও বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়।"(৫) সাংস্কৃতিক এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনটা হবে সচেতন জনসাধারণেরই আন্দোলন। এই জন্যই মাও সে তুঙ বলেছেন: জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও, তাদের জানো, তাদের বুঝতে চেষ্টা করো এবং তাদের কাছ থেকে যা শিখবে, তাই শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে তাদের এমনভাবে পরিবেশন করো, যাতে তারা নিজেরা এবং চারপাশের সমাজটাকেও বদলে দেবার তাগিদ ও তাগৎ পায়।

পাদটীকা

১। "A given culture is the ideological reflection of the politics and economics of a given society"—'The culture of New Democracy' (1940) by Mao Tse-Tung.

২। V. I. Lenin, in his 'Party Organisation and Party Literature' has analysed the characteristics of proletarian literature —"It will be a free literature, because it will serve, not some satiated heroine, not the bored 'upper ten thousand' suffering from fatty degeneration, but millions and tens of millions of working people—the flower of the country, its strength and its future."

৩। "Literature must become part of the common cause of the proletariat, 'a cog and screw' of one single great Social Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class"—'Party organisation and Party Literature.'

৪। Mao Tse-Tung in his article 'On the correct Handling of Contradiction Among the People' has used this slogan "Let A Hundred Flowers Blossom, Let A Hundred Schools of Thought contend."

৫। V. I. Lenin, 'What Is to Be Done?'

লু স্যুনের সাহিত্যচিন্তা

শুভংকর চক্রবর্তী

(ক) যত বিপত্তিই আসুক না কেন চীনের জনগণের জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবো।(১)

(খ) সব প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শিশুদের জন্য আমি বলদের মতো খেটে যাব।(২)

(গ) সর্বহারার সাহিত্যকে মুক্তির জন্য সর্বহারার সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে হবে যা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির সাথে সাথে ক্ষিপ্রগতিতে বেড়ে উঠবে।(৩)

এই হল লু স্যুনের সাহিত্যচিন্তা। ক এবং খ-এর সূত্রে এই উপপত্তিতে পেঁছানো যাবেই যে লু স্যুনের সাহিত্য চিন্তার বৈশিষ্ট্য তাঁর **আত্মবলিদানের প্রস্তুতি**। গ-সূত্র থেকে লু সুনের সাহিত্যচিন্তার যে বিশেষত্ব উদ্ভাসিত, তা হল তাঁর **সংগ্রামশীলতা**।

চীনের জনগণই লু স্যুনের কাছে প্রসারিত মাটি যার গভীরে শিকড় ছড়িয়েই তাঁর প্রতিভার সুন্দর গাছটি পুষ্ট হয়েছে, মনোরম ফুল ফুটেছে।(৪) এই মাটিকে তৈরি করতে, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ও উন্নীত করে তুলতে লু স্যুন অটলভাবে সংগ্রাম করেছেন। সব দেশের মাটির নিজের একটা বাসনা থাকে। সফল যিনি দেশনায়ক, সফল যিনি সাহিত্যিক তাঁরা মাটিতে নিবিষ্ট মূলে থেকে দেহমন দিয়ে এই বাসনাকে জড়িয়ে নেন, মন ও মনন দিয়ে গভীর চিন্তা করেন এবং কঠিন সংকল্প নিয়ে তাকে উন্নীত করেন ও ফলে রূপ দেন। চীনের জনগণের বাসনা ছিল সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী দ্বিমুখী শোষণের নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তির বাসনা। লু স্যুন তাঁর সমস্ত সাহিত্য-কর্মে এই বাসনাকে উন্নীত করবার ও ফলে রূপ দেবার নিরন্তর ও নিরলস সংগ্রাম করেছেন। এবং তাকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সাহিত্য-সংগ্রামে পরিণত করেছেন। চীনা সর্বহারার বাসনার বাণীমূর্তি লু স্যুনের সাহিত্যচিন্তা।

মাও সে তুঙ তখন বিশাল চীন ভূখণ্ডের মাটিকে জড়িয়ে আরেক অস্ত্রে মাটির বাসনাকে উন্নীত করার সংগ্রাম করছিলেন। যখন দেখলেন অনুরূপ

সংগ্রামে রত এক শিল্পী, সাথীলাভে তিনি উৎফুল্ল হলেন। প্রত্যুদ্‌গমন করে বললেন, বিপ্লবের অগ্রবর্তী বাহিনীর অন্যতম লু সুন। লু সুনের সাহিত্য-চিন্তা সংগ্রামশীল চিন্তা, এ-চিন্তা আত্মবলিদানের প্রস্তুতি। বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, লু সুনের এই সাহিত্যচিন্তা বিপ্লবীদের আদর্শ হওয়া উচিত। ইয়েনানে লু সুন শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ও লু সুন গ্রন্থাগার স্থাপন করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে লু সুনের মহত্ত্বের কথা বোঝাতে ও জানাতে বললেন।

লু সুনের এই সাহিত্যচিন্তা গড়ে উঠেছে চীনের বাস্তব অবস্থা ও চীনে-জনগণের বাসনার সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভবের নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় সংস্পর্শের ফলে। তখন চীনের সমাজ ছিল অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের পূতি-গন্ধময় এক সমাজ। দেউলে চিঙ সাম্রাজ্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সার্ব-ভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তির কাছে। এই শক্তির আক্রমণে ও লুণ্ঠনে চীন পদদলিত, জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র—এই দ্বিমুখী শোষণে ও পীড়নে চীনের জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। লু সুন এই সমাজেরই বংশধর। এই সমাজের কৃষিজীবী জীবনের নিকৃষ্ট অবস্থার অভিজ্ঞতা ছিল লু সুনের। এই সমাজের বিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। চীনের ধ্রুপদী-সাহিত্য, লৌকিক শিল্পসাহিত্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সমসাময়িক সাহিত্যধারা, আর সাম্রাজ্যবাদীদের সাংস্কৃতিক আক্রমণ-রীতির সঙ্গে নিবিড় পরিচিত ছিলেন লু সুন। আবার এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য এই সমাজেরই আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের মধ্যে তাঁর কৈশোর, যৌবন ও পরিণত বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, তীব্র অনুভব ক্ষমতা নিয়ে এ-সব কিছুই দেখেছেন লু সুন। সব কিছু সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। এই সমাজ তাঁকে পীড়িত করে তোলে। দেশে থাকতে জাপানে থাকতে তাঁর চেতনার মধ্যে কাজ করতে থাকে,—কী করে এই পদপিষ্ট, অন্ধকার ও গলিত সমাজকে মুক্ত করা যায়। দেশের জন্য এই গভীর যন্ত্রণাবোধের মধ্যে ভরসার স্থল ছিল সমসাময়িক আন্দোলন ও অভ্যুত্থানগুলি। ১৯০০ সালে, ই-হো-তুয়ান আন্দোলন বা বক্সার বিদ্রোহের সময় লু সুনের বয়স ১৯ বছর। এই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি ও অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সম্মিলিত আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে চীনের কৃষক, হস্তশিল্পী, কারিগর ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ বিপুল সংখ্যায় অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করে। এই সম্মিলিত বাহিনী জনগণের ওপর যেভাবে নিষ্ঠুর দমননীতি চালায় এবং সাহসী চীনাজনগণ যেভাবে প্রাণ দেয়, সে ঘটনা লু সুনকে ক্ষুব্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ১৯০২-এ

জাপানে এসে তিনি দেখেন, চীনা ছাত্রদের মধ্যে মাঞ্চুবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছে। ভরসার স্থল প্রসারিত হল। ঘৃণা ও ক্রোধের অনুভব গভীর হল। ১৯০৮-এ জাপানে থাকাকালে তিনি মাঞ্চুবিরোধী বিপ্লবীদলের সদস্য হন। তিনি তাগিদ বোধ করলেন, সাহসী চীনাজনগণের সাহায্য করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব হবে। কিন্তু কোন্ পথে তা তিনি করতে পারবেন? অনুভব করলেন চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করলে দেশের মুক্তিবাসনাকে সাহায্য করতে পারবেন। যুদ্ধে সৈনিকদের সেবা করে বিপ্লবকেই পুষ্ট করতে পারবেন। কিন্তু এ-ভাবনা স্থায়ী হল না। তাঁর সচেতন ও উন্মুখ মন এবং চীনের সমাজের বাস্তব অবস্থার ঘটনাবহতা—এই যুগ্ম-প্রক্রিয়ায় তাঁর অনুভব পরিবর্তিত হল। এই পরিবর্তিত পথ হল সাহিত্যের পথ। চীনের জনগণের মানসিক চিন্তার স্তরের পরিবর্তন ঘটাতে লু সুন কলম ধরলেন।(৫)

অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ অনুভব যতই অপরিসীম হোক না কেন, তাতে প্রথম শ্রেণীর সংগ্রামী লেখক তৈরী হয় না। এরূপ লেখক হবার জন্য প্রয়োজন অধ্যয়নের, নির্বাচিত অধ্যয়ন, সুপরিকল্পিত অধ্যয়ন। দেশের এবং বিদেশের মানসিক চিন্তার সম্পদ, চিন্তার গতিধারা বিধৃত থাকে সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে। বিদ্রোহী লেখা শিল্পীর বিদ্রোহী মনে উত্তাপ আনে, তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়ে দেয়। লু সুন চীনের অতীত সৃষ্টিকর্ম অধ্যয়ন করে সাহসিক লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। ১৮৪০-এর অহিফেন যুদ্ধের পর থেকে চীনে যে সব কবি-নাট্যকার-প্রবন্ধকার-ঔপন্যাসিক সমসাময়িক জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে বাস্তববাদী ও সাহসিক রচনা লিখেছিলেন সে সবের সঙ্গে ঐতিহ্যের সুকৃতির সূত্রে লু সুন যুক্ত হলেন। সরকারের নির্বুদ্ধিতা ও ভীরুতাকে দেখিয়ে দিয়ে ও জনগণের সাহসিকতাকে প্রকাশ করে অহিফেন যুদ্ধ সম্পর্কিত সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন কবি চ্যাংউয়ি-পিঙ, উয়ি ইউয়ান, চু চি। ক্যান্টনের নগরপাল লিন্-ৎসে-সু তাঁর গদ্যে অহিফেন আমদানীর বিরোধিতা করেছিলেন। ঔপন্যাসিক লি পাও-চি-আ কাপুরুষ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের এবং বিদেশী উদ্ভূত মিশনারীদের মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। সমকালীন ভ্রষ্ট রাজনীতি ও অযোগ্য আমলাতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছিলেন ঔপন্যাসিক ৎসেঙ পু।(৬) এ'দের রচনা-অধ্যয়ন লু সুনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বিদেশের সাহিত্যজগতে লু সুন উপদেশমূলক, বিদ্রোহী লেখা খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকেন। নির্যাতিত জনগণের লেখকদের লেখার সঙ্গে নিজে পরিচিত হন এবং অনুবাদের মধ্যদিয়ে দেশকে পরিচিত করাতে উদ্যোগী হন। ডারউইন, শেলী, হাইনে, পুশকিন, গোগল, গোর্কী ভলতেয়ার, সিয়েন কিউইজ, সোর্মেকি নাতগুম্, প্রমুখের লেখা পড়ে নিজেকে তৈরি করেন। চীনের অস্বাভাবিক সমাজের অপরিসীম অভিজ্ঞতার সঙ্গে

এই অধ্যয়ন তাঁর মানসিক চিন্তার স্তরকে প্রস্তুত করে দেয়। ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব এবং মার্কসীয় তত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন তাঁর বিচারভূমিকে দৃঢ় করে তোলে। একটা স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টি গড়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী লু সুনের সাহিত্যের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই সম্পদ নিয়ে লু সুন স্থায়ীভাবে সাহিত্যের অস্ত্র তুলে নেবার অনুভবে নোঙর করলেন। শল্যচিকিৎসকের ছুরির মতো তিনি কলম ধরলেন। এই স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটি দিয়ে তাকে চীনের সমাজের গভীরে প্রবেশ করিয়ে সমাজ-ব্যবচ্ছেদ করলেন। এই সমাজ বিশ্লেষণের ভঙ্গীটি ছিল যুগপৎ অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করার ভঙ্গী।(৭) এক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজটার অসুখকে দৃষ্টিগোচরে আনা ও তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে করে তা নিরাময় করা যায়। পচাগলা চীনা সমাজের এই নিরাময়ের বিশ্বাসে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আশাবাদী। এবং এই নিরাময়ের পথ কী, সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুসংবদ্ধ ও সুদূর-প্রসারী। কী সে পথ? 'না-হান্'—যুদ্ধের ডাক। যুদ্ধ করে এই সমাজ-টাকে হটিয়ে দিয়ে চীনের জনগণের পক্ষে কল্যাণকর এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ বাস্তবায়িত করা যাবেই—এই প্রাজ্ঞ ও বিপ্লবী আশাবাদ লু সুনের সমগ্র সাহিত্যকর্মে। শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্যের অস্ত্রে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি এই যুদ্ধই করেছেন।

এই সংগ্রামশীলতার জন্যই লু সুন সমস্তরকম নালিশী সাহিত্য চিন্তার বিরোধী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য ভাবনার অপর নাম সংগ্রামের ক্রুদ্ধ গর্জন। তিনি লড়তে লড়তে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্য সৃষ্টি করতে করতে লড়েছেন। সমাজবিপ্লবী মাও সে তুঙ এই সাহিত্যবিপ্লবীর বড়ো সুন্দর এক ছবি দিয়েছেন. "লু সুন অন্ধকার, অশুভ ও দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে অটল মহীরুহ—ঢেউ খেলানো ঘাসের পাতা নয়। একবার যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যে দীক্ষিত, তাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবার জন্য তিনি দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন, মাঝপথে কখনই রণভঙ্গ বা বোঝাপড়ার মধ্যে আসেন নি।" এই দার্ঢ্যের জন্যই নালিশী সাহিত্য তাঁর কাছে ইঁদুরের চিঁচিঁ রব। বেড়াল তাকে উদরস্থ করতে তোয়াক্কা করে না। নিছক নালিশ ক্ষমতাহীন। নালিশী সাহিত্যকে শাসকশ্রেণী ভয় তো করেই না, বরং তা অত্যাচারীকে নিরাপদ বোধ করায়। "যে সব জাতির অন্তরশক্তি আছে, যারা বিপ্লব করার সাহস রাখে, তারা জানে যে নালিশ করা অর্থহীন এবং তারা সত্যের মুখোমুখি জাগ্রত হয়। তাদের ক্ষোভ ক্রুদ্ধ গর্জনে রূপান্তরিত হয়।...যখন এরকম সাহিত্য উপস্থিত হয় তা বিপ্লবের অগ্রদূতের কাজ করে।...এই ধরণের সাহিত্যই অক্টোবর বিপ্লবের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিল।"(৮) লু সুনের

সাহিত্যকর্মে এই রুদ্ধ গর্জন মন্দ্রিত এবং তা চীন বিপ্লবের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছে।

১৯১৮-তে 'নিউ-ইউথ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'জনৈক উন্মাদের রোজনামচা' উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনা সমাজের একটা 'মানুষখেকো' বীভৎসরূপ গল্পটিতে চিত্রিত। এই অস্বাভাবিক সমাজে একটি তরুণের স্বাধীন চিন্তার জাগরণের বাসনা ও প্রতিবাদের সাহস তোলপাড় তুলেছে। এই জাগরণকে উন্মাদের আচরণ আখ্যা দিয়ে দাবিয়ে দিতে কুশলী চক্রান্ত শুরু হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোজনামচার উন্মাদ বলে, "আমি লড়াই শুরু করি···সারা গা ঘেমে ওঠে। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, এই মুহূর্তে তোমাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত, তোমাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন চাই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানুষ খেকোদের কোন স্থান নেই।

সম্ভবত এখনো অনেক শিশু রয়েছে যারা মানুষ খায় নি!

সেই শিশুদের রক্ষা করো...।" অথবা,

'এ স্যাটায়ার অন মাইসেল্‌ফ্‌' কবিতাটির শেষ দুটি ছত্র—

Who cares if it's winter or summer?
Who cares if it's autumn or spring?

কিম্বা লেখকের উদ্দেশে 'ইউ এ্যান আর্টিস্ট কবিতাটি। ১৯৩৩-এ কুয়োমিঙটাঙ সরকার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ওপর এবং প্রগতিশীল লেখকদের ওপর তীব্র দমনপীড়ন শুরু করল।

A wind developed in Nanking
A thousand forests darkened.
A fog suffocates the sky;
A hundred flowers perish.
I request from our artist
A new composition.
Some mountains in spring
painted red.

লু সুনের রচনার বড়ো অংশ তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতা। বক্তৃতা ও প্রবন্ধসমূহে লু সুনের সাহিত্যচিন্তা "নির্মল তরবারির ন্যায় সকল ঘৃণ্যের শিরচ্ছেদ করেছে।" সংগ্রামী সাহিত্যচিন্তার বৈশিষ্ট্য এই খরশান নির্মলতা। তা ঘৃণ্যের শিরচ্ছেদ করে জনগণের পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতের জন্য। লু সুনের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে বিক্ষোভ রুদ্ধ গর্জনে রূপান্তরিত হয়ে সমাজজীবনে অমোঘ বসন্তের ঘোষণা করেছে।

লু সুনের সাহিত্যচিন্তার পরিণতি সাহিত্য আন্দোলন সংগঠনে মৃত্যু-

দিন পর্যন্ত তিনি চীনের প্রতিটি সামাজিক সংঘর্ষের সংস্পর্শে এসেছেন, সংঘর্ষের মধ্যে চলেছেন। এবং সাহিত্যকে সংঘর্ষসংকুল আন্দোলনে রূপায়িত করেছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের মধ্যে তিনি ছিলেন না। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন থাকেননি। তাঁর চিন্তা, কাজ ও লেখা মার্কসবাদী দর্শনে ছিল দীক্ষিত। এই মার্কসীয় চিন্তা ও অবিচ্ছিন্ন সমাজ-সংস্রবের জন্যই তিনি সাহিত্যকর্মকে সাহিত্য আন্দোলনের সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'নিউ-ইউথ' পত্রিকা যখন অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা ও মার্কস-লেনিনের দর্শন ও তত্ত্বকে সাধারণের কাছে পেঁছে দেবার কাজ শুরু করল, লু সুন তার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৯১৯-এর ৪ঠা মে চীন ভূখণ্ড এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে জেগে ওঠে। চীনকে নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী দেশগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সোচ্চার হয়। ছাত্রদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এগিয়ে আসে শ্রমিকশ্রেণী। আন্দোলন দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং তা শ্রমিকশ্রেণী ও শহরের পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের দেশভক্তিমূলক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব ঘটে উল্লেখ-যোগ্যভাবে। ইতিমধ্যে দেশে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ৪ঠা মে-র আন্দোলন তাকে জোরদার বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে বিকশিত করে তোলে। এই আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রচার। লু সুন এই আন্দোলনের শরিক হন। ১৯২৩-এ 'না-হান', যুদ্ধের ডাক গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি এই বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্ণধার হন। এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিণতি ১৯৩০-এ 'চায়না লীগ অব লেফ্‌ট উইং রাইটার্স'-এর প্রতিষ্ঠা। লু সুন ২রা মার্চ লীগের সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সতর্ক করে দেন, বামপন্থী লেখকরা প্রকৃত সামাজিক সংঘর্ষ-গুলোর সংস্পর্শ থেকে কখনও যেন বিচ্ছিন্ন না থাকেন। সে-বিচ্ছিন্নতা তাঁদের বাম ও দক্ষিণ বিচ্যুতি এনে দেবে। পরিণত করবে বৈঠকখানার সমাজ-তন্ত্রীতে। বামপন্থী লেখকদের কর্মধারা হবে সাহিত্য আন্দোলনকে জোরদার করা। শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে তা ক্ষিপ্রগতিতে বেড়ে উঠবে। এই আন্দোলনে নির্দিষ্ট সাধারণ লক্ষ্য হবে মুক্তির জন্য সর্বহারার সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠা। সাংস্কৃতিক যুদ্ধক্ষেত্রকে বিস্তৃত করবার জন্য তিনি সাংস্কৃতিক এই আন্দোলনকে খরতর করতে উদ্যোগী হন। জোর দেন একদল নতুন সাহিত্যযোদ্ধা গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে। এবং নিজে তিনি একাজে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন।(৯)

এই সাহিত্যিক আন্দোলন যত শক্তিশালী হতে থাকে, শঙ্কিত শাসকশ্রেণী

বামপন্থী লেখকদের ওপর দমনপীড়ন শুরু করে। বই নিষিদ্ধ করে, বইয়ের দোকান বন্ধ করে দেয়, নিপীড়নমূলক 'প্রকাশনা আইন' জারী করে, সাহিত্যিকদের 'কালো তালিকা' প্রকাশ করতে থাকে, ঘৃণ্যতম কৌশল অবলম্বন করে বামপন্থী লেখকদের গ্রেপ্তার, জেলবন্দী ও গোপনে হত্যা শুরু করে। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আক্রমণ এবং তাদের বিপ্লবী সাহিত্যিক সাথীদের ওপর আক্রমণ একই ক্ষুরের দুধারে তীব্র হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণিত হল প্রথমত শাসকশ্রেণী সাহিত্যিক যোদ্ধাদের ভয় পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী সাহিত্যিকদের সংগ্রাম মূলত এক, পরিণতিও এক।(১০)

সাংস্কৃতিক যুদ্ধক্ষেত্রে সব্যসাচীর মতো দু হাতে লু সুন অস্ত্র চালিয়েছেন। এক হাতে সৃষ্টি করেছেন, পত্রিকা পরিচালনা করেছেন, তরুণ সাহিত্যযোদ্ধৃগণকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, ব্যাপক অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী চিন্তাধারাকে চীনের জনগণের কাছে উপস্থিত করেছেন। অন্য হাতে তিনি বিপ্লবের পক্ষে যে-কোনো বাধাকে পরাহত করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ট্রট্স্কীপন্থীদের সর্বনাশা ঝোঁকের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার কলম ধরেন। মৃত্যুর দু মাস আগেও একখানা খোলা চিঠিতে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনে চীনা ট্রট্স্কীপন্থীদের বিরূপতাকে তীব্র সমালোচনা করে বিপ্লবীদের সতর্ক করে দেন। ফ্রয়েডকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদীরা বিপ্লবের পক্ষে জনগণের মানসিক পরিবর্তনের যেভাবে বাধা দেয়, সেই কুশলীচক্রান্তকে তিনি তুলে ধরেন। সর্বোপরি তিনি প্রবলরূপে অবতীর্ণ হন চীনের সমসাময়িক ভাড়াটে লেখকদের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী সাহিত্য আন্দোলনের সুফলকে উল্টোখাতে বইয়ে দিতে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া লেখকবুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় ছিল। তাদের নিযুক্ত করেছে, মদত দিয়েছে চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে কুওমিঙটাঙ সরকার। এই সব ভাড়াটে লেখকদের কাজ ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমানসকে বিষাক্ত করে তোলা। লু সুন এদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ন কলম চালান। এ-ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো 'দি আর্ট অব দি নাম্বার-টু ক্লাউন' এবং 'দি সিক্রেট্ অব বিইং এ জোকার'। প্রথম প্রবন্ধে লু সুন ভাড়াটে লেখকদের শ্রেণী-উৎস দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় প্রবন্ধে এদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা জনগণের কাছে তুলে ধরেছেন। এই সব লেখকরা বাক্-স্বাধীনতা, মানবাধিকার, মুক্ত সত্তার কথা বড়ো গলায় বলেছে এবং চিয়াঙের সমালোচনা করে দেখাতে চেয়েছে সরকারকে সমালোচনা করার সাহস তারা রাখে, তারা নিরপেক্ষ, নির্দোষ, অন্যায়-বিরোধী। কিন্তু এইসব প্রবক্তাদেরই দেখা গেছে, সরকারের পক্ষ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের শিল্পসাহিত্যকে দমন করতে। দিনের আলোতে এরা জনগণের পক্ষে কথা বলে, রাতের অন্ধকারে কুয়মিঙটাঙ প্রভু-

দের সঙ্গে বসে খানাপিনা করে এবং উচ্চ সরকারী পদ লাভ করে। এরা সকলের দু নম্বর ভাঁড় "মঞ্চের ভাঁড়ের চেয়ে এদের সামাজিক-পদমর্যাদা অনেক উ'চুতে, কিন্তু চরিত্রে এরা ভাঁড়ের চেয়ে নীচ।" লু সুন এই ভণ্ড লেখকদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে দিয়ে বিপ্লবী সংস্কৃতি-আন্দোলনের লেখকদের এই অভ্রান্ত সামাজিক সত্য শুনিয়েছেন—"যতকাল সমাজে বিত্তবান ও শক্তিমান পরিবারগুলি থাকবে, যতকাল সমাজে স্বৈরাচার থাকবে. ঠিক ততকালই দু-নম্বর ভাঁড়েরা থাকবে আর থাকবে দু-নম্বরী ভাঁড়ের কসরত্।"

লু সুনের চিন্তা, কাজ ও লেখা আন্দোলনের সংগঠনে যত নিয়োজিত হতে লাগল, এবং বিপ্লবী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল, তাঁর ব্যক্তিজীবন ততই সংকটময় হয়ে উঠল। গুপ্তচর ও আততায়ী তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে, তিনি আত্মগোপন করছেন। তারই মধ্যে কমিউনিস্ট ও তরুণ-সাহিত্যযোদ্ধৃগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। লু সুন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। বিশ্রাম দরকার, কিন্তু তাড়িত হয়ে বিশ্রামের অবকাশ পাচ্ছেন না। ১৯৩৬, ১৯শে অক্টোবর এই রোগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত সকল ভ্রূকুটির মধ্যে অটলভাবে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের পক্ষে চীনা জনগণের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের কাজে শিল্পীর মহান দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন লু সুন।

লু সুনের সাহিত্যচিন্তার প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যের রচনাশৈলীর চিন্তা লক্ষণীয়। লু সুনের সাহিত্যে রাজনীতি সংশয়রহিত ও বলিষ্ঠ, উদাত্ত ও স্বচ্ছ। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় রাজনীতি প্রথমে এসেছে এবং সমকালীন চীনের রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকের দ্বারা তাঁর সাহিত্য আকৃতি লাভ করেছে। আকৃতি লাভ করে তা রাজনৈতিক আন্দোলনকেই আবার অশেষ সমৃদ্ধ করেছে। লু সুনের সাহিত্যকর্মে এই আবর্তনটি রেখায়িত, স্পষ্ট। কিন্তু সমুদ্র থেকে মেঘ উঠে আবার সমুদ্রকে বর্ষণে সমৃদ্ধ করবার আবর্তন পথে চীনের ভূমির উর্বরতার বাসনাকে পরিপুষ্ট করেছে, নবাংকুর ইক্ষু ক্ষেতে বৃষ্টি ঝরিয়েছে, কাঁটা ঝোপে আকীর্ণ শস্যক্ষেত্রের আশালতাকে লতিয়ে দিয়েছে। লু সুন যে এ রকমটা পেরেছেন, সে তাঁর রাজনীতি ও সাহিত্যরচনাশৈলীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তীক্ষ্ম সচেতনতার জন্যই। মানুষ তো তখনই সাহিত্যকে ব্যবহার করে যখন দেখবে তা ব্যবহারের যোগ্য। লেখকের রচনাশৈলী দক্ষ না হলে তার রচনার বিষয়বস্তুতে যতই সারবত্তা থাক না কেন তা মানুষকে ব্যবহারে উৎসাহিত করবে না। বিপ্লবী লেখক রচনাশৈলীর নব নব বিপ্লব সম্পর্কে প্রণিধান না করে সাহিত্যের সারবান বিষয়বস্তুকেও বিপ্লবের পক্ষে কার্যকর করতে সক্ষম হতে পারেন না।(১১) আঙ্গিকের দক্ষতা যখন সযত্ন

অনুধ্যানে ও প্রয়াসে আয়ত্ত হয়, তখন সদম্ভেই লেখক বলতে পারেন—সাহিত্য হচ্ছে প্রচার, বিপ্লবের জন্য প্রচার—কিন্তু তা সাহিত্যরসোত্তীর্ণ প্রচার।(১২) লু সুন তা ঘোষণা করতে পেরেছেন বলেই চীনা জনগণ তাদের বাসনার বিকাশে লু সুনকে সাগ্রহে ও উৎসাহে ব্যবহার করে তাঁকে সর্বহারার বিপ্লবী লেখক আখ্যা দিয়েছে, তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তব সাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী স্রষ্টা আখ্যা দিয়েছে। সে আখ্যা লু সুন দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামী জনগণের কাছ থেকে লাভ করার পূর্ণ দাবীর গৌরব রাখেন।

পাদটীকা

১। The sacred tower cannot avert the arrows of the gods; like a milestone, wind and rain darken this land. The frosty stars ignore me when I speak my thoughts. I'll dedicate my life to the god Hsuan-yuan.

[Inscribed on My Portrait, 1903]

Hsuan-yuan হলেন চীনাজনগণের পূর্বপুরুষ। চীন এখানে প্রতীকায়িত হয়েছে।

২। Carrying wine in a leaking boat
I sail downstream.
Eyebrows raised, coldly confronting
Accusing fingers of a thousand bullies,
Yet with my head bowed,
I'will be an ox for children.

[A Satire on Myself, 1932]

৩। 'বামপন্থী লেখকদের লীগ সম্পর্কে ভাবনা'

৪। "প্রতিভার দাবির চেয়ে মাটির ব্যবস্থা করা আমাদের বেশী জরুরী; কারণ তা না হলে এমন কি আমাদের যদি একশ' প্রতিভাও থাকেন, মাটির অভাবে তাঁরা শিকড় গাড়তে সক্ষম হবেন না, যেমন প্লেটের উপর মটরদানার যে দশা হয় তাই হবে।"

"প্রতিভা কোনো উদ্ভট জিনিষ নয়, যা গভীর জঙ্গলে বা নির্জন প্রান্তরে জন্মায়; বরং তা এমন কিছু যা একধরণের জনগণ যার জন্ম দেন ও লালনপালন করেন। এ ধরণের জনগণ ছাড়া কোনো প্রতিভা হতে পারে না।"

[একটি প্রতিভার অপেক্ষায়]

৫। "আমার মনে হয়েছে সামন্ত শোষণ জর্জরিত একটি দেশের নাগরিক রোগে ভুগে মরল কি বাঁচল সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মনের পরিবর্তন—মানসিক চিন্তার স্তরের পরিবর্তন। ফলে আমি অনুভব করতে থাকি সাহিত্যই হল এই কাজের সবচেয়ে মূল্যবান অস্ত্র। একটি সাহিত্য আন্দোলনকে যথাযথভাবে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।"

[প্রথম গল্প সংকলন 'যুদ্ধের ডাক' গ্রন্থের ভূমিকা]

৬। চীনের প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ফেঙ ইউয়ান-চুন

৭। "লু সুনের প্রধান চারিত্র বৈশিষ্ট্য হল তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি সমাজকে যুগপৎ অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। ফলে তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল সুসংবদ্ধ ও দূরদর্শিতাপূর্ণ।"

[লু সুনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকি অনুষ্ঠানে মাও সেতুঙের ভাষণ]

৮। হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমিতে লু সুনের প্রদত্ত ভাষণ।

৯। "আমি সব সময়েই মনে করেছি যে তরুণ যোদ্ধা সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার সময়কালে বেশ কয়েকটি সাহিত্যিকগোষ্ঠী তৈরী করেছিলাম, যদিও তাদের কোনটাই খুব বেশী কিছু হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের অবশ্যই এই বিষয়ে আরও বেশী নজর দিতে হবে।"

[বামপন্থী লেখকদের লীগ সম্পর্কে ভাবনা]

১০। "আমাদের কমরেডদের রক্ত প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের বিপ্লবী সাহিত্য একই পীড়ন ও সন্ত্রাসের শিকার—দুইয়ের সংগ্রাম মূলত এক, এবং পরিণতিও এক, কারণ এ হল বিপ্লবী শ্রমজীবী মানুষের সাহিত্য।"

[চীনা সর্বহারাদের বিপ্লবী সাহিত্য এবং অগ্রগামীদের রক্ত]

১১। "কিন্তু আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো ক'রে কোনো লেখককে আখ্যা দেওয়ার আগে আমাদের বিষয়বস্তুর সারবত্তা ও দক্ষ রচনাশৈলীর দিকে নজর দেওয়া উচিত।"

১২। "রচনাশৈলীর উল্লেখ করা মাত্রই বিপ্লবী লেখকরা থমকে দাঁড়ান। যা হোক, আমার মনে হয়, যদিও সমস্ত সাহিত্যই হচ্ছে প্রচার, কিন্তু সমস্ত প্রচারই সাহিত্য নয়; ঠিক যেমন সমস্ত ফুলেরই রং আছে (আমি সাদাকেও রং মনে করি), সমস্ত রঙীন বস্তুই কিন্তু ফুল নয়। প্রচলিত প্রবাদ, শ্লোগান, বিজ্ঞপ্তি, টেলিগ্রাম ও পাঠ্যপুস্তকের উপরেও, বিপ্লবের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন—কারণ এটা সাহিত্য।" [সাহিত্য ও বিপ্লব]

পাবলো পিকাসোর শিল্পভাবনা

নির্মাল্য নাগ

দায়বদ্ধ শিল্পী বলতে যা বোঝায় পাবলো পিকাসো ছিলেন তেমনই শিল্পী। ইউরোপীয় শিল্পশৈলীর মানচিত্রে এই ঘরাণার গয়া (১৭৪৬—১৮২৮), কোর্বেত (১৮১৯—৭৭), মাতিস্ (১৮৬৯—১৯৫৪) প্রমুখ শিল্পী-দের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে 'কমিটেড' সকলকে বলা না গেলেও, তাঁদের সৃষ্টিতে শুধু জীবনের নয়, সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতার লক্ষণও একেবারে অনুপস্থিত নয়।

প্রতিটি সৎ শিল্পীর নিজস্ব এক শিল্পভাবনার রূপরেখা থাকে, যার সমীক্ষায় সেই শিল্পীর সৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে।

পিকাসোর জন্ম সময়টি ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এক বছর আগে প্যারী কমিউনের মত ঘটনা (১৮৭১) হয়েছে। যত অপ্রত্যক্ষই হোক্ বালক বয়সে এর প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। এর বিপরীত সম্পর্কে স্বদেশের শাসন ব্যবস্থা স্বভাবতই দ্বন্দ্বমূলক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

এই সময়েই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় শিল্পচর্চার রেনেসাঁস (১৪৫৩—১৫০০), বাইজেন্টাইন (১৪০০—১৫০০), বারোক (১৭০০—১৮০০) এবং ইম্প্রেসনিস্ট যুগ (১৮৭২—১৯০০)—এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আন্দোলন: অর্থাৎ এই সময়েই ভাববাদ, রোমান্টিকতা, প্রতীকীবাদ ও চূড়ান্ত বাস্তববাদ শিল্পের ইতিহাসে নানা সম্পর্কে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সক্রিয় হয়েছে। এ ছাড়া সামাজিক দিক থেকে দ্রুত পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি, জ্ঞানচর্চার বুনিয়াদী আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা তথা-কথিত স্বকীয়তা বাঁধাছকের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছে।

এই সবেরই প্রভাব সংস্কৃতি জগতে, বিশেষ করে শিল্পচর্চায় পড়েছে যার ফলে শিল্পীরা নিছক ভাবাবেগের বশে বা কল্পনাপ্রবণতার আকর্ষণে ধরা না দিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তার দিকে নিবদ্ধ হয়েছেন, সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে শিল্পীরা আন্তরিকভাবে ভাবতে সুরু করেছেন।

পিকাসোর ধারাবাহিক শিল্পচর্চা ও শিল্পভাবনার পরিচয় পেতে এই সমগ্র পশ্চাৎপট ও সঠিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রাখা দরকার। তাঁর শিল্পসৃষ্টির ধারাকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করতে পারি: 'ব্লু পিরিয়ড', 'রোজ

পিরিয়াড', 'ক্ল্যাসিকাল', নিগ্রো আর্ট ও কিউবিজম, এবং স্যুররিয়ালিস্ট। অবশ্য প্রাত্যেকটি পর্বের কিছু উপাদানগত অর্জিত শিল্পভঙ্গি পরস্পরকে যে প্রভাবিত করেছে এবং ভাবনাগত রূপেরেখার মিল যে জড়িয়ে থেকেছে তা নিঃসন্দেহে পিকাসোর অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের নিয়ামক।

পিকাসো যে সময়ে তাঁর শিল্প চর্চা সুরু করেছিলেন, তখন বাস্তববাদী চর্চার চূড়ান্ত স্তর পার হয়ে 'বারোক' শিল্পের প্রভাব কাটিয়ে শিল্পীরা সম্পূর্ণ নতুন এক শৈলী আবিষ্কার করেছেন। অপরদিকে পূর্ববর্তী আন্দোলন অপেক্ষা এই 'ইমপ্রেসনিস্ট' চিত্র আন্দোলন ছিল অধিকতর সংগঠিত। দেখা যায়, দা-ভিঞ্চির সময়কার 'পিন হোল' ক্যামেরা আরও উন্নত হলে বাস্তবকে হুবহু ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিল্পীদের অনাগ্রহ সৃষ্টি করেছে, ফলে তাঁরা বেশি করে এক্সপ্রেসন ও ইম্প্রেসন-ধর্মী ব্যঞ্জনায় মনোনিবেশ করেছেন। কাজেই এই পর্যায়ে সর্বস্তরে দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

এই পরিবর্তনের লক্ষ্যণীয় দিক হল বিষয়বস্তুতে সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনযাত্রার উপস্থিতি এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার এক উন্নত অভিব্যক্তি, যা শিল্পীদের মানসজগতে বিপুল রূপান্তর ঘটালো। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই যন্ত্রচালিত সভ্যতার ফল হিসাবে সামাজিক সম্পর্কগুলি প্রতিফলিত হতে সুরু করেছে। পিকাসোর পক্ষেও প্রাথমিক স্তরে এই সব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর মেজাজ, মানসিক গঠন ও পরিবেশ মিলে পূর্ববর্তীদের শিল্পভাবনা তাঁকে বেশ কিছু অধিকার করেছিল। এই সময়ে তাঁর শিল্পভাবনায় মূলত ইম্প্রেসনিস্ট যুগের প্রভাব থাকলেও সেজান, গডউইন, লর্তে প্রমুখ শিল্পীদের প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছিল। সেজানের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পসত্য খোঁজার বিশেষ ভঙ্গি তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। যদিও সেজানের বর্ণ-পরিকল্পনা অপেক্ষা বর্ণ ব্যবহারের ধরণ তাঁকে টানত বেশি, তবু তারই সঙ্গে পিকাসো পেয়েছিলেন সেজানের চিত্রস্থ ভাস্কর্যমণ্ডিত রূপ। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, মানবশরীরের গতিশীল ভঙ্গি কেন পিকাসোকে এত আকর্ষণ করত।

স্মরণ রাখা দরকার, পিকাসো তাঁর 'ব্লু পিরিয়াড' সুরু করার আগে বার্সিলোনাতে প্রবহমান শিল্প আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই আন্দোলন এসেছিল উত্তর ইউরোপ ও ফরাসী দেশ থেকে। তুলুস লতে, রেনোয়া, সেজান ও পিসারিও প্রমুখ শিল্পীর নেতৃত্বে গড়া এই আন্দোলনের প্রভাব তাঁর উপর ক্ষণস্থায়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে পিকাসোর বিশিষ্ট শিল্প-ভাবনার বনিয়াদটি এই সময়েই তৈরী হয়েছে। ১৯০০ সালে প্যারিসে এসেও পিকাসো এই 'ব্লু পিরিয়াড'-এর ছবিতে ঘন নীল বর্ণের গঠনে

ক্যাটালান গথিকের 'ইলংগেটেড ফর্ম' এবং তার পূর্ববর্তী 'ম্যানারিজম অব ইটালি', সর্বোপরি মহান শিল্পী ভেলাজকুইজ-এর সাবলীলতা, ও বিদ্রোহী শিল্পী গয়ার সাহসী বর্ণ-ব্যবহার বেশ স্পষ্ট ও জোরালো ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। লক্ষ্যণীয় দিক, একটি পর্বে এতগুলি শৈল্পীক উপাদানকে আত্মস্থ করা এবং তাকে বাস্তবে নিজের মত করে বলিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা ও আপন অভিজ্ঞতার উত্তরণ ঘটানো নিঃসন্দেহে পিকাসোর প্রচণ্ড সাহসী ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে প্রমাণ করে। এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়, পিকাসোর শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে আগাগোড়া এক ধরণের তীব্র অতৃপ্তিবোধ ও আত্ম-সমালোচনা-মূলক আচরণ সবসময়েই বেশ চড়া সুরে ফুটেছে, যা তাঁর শিল্পীমানসের এক বিশেষ দিক।

পরবর্তী পর্বে কিছুদিনের জন্য যে ক্ল্যাসিকধর্মী প্রকাশভঙ্গির চর্চা করেন তাতে টোন ও ফর্মে ভিন্ন পরীক্ষা থাকলেও প্রাথমিক ভাবে গড়ে ওঠা সচেতন শিল্পভাবনার প্রতিভাস আবছা হয়ে যায়নি।

এরই প্রমাণ হল, পরবর্তী স্তরে পিকাসো যখন সেজানের উদ্যোগে সৃষ্ট 'কিউবিজম'-এর চর্চায় আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। এতদিন বস্তুর গঠন সম্পর্কে তাঁর মধ্যে যে এক তীব্র আকুতি ছিল, এবার তা সফল হবার অবকাশ সৃষ্টি হল।

সেজানের কিউবিজম-এর মধ্যে যে যুক্তিবাদীতা ও সংগঠিত প্রয়াস, তা পিকাসোর কাছে মনে হয়েছিল বস্তুজগতের গভীরে পৌঁছনোর পক্ষে বাধা। অথচ তিনি এই ভঙ্গিকে কালোপযোগী প্রকাশভঙ্গি হিসাবে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁর অতৃপ্তিবোধ ও প্রশ্ন-প্রবণতা তাঁকে নিগ্রো আর্টের সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতার প্রতি মনোযোগী করে তুলেছে।

তিনি গভীর অনুশীলন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মিশরীয় রীতি ও নিগ্রো আর্টের মর্মবাণীকে আত্মস্থ করলেন। কিন্তু এ ঘটনাও বিচ্ছিন্নভাবে তাঁকে অধিকার করেনি, তাঁর নিজস্ব 'কিউবিজম' চর্চাকেই পুষ্ট ও সম্প্রসারিত করেছে।

পিকাসোর শিল্পভাবনায় এই কিউবিজম-এর যুগ অবশ্যই সমৃদ্ধশালী ও ব্যাপক। সেজান যাকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, পিকাসো তাকে একটি ভিন্ন মাত্রা ও বনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়েছেন। যন্ত্রচালিত সমাজের জটিলতা থেকে সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনার যে দাবি, পিকাসোর এই পর্বে আবিষ্কৃত কিউবিস্ট রীতি তাকে অনেকাংশে পূর্ণ করতে সক্ষম হল। যদিও প্রথম দিকে নিগ্রো আর্টের প্রভাবে তাঁর কিউবিজম-এ আদিম রূপের প্রতি ঝোঁক দুর্লক্ষ্য নয়, তবু ধীরে ধীরে তিনি আবিষ্কার করেন একেবারে নিজস্ব ও যুগোপযোগী নতুন ফর্ম।

পিকাসোর এই পর্বের শিল্পচর্চা সম্পর্কে, যদিও সাধারণভাবে শিল্প-রসিকদের মধ্যে একটা ঔদাসীন্য গোপন থাকে না, তবু স্মরণযোগ্য যে, এই কিউবিস্ট পর্বেই তিনি উত্তরকালের মহান সৃষ্টিগুলির ভিৎ নির্মাণ করেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে, পিকাসোর সামগ্রিক শিল্পলোক কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়ে একটা পরিণতি লাভ করবে তা সবই এই পর্বের ভাবনাতে ও সৃষ্টিতে অনেকটা পাই।

এই সময়কার অন্তরঙ্গ শিল্পী ব্রাকের সাহায্যে পিকাসো একটানা দশ বছর কাজ করে কিউবিস্ট রীতিকে উন্নত স্তরে পেঁছে দেন। উল্লেখযোগ্য যে, যে সময়ে মাতিস্, ডারেন, ভ্লামিঙ্ক, ম্যানগুইন, কামোয়েন, রাওলাট প্রমুখ শিল্পীগণ অপর এক শিল্পশৈলী গড়তে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে পিকাসো শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ আবিষ্কারের তাগিদে ভিন্ন এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত থাকলেন। এই সময়ের বিখ্যাত ছবি—'ডিমোয়সেলস্ ড'এভিগ্নন (১৯০৭)'-তে পিকাসোর পরিণততর শিল্পভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে। সমকালীন 'ফাউরে' গোষ্ঠীর অলংকরণ-প্রবণতা ও উজ্জ্বল বর্ণের ব্যবহার বর্জন করে তিনি এতে সাবলীলতা ও বলিষ্ঠ গঠনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে পেঁছতে গিয়ে তিনি বস্তুর এক নতুন ছন্দময় রূপ ও গঠন সৃষ্টি করেছেন। শিল্পীমানসের ক্রমবিকাশের এই স্তরে পিকাসো আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন 'এ্যানালিটিক্যাল কিউবিজম'-এর সংবেদনশীল ব্যাখ্যা।

পরবর্তী ১৯২৩-২৫ সালে পিকাসো যে অর্জিত নানামুখী ব্যবহারিক প্রকাশভঙ্গির ছক থেকে সরে এসে বৈপ্লবিক শিল্পশৈলী আবিষ্কারের আর্তি প্রকাশ করেছেন, এর মধ্যে তাঁর শিল্পভাবনার যে দিক স্পষ্ট হয়েছে তা হল —বস্তু ও জীবনসত্যের গভীরতাকে তুলে ধরার এষণা। এই সময়েই 'এ্যানালিটিক্যাল কিউবিজম'-কে যান্ত্রিকভাবে চর্চা না করে সাবলীলতার ছন্দে ভিন্ন এক রূপলাবণ্য সৃষ্টি করলেন।

পিকাসো শিল্পভঙ্গির নবনব অন্বেষণে তাড়িত ও ধাবিত হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু এতেই যে তিনি তৃপ্তি পাননি তা নিঃসন্দেহে তাঁর নান্দনিক সত্তার গুণগত ও গতিশীল দিক। তিনি ক্রমেই বুঝেছেন বস্তুর অনুভব, সচেতন অভিব্যক্তি, পূর্বেকার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পরিমিত প্রয়োগ, বস্তুর গঠনে গতিশীলতা, যতি-বিভাজনে স্বাতন্ত্র্য এবং চরিত্রচিত্রণে তীব্র জ্বালা—এই সব প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে সৃষ্টির মধ্যে তুলে না ধরলে সাফল্যের দিকে এগোনো যাবে না এবং এই পর্বে সেটাই করেছেন। ১৯৩৫-৩৭ একদিকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ, অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর শিল্পীমানসে প্রচণ্ড নাড়া দিল। এতদিন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে দেখেছেন, এই দুই ঘটনা

তাঁর সেই শিল্পভাবনাকে আমূল বদলে দিল। এবার তিনি রং-তুলি-রেখার হাতিয়ারকে নতুন দায়িত্বে সামিল করার বেগ অনুভব করলেন। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অত্যাচারকে তিনি ধারাবাহিক চিত্রে তুলে ধরে এটাই প্রমাণ করলেন, জনগণের প্রতি কী গভীর মমত্ব এবং সামাজিক সচেতনতা প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির পক্ষে আবশ্যিক শর্ত। এই পর্বেই পিকাসো তাঁর অমর শিল্প 'গোয়ের্ণিকা' সৃষ্টি করেন। বিপুল আয়তনের ম্যুরালধর্মী ছবি, যার মাপ ছিল ২৫½ ফুট×১১½ ফুট। প্রায় ২ মাস অক্লান্ত শ্রমে ও নিষ্ঠায় সৃষ্টি করলেন বর্তমান শতাব্দির এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পানুভূতি—নথিভুক্ত করলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে আক্রান্ত মানুষের প্রতিবাদী শৈল্পিক ফসল—প্রমাণ করলেন একজন কমিটেড শিল্পী আদর্শ ও সৃজনশীলতার কত উন্নত সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম।

নাৎসীরা যখন ফ্রান্স দখল করল ১৯৪০ সালে, পিকাসো তখন প্যারিসেই। নানা প্রলোভনের জাল ফেলা হল পিকাসোকে কেনার;' কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে পিকাসো নাৎসীদের বর্বরতার পরিচয় তুলে ধরলেন 'চার্নেল হাউস'-এ। এতে তাঁর কমিটেড শিল্পভাবনা ভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ পেল। শুধু সাদা ও কালোয় ফুটে উঠল অত্যাচারের নগ্নরূপ। উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শান্তি ও গণতন্ত্রের সপক্ষে আঁকা তাঁর 'শান্তির পারাবত' যে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, পিকাসোর শিল্পভাবনার ক্রমবিকাশে তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাঁর গভীর মানবিকতা ও সামাজিক অনুভূতিই যে তাঁর শিল্পীসত্তার দায়বদ্ধতাকে পরিণততর করেছে, তার বীজ তাঁর গতিশীল শিল্পভাবনার মধ্যেই নিহিত ছিল। এরই ফসল ম্যাসাকার অব কোরিয়া'।

পিকাসোর শিল্প ও শিল্পভাবনার সাথে পরিচিত হবার পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি একটি আবশ্যিক শর্ত। একদিকে যুগোপযোগী শিল্পের ভাষা ও আঙ্গিক আবিষ্কার, অপরদিকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় দ্রুত 'রিয়্যাক্ট' করা এবং তার ভিত্তিতে সচেতন শিল্প সৃষ্টি করা—এই যৌথ দায়িত্ব পালনে পিকাসো এক অনন্য প্রতিভা।

এই দায়বদ্ধ পিকাসোর সৃষ্টি ও শিল্পভাবনাকে, বিগত তিন দশকে ইউরোপের কিছু প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমালোচক, গৌণ করে 'আবেগসর্বস্বতা' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অথচ প্রকৃত বিচারে দেখা যায়, প্রতিটি সৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত হিসাবে তাঁর বিবেচ্য ছিল—বিষয়কে চিত্রিত করতে গিয়ে বস্তুর আন্তরসত্তা ও শিল্পভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম হবার প্রয়াস, যা এক কথায় যে কোন সৎ শিল্পীর আনন্দলাভের চিরন্তন বনিয়াদ। যে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে পিকাসো আজীবন সংগ্রাম করলেন, সেই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর শিল্পভাবনার মূল্যায়ন অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যভাবনা

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিবাদ্য শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম বেশী আঠাশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য বিষয়ে যে সব চিন্তা-ভাবনা করেছেন তার পরিমাণ অত্যধিক না হলেও একেবারে নিতান্ত কমও হবে না। অন্ততঃ, ততটা পরিমাণ সাহিত্যচিন্তা লিপিবন্ধ করে গেছেন যার থেকে এই বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ মোটামুটি বোঝা যায়। যাকে বলা যায় সাহিত্য সংক্রান্ত প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বদর্শন, তেমন দর্শন তিনি তাঁর ব্যস্ততাতাড়িত অস্থির অশান্ত সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনে গড়ে তোলার অবকাশ না পেলেও ছাড়া-ছাড়া ভাবে এখানে-সেখানে সাহিত্য বিষয়ক এমন সব মূল্যবান চিন্তার টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন যে, সেগুলি একত্র কুড়িয়ে নিলেও বেশ একটা তাড়া হবে। নাই বা হলো সেগুলি সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত পূর্বাপর সযত্নগ্রথিত, তাই বলে সেগুলি থেকে মানুষটির সাহিত্যচিন্তার ছাঁচ অনুধাবন করতে মোটেই অসুবিধা হয় না।

দুটি মূল সূত্র থেকে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাহিত্য বিষয়ক ভাবনাচিন্তার পরিচয় জানতে পারি। এক তাঁর 'লেখকের কথা', নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে; দুই তাঁর উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহগুলির সংস্করণ ও সংস্করণান্তর সমূহের ভূমিকার সাক্ষ্য থেকে। এছাড়া শেষ বয়সের লেখা ডায়েরীর দিনলিপিগুলিকেও ধরা যায়, তবে সে সবের ভিতর প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের খুঁটিনাটি কথাই বেশী; একজন লেখক-শিল্পীর অন্ত-র্জীবনের গভীর-গূঢ় অনুভবের প্রমাণ তাতে বড়-একটা নেই। এমন কি পরোক্ষভাবেও নেই। সুতরাং প্রথমোক্ত দুটি সূত্রের উপরেই মুখ্যত নির্ভর করা সমধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

'লেখকের কথা' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি—মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এতে কোনও একজন লেখক-শিল্পীর সাহিত্য জীবনের ভিত্তি, সংসার ও সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মূল্য, বেঁচে থাকার সমস্যা, চিন্তার

স্বাধীনতা, প্রকাশক-লেখক-পাঠক সম্পর্ক, প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ও অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যে পার্থক্য, বাস্তববিরুদ্ধ ভাবালু মনোভঙ্গীর অসারতা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে মানিকের ধ্যান-ধারণার পরিচয় বিধৃত দেখতে পাই। এই পরিচয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে যে-জিনিসটা প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো তিনি চিন্তাপ্রবণ, প্রতিটি বস্তুর তল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখার অদম্য কৌতূহলে অস্থিরচিত্ত, ছোটবেলা থেকেই পিতার ঘন ঘন বদলির চাকরির সুবাদে স্থান থেকে স্থানান্তর গমনের সুযোগে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যজনিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, নীচুতলার দরিদ্র খেটে-খাওয়া লোকজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতিপরায়ণ, সহজাতরূপে জিজ্ঞাসু ও বিচার-সন্ধিৎসু, সর্বোপরি হৃদয়াবেগের আতিশয্যের অর্থাৎ ভাবালুতার ঘোরতর বৈরী।

সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে সর্বাগ্রে আলোচনা করে বলি, ওই-যে তাঁর প্রথম লেখা গল্প 'অতসীমামী' (১৯২৮) যা তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখে-ছিলেন ও বাজি জিতেছিলেন, তা যদিও পূর্ববঙ্গের এক শিল্পী দম্পতীর নাটকীয় প্রেমের ট্রাজিক পরিণামের গল্প কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে সচরাচর—প্রচলিত প্রেমের গল্পের ধাঁচ-ধরণ থেকে এর জাত-গোত্র একেবারেই আলাদা। এতে নাটকীয়তা আছে, ট্রাজিক রসের আতিশয্য আছে কিন্তু ন্যাকামি ও ছ্যাবলামি নেই, যা কিনা এদেশের অধিকাংশ প্রেমের গল্পের প্রধান অবলম্বন। মানিক কখনও কখনও প্রেমকে উপজীব্য করে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন সত্যি কথা কিন্তু কোন সময়েই গতানুগতিক ছকের প্রেমের কাহিনীকে প্রশ্রয় দেননি—না গল্পে না উপন্যাসে। তাঁর এমন একটি রচনাও দেখানো যাবে না যেখানে তিনি 'দেখামাত্র প্রেম উপার্জন' গোছের ফাঁপা ভাবালুতার বাষ্পে ভরা হাস্যকর অবাস্তবতার ফানুস উড়িয়েছেন অথবা অনুরাগ-পূর্বরাগ (কোর্টশিপ)—বিবাহ জাতীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের চিরাভ্যস্ত মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনীর ছক-কাটা দাগের উপর দাগা বুলিয়েছেন। মানিকের বর্ণিত প্রেম হয় অস্বাভাবিক (দিবারাত্রির কাব্য, হেরম্ব-আনন্দ কথা) নয় মনস্তাত্ত্বিক আলো আঁধারে ঘেরা (পুতুলনাচের ইতিকথা, শশী-কুসুম কথা), নয় স্থূল দেহবাসনা সঞ্জাত (পদ্মা নদীর মাঝি, কুবের-কপিলা কথা), নয় বিকৃত (চতুষ্কোণ—কিন্তু কোন সময়েই রোমান্টিক নয়। রোমান্টিক ভাবাতিশয্য সঞ্জাত প্রেমকে তিনি বারে বারে ব্যঙ্গ করেছেন। দিবারাত্রির কাব্যে এর শুরু, রোমান্টিক হৃদয়োদ্বেলতার বিরুদ্ধে তাঁর এই আপসহীন অভিযান তিনি আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছিলেন।

মানিক-সাহিত্যের দুটি পর্ব সুস্পষ্ট-চিহ্নিত ও সুবিভক্ত। ১৯২৮ সালে তাঁর লেখার শুরু হয়েছে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে ১৯৪০ পর্যন্ত

কমবেশী বারো বছর কাল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ফ্রয়েডীয় পর্ব। এই পর্বে তিনি মানুষের নির্জ্ঞান মনের সুপ্ত কামনা-বাসনা-বিকার-অবদমিত ইচ্ছা-অতৃপ্ত ভোগলালসা প্রভৃতিকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করে এক ধরণের 'মর্বিড' জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটিয়েছেন এবং পাঠক সাধারণকে তাঁর ওই অদ্ভুত অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভবের শরিক করেছেন। মানিকের ব্যবহৃত ভাষা অনুসরণ করে বলি তাঁর নিজের উপলব্ধি "অন্যকে দান করেছেন অর্থাৎ পাইয়ে দিয়েছেন।" (কেন লিখি ?, লেখকের কথা)। মানিক এই ফ্রয়েডীয় কামায়নের প্রভাবের পর্বে যে সব গল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, সরীসৃপ, মহাকালের জটার জট, বিষাক্ত প্রেম, সিঁড়ি প্রভৃতি। উপন্যাসের মধ্যে পড়ে—দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, এমন কি পদ্মা নদীর মাঝির কোন কোন অংশ।

পক্ষান্তরে ১৯৪৪ সালে তাঁর কম্যুনিস্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিক যোগদানের সময় থেকে মৃত্যুকাল (১৯৫৬) পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য আরেক বারো বছর ছিল তাঁর সাহিত্য জীবনের সুচিহ্নিত মার্কসীয় পর্ব। মার্কস-এঙ্গেলস প্রচারিত এবং লেনিন-স্টালিন পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দ্বন্দ্ব-মূলক দর্শনের প্রভাব-পরিধির মধ্যে থেকে তিনি এই অধ্যায়ে কতকগুলি সারবান উপন্যাস (যথা দর্পণ, চিহ্ন, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী, ২ খন্ড, ইতিকথার পরের কথা প্রভৃতি) এবং অনেকগুলি অসামান্য শিল্পোৎকর্ষ মণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন (যথা, হারানের নাতজামাই, পেট-ব্যথা, বাগ্দীপাড়া দিয়ে, মাসিপিসি, কংক্রীট, টিচার, শিল্পী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী প্রভৃতি), ছোটগল্পের সংখ্যাই তুলনায় বেশী।

মাঝের চারটি বছর অর্থাৎ ১৯৪০-৪৪ সাল তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ নামক রাজনৈতিক দর্শন (মার্কস প্রচারিত) এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নামক শৈল্পিক দর্শন (গর্কি-প্রবর্তিত)—এ দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতিকাল বলা যেতে পারে। অবশ্য প্রস্তুতি তার আগে থেকেই চলছিল, তিরিশের দশকের লেখায়ও এর অংকুর খুঁজে পাওয়া যায় (দৃষ্টান্তস্বরূপ পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের উল্লেখ করা চলে), তবে এই অন্তর্বর্তী বর্ষচতুষ্টয়েই যেন সেই প্রস্তুতি রীতিমত দানা বেঁধে উঠছিল দেখা যায়।

সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় এই দুই সুচিহ্নিত পর্ববিভাজনের মধ্যবর্তী কালকে পরিস্ফুটনের কাল বলা যেতে পারে। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস শহরতলী, ২ খন্ড এবং গল্প রচনার ক্ষেত্রে 'বৌ' পর্যায়ের গল্প। কিন্তু বৌ পর্যায়ের গল্পগুলিতে মার্কসীয় ভাবধারার অগ্রগতি অপেক্ষা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পশ্চাৎটানই বেশী লক্ষ্য করা যায়। মানিকের সাহিত্যের এই প্রথম যুগসুলভ অসুস্থ

মনোবিকার তাঁর মার্কসীয় পর্বের কোন কোন লেখাতেও গিয়ে অতর্কিতে প্রবেশ করেছে। যেমন, চতুষ্কোণ (১৯৪৮) উপন্যাসে। একজন সমালোচক যথার্থই লিখেছেন যে চিহ্ন (১৯৪৭) উপন্যাসের ঠিক অব্যবহিত পরবর্তী কালে এমনতর এক অস্বাভাবিক যৌনতার উপন্যাসের প্রকাশ অভাবনীয় বলা চলে না। এ আর কিছু নয়, অভ্যাস নামক মজ্জাগত দ্বিতীয় স্বভাবের দুর্জয় প্রকৃতির অসাধারণ আকস্মিক পুনরাবির্ভাবের এক ব্যত্যয়ী দৃষ্টান্ত মাত্র। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন শৈল্পিক পরিবেশে ফ্রয়েডকে পুরাপুরি কাটান দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না।

অনেকের ধারণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যে সব গল্পোপন্যাস লিখেছিলেন সেগুলিতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকুশলতা প্রকাশ পেয়েছিল, পরে তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার ক্রমিক অবনতি ঘটে এবং শেষ অবধি তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক থেকে একজন প্রচারবাদী সাহিত্যিকে পরিণত হলেন। এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপে এঁরা মাণিকের প্রথম পর্বের প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি গল্প এবং দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা ও পদ্মা নদীর মাঝি এই তিন উপন্যাসের উল্লেখ করেন। এঁদের এই ক্রমাগত মুখে মুখে রটানো কিংবদন্তীর ব্যাপক প্রচারের ফলে অনেক সময় বামপন্থী পাঠক-সমালোচকেরাও বিভ্রান্ত হন এবং এঁদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে থাকেন মানিক যা কিছু ভাল লেখা লিখেছেন তা তিরিশের দশকেই লিখে-ছেন, চল্লিশের দশক থেকে এবং শেষের দিকে তো প্রীতিময় শিল্পসৌন্দর্য বর্জিত জনজীবনভিত্তিক কাঠখোট্টা লেখাই তাঁর লেখনীর মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কিনা সাহিত্যের দাবি অগ্রাহ্য করে এই পর্বে তিনি প্রচারের দাবিকেই বেশী মর্যাদা দেন—তাঁর বিরুদ্ধে অবাম-বাম সব ধরণের পাঠকেরই অল্পবিস্তর নালিশ এই।

ভাববাদী সমালোচনারীতির এখনও পর্যন্ত কী অপ্রতিহত প্রভাব এদেশে বিদ্যমান এই রচনায় তার প্রমাণ মেলে। ওই যে মানিক প্রথম পর্বের গল্পো-পন্যাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্ঞান মনের বিকৃত কামনা-বাসনার উৎসকে ঘিরে মানসিক চিকিৎসকের মনোবিকলনধর্মী চিকিৎসার রীতিতে পর্দার ঘেরা-টোপে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কক্ষে শায়িত রোগী বা রোগিনীর মনের কথা টেনে বার করবার ব্যবচ্ছেদী প্রক্রিয়া অবলম্বনে লেখনী চালনা করেছিলেন, সেই ফ্রয়েডীয় 'মিস্টিক' রচনাপদ্ধতিই অদ্যাবধি আমাদের অধিকাংশ পাঠকের মনোহরণ করে রেখেছে। কিন্তু যা-ই মাত্র তিনি ব্যক্তিমনের অন্ধকার গুহা-গহ্বর ছেড়ে মুক্ত দৃষ্টিতে সমষ্টিবন্ধ সমাজজীবনের দিকে তাকিয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন সংগ্রামশীল সাধারণ গণমানুষের দুঃখ-বেদনা শোষণ ও বঞ্চনার অপরিমেয় গভীরতা, অমনি তাঁর লেখার বিরুদ্ধে বহির্মুখীনতার

অভিযোগ এনে তাঁর লেখার শিল্পগুণকে খারিজ করার একটা পরিকল্পিত চেষ্টার সূত্রপাত হয় আমাদের সাহিত্য-সংসারে। যেন ব্যক্তিজীবন থেকে সমষ্টিজীবনে উত্তরণ ঊর্ধায়ন নয়, অধঃপতন। যেন অন্ধকার থেকে আলোতে আসা গুণ নয়, দোষ। যেন একক ব্যক্তির কামনা-বাসনার ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণ ছেড়ে বহু মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক সঙ্ঘবদ্ধ সুস্থ আন্দোলন ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি-দাওয়াকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে ভাষা দেয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ।

এ বিষয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কথাই অবধান করা যাক। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে পূর্বোক্ত দুই পর্বের সাহিত্যের মধ্যে মানিক স্বয়ং কোন পর্বের সাহিত্যকে বেশী মূল্যবান মনে করতেন। এ সম্পর্কে তিনি কোন সন্দেহের অবকাশই রাখেননি—তাঁর স্বীয় পক্ষপাত যে পরবর্তী পর্বের রচনার ধারার দিকেই সুস্পষ্টরূপে ন্যস্ত ছিল সে সম্বন্ধে তাঁর জবানী অতি পরিষ্কার।

মানিক লিখছেন—"আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিক ভাবে জানবার সাধ্য হয়নি।" কিংবা তাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পবিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।"

কিন্তু এই খাতে মানিকের সবচেয়ে মূল্যবান স্বীকারোক্তি আমরা তাঁর নীচের কথাগুলির মধ্যে পাই—"প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি-দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল. আমার সাহিত্যসৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, **আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে?** (হরফের স্ফীতি মৎকৃত)।

উদ্ধৃতির পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না মানিক এখানে "অর্ধেক জীবনের সাধনা" বলতে তাঁর সাহিত্য জীবনের পূর্বার্ধকেই বুঝিয়েছেন অর্থাৎ সেই অর্ধে যে তাঁর লেখায় তদানীন্তন 'কল্লোল' 'কালিকলম' গোষ্ঠীর লেখকদের অনুসরণে এবং কতকটা নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁকের দরুণও বটে, ফয়েডীয় মনোবিকলনের আদর্শের মারাত্মক আধিপত্য ছিল। এই পর্বে যৌনতা ও মনোবিকার উৎকট এক ব্যাধির মত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করেছিল—সমাজের সমষ্টিগত শোষণ-অবদমন-অত্যাচার-অবিচারের প্রকৃত

রূপটি তখনও তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাও হতে পারেনি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মলীনতার অভ্যাস যদি একটা আবেশের (অবসেসন্‌) মত কেবলই লেখকের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে কতকগুলি অসুস্থ অর্ধ-অসুস্থ, অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত নরনারীর মনের গোলকধাঁধা সদৃশ আঁকাবাঁকা জটিল গলিঘুঁজির রহস্যাবৃত আঁধার গহনে বারে বারে ঘুরিয়ে ফেরায় তবে সে-লেখক কেমন করে সমষ্টিগত সমাজজীবনের রৌদ্রালোকের মধ্যে আপনাকে উত্তীর্ণ করবেন? অন্ধকার থেকে আলোতে আসবেন?

তবু যে এই অসুস্থ মনোবিকলনী অভ্যাসের আতিশয্য সত্ত্বেও মানিক প্রথম পর্বে পুতুল নাচের ইতিকথা আর পদ্মানদীর মাঝির মত দুটি অতিশয় শক্তিশালী উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন তার রহস্য নিহিত আছে তাঁর প্রতিভার মধ্যে, তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বের অনন্যতার মধ্যে। তাঁর প্রতিভার যাদুতেই তিনি বিষ থেকে অমৃত উত্তোলন করেছিলেন—পাঁক থেকে পদ্ম ফুটিয়েছিলেন। ভাববাদী সমালোচকেরা দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসটিকেও বিশেষ শক্তিশালী আখ্যা দেন এবং পূর্বোল্লিখিত দুই প্রধান উপন্যাসের সমসারে ফেলতে চান। কিন্তু দিবারাত্রির কাব্য শক্তির লক্ষণাক্রান্ত হলেও মূলত মনোবিকারের চিহ্নদুষ্ট রচনা; ওটি, কোন এক প্রসিদ্ধ সমালোচকের মন্তব্য ধার করে বলি "জটিল-কুটিল মনের সৃষ্টি।" সুতরাং তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কারণ দেখিনে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের পদ্ধতিতে যৌনতা ও কামায়নের আতিশয্যকে যদি একটা ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সেই ব্যাধির প্রতিষেধক মানিক খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর নিজ জীবনেরই পরবর্তী পর্বে, যে পর্বে তিনি যৌনতাকে পরিহার করে, অর্থনীতিই সমাজ জীবনের মূল নিয়ামক—এই বিশ্বাসের তীরে সমুত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ ফ্রয়েডকে বর্জন করতে যখন থেকে তিনি মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানের মতবাদকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মুখ্য সহচালিকা প্রেরণা রূপে গ্রহণ করলেন তখন থেকে তাঁর গোত্রান্তর ঘটলো—তিনি মুক্তিস্নান করে 'রূপনারাণের কূলে' জেগে উঠলেন। সমষ্টিচেতনার বিশল্যকরণীর প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিবাদী মোহনিদ্রার অবসান ঘটলো।

তবু যে ওই পর্বেও তিনি চতুষ্কোণের মত মনোবিকারধর্মী উপন্যাস লিখেছিলেন তার কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করেছি—এই ঘটনাকে একটা পশ্চাৎটান মূলক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করাই বোধহয় শ্রেয়।

লক্ষণীয় এই যে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে তার ভুল-ভ্রান্তি গলদ ও দুর্বলতা আবিষ্কারে সদা সচেষ্ট ছিলেন। সমালোচনায় তিনি অসহিষ্ণু হতেন না বরং পরম ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করতেন। লেখক-সত্তাকে সব দিক দিয়ে

নিখুঁত করে তোলবার জন্য তাঁর যত্নের অবধি ছিল না এবং ক্রমাগত আত্ম-পরীক্ষা আর আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হতে হতে তিনি আপনাকে শিল্পোৎকর্যের শীর্ষ বিন্দুতে স্থাপন করবার অক্লান্ত সাধনায় নিযুক্ত রেখেছিলেন। অহংকারকে তিনি শিল্পসাধনায় সার্থকতার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক মনে করতেন। আত্মপ্রেম তাঁর চোখে ছিল বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন—"কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই। এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো ?"

কিংবা তাঁর এই উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "হঠাৎ একটা গল্প লিখে মাসিকে ছাপিয়ে কি কেউ লেখক হতে পারে ? হাত মক্‌স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্‌স করতে হয়। কেরাণীর বেশী খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত কেউ একটি ছোটখাট লেখকও হতে পারেননি। হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে, না পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিস। এ সাধনার সূত্রপাত কিভাবে হয়। অনেক সাহিত্যিকের জীবনে তার চমকপ্রদ উদাহরণ আছে।" কিংবা "সাহিত্য করার আগে" প্রবন্ধের এই উক্তিঃ "...হঠাৎ কোন লেখকই জন্মায় না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না।"

অথবা প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করতে নিয়ে মাণিক প্রতিভার যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টিকোণের মৌলিকতা সুপরিস্ফুট। প্রতিভা-কেও তিনি সাধনার পরিণামফল বলে মনে করেন, জন্মার্জিত সংস্কার বা নৈপুণ্যের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই বলে তাঁর ধারণা। অর্থাৎ প্রতিভা সাধনালব্ধ ও তথাকথিত "অশিক্ষিতপটুত্ব" বা স্বতঃস্ফূর্ততার তত্ত্বের সঙ্গে এর ন্যূনতম যোগও নেই। মানিকের কথা হলোঃ 'প্রতিভা জন্মগত'—প্রতি-ভাবানদের এ প্রত্যয়ের মূলে আছে "আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তা।

অর্থাৎ প্রতিভার তত্ত্বে গতানুগতিক বিশ্বাসীরা দৈব অনুগ্রহের স্বতঃ-স্ফূর্ততার মধ্যে কাল্পনিক নিরাপত্তা খোঁজে, রহস্যময়তার অলীক রোমাঞ্চ অনুভব করে। সাহিত্যের শক্তি যে স্বর্গীয় ফলের মত আকাশ থেকে টুপ করে ঝরে-পড়া পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, তার জন্য কঠিন শ্রম করতে হয়—এই সত্যে তাঁর আস্থা ছিল খুবই সুদৃঢ়। তাই পর্ব থেকে পর্বান্তরে উত্তরিত হবার জন্য তিনি সুকঠোর তপস্যার শরণ নিয়েছিলেন, অনায়াসসাধ্য কিংবা অবলীলায়িত উন্নতির সম্ভাবনাকে মোটেই আমল দেননি। তপস্যা অর্থে যন্ত্রের তপস্যা নয়—আত্মজ্ঞান, আত্মসমালোচনা, আত্মপরীক্ষার তপস্যা, বিরাম-

বিহীনভাবে অনবরত নিজেকে নিজে সংশোধনের তপস্যা, নিরন্তর চেষ্টা ও যত্নের মধ্য দিয়ে তিনি লেখক হিসাবে যতদূর সম্ভব আপনাকে নিখুঁত করে তোলার ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন।

এই মানদণ্ডে বিচার করলে বোঝা যাবে মানিক তাঁর প্রথমার্ধ পর্বের রচনাপ্রয়াসকে ভুলভ্রান্তিময় বলে বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় পর্বের রচনা-প্রয়াসকে সত্যের অধিকতর সমীপবর্তী বলে মনে করেছেন। আত্মজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়েই তিনি এই উপলব্ধিতে পেঁছেছিলেন। তাঁর এই নিবিড় উপলব্ধির অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস রচনার কাল (১৯৩৬) থেকে। তারপর শহরতলী উপন্যাসে (১৯৪০) এই চেষ্টা আরও বেশী দানা বাঁধে। অতঃপর দর্পণ (১৯৪৫), চিহ্ন (১৯৪৭) প্রভৃতি উপন্যাসে আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বহির্মুখী সামূহিক দৃষ্টিতে রূপান্তর সম্পূর্ণতা পায়। শেষ দশ বছরের লেখা ছোট গল্পগুলি তো মানিকের লেখক-সত্তার মৌলিক রূপান্তরের দলিল বিশেষ।

উপরে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হলো তার সবই 'লেখকের কথা' বই থেকে উৎকলিত। অন্যান্য বইয়ের ভূমিকা থেকেও দু-একটি উদ্ধৃতি উৎকলন করা চলে।

মানিক-সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্র মাত্রেই জানেন মানিক মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রার অন্তর্নিহিত কাপট্য ও ভণ্ডামির প্রচণ্ড বৈরী ছিলেন এবং তার মূল্যবোধগুলির প্রতি ছিলেন বীতস্পৃহ। সমুদ্রের স্বাদ নামক গল্পসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণেও এই বিষয়টির উপর আলোকপাতকারী একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকার কতকাংশ এইরূপঃ "প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে। একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী ও তাতেই মঙ্গল—সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।"

এই 'জানা ছিল না'টাই আসল কথা। এরই মধ্যে নিহিত আছে তাঁর প্রথম পর্ব ও শেষ পর্বের ভিতরকার মৌলিক পার্থক্যের সংকেত। শেষ পর্বে

তিনি অনেক কিছু 'জেনেছিলেন'—মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহায্যে পূর্বেকার অজ্ঞানতাকে বিদ্ধ করে তার বিনাশের মধ্য দিয়ে নূতন উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার পথ খুঁজে বার করেছিলেন।

পূর্বোক্ত ভূমিকারই অন্যত্র তিনি বলেছেন—"...তাই দরদ দিয়ে নির্মম আত্মসমালোচনায় আমি আজও বিশ্বাসী।" এই আত্মসমালোচনা নিরন্তর স্বীয় বুদ্ধিগত ও হৃদয়গত অবস্থানকে যাচিয়ে বাজিয়ে তলিয়ে দেখা, প্রয়োজন হলে পূর্বের অবস্থানকে বর্জন করে নূতনতর অবস্থানে নিজেকে স্থাপিত ও পুনঃসজ্জিত করা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনার এইটেই হলো সবচেয়ে অবধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এমন নির্মম আত্মসমালোচক আমাদের সাহিত্যে খুব কমই জন্মেছেন।

পুনশ্চ

সংকলন ও ভাষ্য

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১· সাহিত্যভাবনায় অস্তিত্ববাদের সমস্যা

আগে সত্তা, পরে অস্তিত্ব। প্রকৃতি ও মানবজাতির অংশ হিসাবে বাস্তবের মোচড়েই মানুষ জানতে পারে তার অস্তিত্বকে। এই সংঘাত ও রূপান্তরের মূল ভূমিকা উৎপাদন ও শ্রম-প্রক্রিয়ার। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের বিকৃত ও মিথ্যা সম্পর্কগুলি মুছে গেলে তবেই জনগণের অন্তর্নিহিত প্রজাতিসত্তা ও সত্য আত্মপ্রকাশ করে—এ কথা কার্ল মার্কসের।

এই ঘটনা গোর্কির 'মা' উপন্যাসের প্যাভেল চরিত্রে, ব্রেখ্‌টের 'কমিউনের দিনগুলি' নাটকে বিপ্লবীদের চরিত্রে মূর্ত হয়েছে। ইতিহাস-দর্শনের বিশ্লেষণে মার্কস যা দেখালেন, গোর্কি ও ব্রেখ্‌ট প্রমুখ মহান শিল্পীরা সৃজনশীল সাহিত্যে তা দেখালেন। কিন্তু জঁ-পল সার্ত্র্‌ তা না পেরে বললেনঃ 'অস্তিত্ব হল সত্তার আগে, এর মানে কি? প্রথমে মানুষের অস্তি, মানুষ হাজির হয়, মঞ্চে প্রবেশ করে, নিজের সংজ্ঞা দেয়। কিন্তু এ সংজ্ঞা হয় না, কারণ মানুষ প্রথমে কিছুই নয়, পরে কিছু হবে এবং সেটা সে নিজেই করবে। মানবস্বভাব বলে কিছু নেই।'

সার্ত্রের এই ভাবনা উনিশ শতকের ডেনিশ দার্শনিক কিয়েকের্গার্ডের অস্তিভাবনা থেকে এসেছে এবং পাশাপাশি এই শতকের জার্মান চিন্তাবিদ্‌ মার্টিন হাইডেগারের সঙ্গে মিলেছে। তবে সার্ত্রের মধ্যে প্লেটোর ভাববাদ-সঞ্চারী ঈশ্বরবিশ্বাস ও আত্মার অবিচ্ছিন্নতার ধারণা নেই। তিনি বললেন,

'Man first is—only afterwards he is this or that—man must create for himself his own essence . . . existence precedes essence,'

অর্থাৎ ব্যক্তিচৈতন্যই তার পরিবেশ নির্বাচন করে। এরই নাম গতিশীল অস্তিতা, নিজেকে অবিরাম অতিক্রম করা, মূল্যায়নের দ্বারা নিজেকে অবিরাম নতুন করে সৃষ্টি করা, সব সময়েই এইটে ভাবা—আমার সাফল্য আমার ব্যর্থতা সবই 'আমার'।

এখানে প্রশ্ন, মানবসত্তা বলে যদি কিছুই না থাকে, তবে নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে কি করে? তার কোন সুযোগই তো নেই! তাহলে সাত্রীয় ভাবনায় নিজের অস্তিত্ব মানে অবক্ষয়ী সামাজিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার উপাদান সঞ্চয় নয় কি? আসলে এক নেতিকে অস্বীকার করতে গিয়ে আর-এক নেতিতে আশ্রয় গ্রহণ। এটাই দেখালেন 'সুসিফার এ্যান্ড গড' নাটকেঃ গ্যেটসের মত মেকি অখণ্ড (ভেক-বিজ্ঞানের মত) মানুষের তথাকথিত রহস্যময়তাই শিল্পের সত্যে পরিণত হল। উল্লেখ্য যে, ব্রেখটও নেতি বা বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন--নদী, গাছ, মানুষ, রাষ্ট্র, এরা আলাদা-ভাবে নিজেদের অবস্থানে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ব্রেখট বলছেন--দর্শন ও শিল্প-সাহিত্যের কাজ ঐ নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা, গাছকে নতুন বীজে পরিণত করা, মানুষকে শিক্ষিত করা এবং রাষ্ট্রকে বদলে দেওয়া—এটাই সৃজনমূলক কাজ ও গঠনমূলক সমালোচনার উদ্দেশ্য। কারণ ব্রেখট মার্কসের মতই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, মানুষ স্বভাবই প্রাকৃতিক এবং প্রকৃতিও মানবিক। বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যখন, এই ঘটনার উচ্ছেদ করেছে, তখন তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। অর্থাৎ নেতি থেকেই ইতির দিকে গতিটা নির্দিষ্ট—এ্যালিয়ে-নেশনের যাত্রাবিন্দু।

প্লেখানভ তাঁর 'আর্ট এ্যান্ড সোস্যাল লাইফ' বইতে বলছেনঃ মানুষ যদি ভাবে তার অহংটাই একমাত্র বাস্তব তবে সে নিজেকে ঈশ্বরের মত ভালবাসে এবং শিল্পে এটাই প্রতিফলিত হয়। বাইরের জগতকে সে এইরকম আত্মগত তৃপ্তির বা অতৃপ্তির নিরিখে দেখে এবং দেখায়।

প্লেখানভ ইম্প্রেশনিস্টদের চিত্রশিল্প সম্পর্কে বললেন, এই আত্মসর্বস্বতা থেকেই ভঙ্গিসর্বস্বতা আসে। কিন্তু লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' ছবির মূল কথা কি নিছক আলো-ছায়ার মায়াসৃষ্টি? কেউ কি এ ছবি দেখে বলবেন, যিশুর চিবুকে, জুডাসের নাকে বা টেবিল-ক্লথে কেমন আলোর বৈচিত্র্য এসেছে দেখো! নাকি 'তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে'--এই নাট্য-মুহূর্তটাই 'আইডিয়া' বা বিষয়বস্তু হিসাবে সমগ্র ছবির ভাষা!

আধুনিক বুর্জোয়া অবক্ষয়ের শিল্পভঙ্গি সম্পর্কে প্লেখানভ কিউবিজম-এর উল্লেখ করে বললেন—

"The reader has of course heard of the so-called cubists. In me, at any rate, they do not evoke anything resembling aesthetic enjoyment. 'Nonsense cubed!' are the words that suggest themselves at the sight of these ostensibly artistic exercises. But cubism, after all, has its cause. Calling it nonsense raised to the third degree is not explaining its origin . . . Before me lies

an interesting book : Du cubism, by Albert Gleizes and Jean Metzinger. Both authors are painters and belong to the cubist school. Let us hear what they have to say. How do they justify their bewildering creative method :

There is nothing real outside of us . . . it does not occur to us to doubt the existence of the objects which act upon our senses; but reasonable certainty is possible only in respect to the images which they evoke in our mind."

প্লেখানভ বুর্জোয়া ব্যক্তিসর্বস্বতার এই অবক্ষয়ী পরিণামের উৎস হিসাবে সাধারণভাবে মানবজাতিকেই 'ব্যক্তিত্ব' বলা বা কান্টের 'ট্রানসেনডেন্টাল আইডিয়ালিজম'কে যা 'সফিস্টীয় ব্যক্তিতার' স্বীকৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন।

মনীষী রোঁমা রোলাঁ ১৯৩৪ সালে ১০ই জুন ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী প্রভাবে আচ্ছন্ন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্তি ও বিকৃতির প্রতি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে চলো' প্রবন্ধের এক স্থানে বলছেনঃ "ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে স্বার্থপরের মত ভয় পেয়েছে। কমিউনিজমকে অলীক ভেবে তার ছায়া নিয়ে একদিন তারা খেলা করেছিল, আজ তার প্রকৃত চেহারা দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।···তরুণদের মধ্যে 'বিপ্লব' শব্দের একটা বড় আকর্ষণ আছে। তাই তারা তরুণদের কাছে বাকচাতুর্যে প্রমাণ করতে লেগে গেল—প্রকৃত বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রভুত্বই বিপ্লব। ফ্রান্সে এরই গালভরা নাম দিয়েছে 'মনের বিপ্লব'।...সাম্যবাদী সমাজ যখন আজ তার বিকাশের পথে আরো গভীরতা, বিস্তৃতি ও আরো স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়েছে, তখন তাদের ভয় কিসের? কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর আগে যারা জন্মেছিল তারা তাদের গ্রহটির অচল স্থায়িত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসন থেকে খসে পড়ার ভয়ে আতঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল শূন্যের অসীমত্ব প্রচার হলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

মানুষের ব্যক্তিতার ক্ষেত্রেও মিথ্যা ও সত্য দুটোই রয়েছে। প্রথমত, আমি আমার অহং নিয়ে, দ্বিতীয়ত, আমি সমস্ত মানুষের সঙ্গে মিশে রয়েছি। গ্যালিলিওকে যারা দণ্ড দিয়ে পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করতে চেয়েছিল, আজকের প্রতিক্রিয়াশীল অহংবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাদেরই জ্ঞাতিভাই। নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা আজ মানুষের বিবর্তনের অনিবার্যতাকে বাধা দিতে চাইছে।

এই বিতর্কে 'ইলিউসন এ্যান্ড রিয়ালিটি'র স্রষ্টা ক্রিস্টোফার কডওয়েল অংশ নিয়ে বলছেন—"শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে অবশ্যই তার গতিশীল নীতি রয়েছে, যেটা তার ট্রাজিডির, সৌন্দর্যের, তার তৃপ্তির এবং তার

সৃজনশীল শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। আদিম সংস্কৃতির ট্র্যাজিডি হল শক্তিধর বর্বর পশুর, পশুপালন সমাজে দেবতাদের (পুরাণ কাহিনীর) ট্র্যাজিডি, সমস্ত শ্রেণী-সমাজে ট্র্যাজিডির প্রকাশ ঘটে নায়কের ইচ্ছাশক্তির—বুর্জোয়া সমাজের শৈশবকালে রাজপুত্রদের এবং শেষদিকে এই ট্র্যাজিডির প্রকাশ ঘটেছে জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস'-এ এবং সম্পূর্ণ ফ্যান্টাসি জগতে বিভোর 'আমি'তে।...আজ শিল্পের ট্র্যাজিডি হল উবে যাওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়া। আজ সেই ট্র্যাজিক 'আমি' নিজেই জানে না কী তার বাসনা, আজ অবচেতন আমি নিজেই জানে কী তার দাসত্ব!

স্বাধীনতার ধারণায় প্রক্রিয়ায়িত সমস্ত শিল্প সেই যুগের বিশিষ্ট সমাজেরই সৃষ্টি। বুর্জোয়া শিল্পে মানুষ তার বহির্জাগতিক বাস্তবতার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু নিজের সম্পর্কে নয়। কারণ ব্যক্তিকে তার সেই সামাজিক সম্পর্কে অচেতন রাখা হয় যে-সমাজ তাকে গড়েছে। সে তখন আধা-মানুষ মাত্র।

কমিউনিস্ট শিল্পই হল অখণ্ড, কারণ একমাত্র এতেই মানুষ তার নিজের সম্পর্কে এবং বহির্জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

শিল্প ও মানুষের অখণ্ডতা অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় কেন ও কিভাবে হওয়া সম্ভব নয় সেটার ইঙ্গিত করে প্লেখানভ বলেছেন—

"The ancient thinkers—Plato and Aristotle, for example—were fully aware how a man is degraded when all his vital energies are absorved by concern for his material subsistence. The present day ideologists of the bourgeoisie are also aware of it . . . They see the solution of the problem. Where the ancient thinkers saw it, namely in the enslavement of the producers by a fortunate few who more or less approach the ideal of 'superman'. But if the solution was conservative even in the days of Plato and Aristotle, now it is arch reactionary . . . Decadents who are not devoid of political interests are often ardent admirers of Nepolean I . . . If you live with the wolves, you must howl with the wolves. The modern bourgeois esthetes profess to be waring against philistinism, but they themselves worship the gold calf no less than the common or garden philistine" (Art and Social Life).

২. প্লেখানভ ও কডওয়েল: কিছু বিতর্ক

ক. ক্রিস্টোফার কডওয়েলের আগে জ্যাকসন, হিউম ও রিচার্ডস প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচক সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু

তাঁরা বেশি দূর বা বেশি গভীরে যেতে পারেননি। জ্যাকসন ভাষার প্রশ্নে সামাজিক ও ক্রিয়াত্মক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিলেন, হিউম 'শতশত সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃংখলে বাঁধা মানুষের পক্ষে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস অর্থহীন' বলে নির্দেশ করলেন, রিচার্ডস সামাজিক মানুষের ব্যক্তি-প্রবণতার নিয়ন্ত্রণে আর্টের ক্রিয়াত্মক ভূমিকাকে 'সিনাএসথেসিস' বলে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু এ'দের মধ্যে কেউই কার্য-কারণ সম্পর্কের গভীরে গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ইতি-বাচক সমাধানের সূত্র দিতে পারেননি। অবশ্যই এ'দের এই সব পর্যবেক্ষণ প্লেখানভ ও কডওয়েলের নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণার রসদ যুগিয়েছে নিঃসন্দেহে। উল্লেখযোগ্য যে, এ'রা মার্কসবাদী না হয়েই এত দূর পর্যন্ত এসে শিল্প-সাহিত্যের প্রচলিত কল্পলোকে বেশ জোর ঝাঁকানি দিয়েছিলেন।

প্লেখানভ তাঁর 'আর্ট এ্যান্ড সোস্যাল লাইফ' গ্রন্থে বললেন—(১) উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবহারিক উপকরণ, কলাকৌশল, ও উৎপাদনের সম্পর্কগুলি সামাজিক মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই থেকেই গড়ে ওঠে মানসিক গড়ন; (২) আদিম সমাজেই অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও শিল্পকর্মের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে উন্নত ধরণের উৎপাদনগত প্রযুক্তির প্রভাবে সেই সম্পর্ক হয়েছে অপ্রত্যক্ষ, এ পর্যায়ে নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের বিচার করতে হবে; (৩) যখন কোন প্রতিভাবান শিল্পী সামাজিক মানুষের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা ও অলীক ভাবাদর্শের তাগিদে কাজ করেন, তখন তিনি নিজেরই কাজ পণ্ড করেন। যে শিল্পী বুর্জোয়াদের সমর্থনে প্রলে-তারিয়েতের সংগ্রামের বিরুদ্ধে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁর মতাদর্শ কখনই প্রকৃত সত্য হতে পারে না।

প্লেখানভ যেখানে বললেন, শিল্প-সাহিত্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ক্রিস্টোফার কডওয়েল তখন এই প্রক্রিয়াকে আরও সম্প্র-সারিত করে বললেন, শিল্প-সাহিত্য অর্থনীতিরই অংগ, শুধু উৎপাদনের ফল বা উৎস নয়। যদিও আদিম সমাজে এটা বেশি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, তবু বরাবরই শিল্প-সাহিত্যের রয়েছে একটা কার্যকর ভূমিকা। কডওয়েল বললেন, 'যন্ত্র যেমন একটি নতুন কাজে মানুষের হাতকে খাপ খাইয়ে নেয়, তেমনি শিল্প-সাহিত্যও মানবমনকে একটি নতুন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার তাগিদ দেয়।' এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু খটকা লাগে তখনই, যখন তিনি হাতের সঙ্গে 'চিরন্তন মানবহৃদয়'-এর বা অপরিবর্তনীয় আবেগের কথা মিলিয়ে দেন। অবশ্য শিল্পের সামাজিক চলাচল বোঝাতেই এটা করলেন বোঝা যায়।

প্লেখানভ যেখানে দেখালেন, শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক ও ক্রিয়াত্মক বৈশিষ্ট্য, কডওয়েল সেখানে সামাজিক ইতিহাসের ধারা বা মাত্রা সংযোজন

করেছেন, অবিচ্ছিন্ন ভূমিকার কথা বলেছেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও তার প্রভাব পড়ে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব মোচনে এবং ব্যক্তিমানসের সামাজিকীকরণে, যে-ঘটনাকে তিনি 'স্টাডিজ ইন ডাইং কালচার-এ মা ও ভ্রূণস্থ শিশুর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন, অর্থাৎ প্রশ্নটা কেবলই নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তিরই নয়, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র উদার ও বিস্তৃততর—অতীত ব্যবস্থার রেশ, বর্তমানের প্রভাব এবং ভবিষ্যতের চাহিদা ও স্বপ্ন—সব মিলেই শিল্পের সত্য।

খ. এঙ্গেলসের 'ফ্রিডম ইজ দি রিকগ্নিসন অব নেসেসিটি' তত্ত্বের অনুসরণে কডওয়েল যেভাবে শিল্প-সাহিত্যের মুক্তিকামী প্রয়োজনীয়তা ও কার্য-কারণ সম্পর্ককে গভীরতা ও ব্যাপ্তি দিয়েছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে বিশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশে, বিশেষ করে প্যাভলভের 'কনডিসন রিফ্লেক্স' তত্ত্বের আবিষ্কারে। তিনি বললেন, শিল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু এটাই প্রমাণ করা নয় যে, সামাজিক সত্তাই মানুষের চেতনা। তাছাড়া এটা কোন নির্দিষ্ট ও বিশুদ্ধ চেতনাও নয়। শিল্পের প্রয়োজন এইজন্য যে, তা পরিবর্তনশীলতার ধারায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সামাজিকীকরণ ঘটায়, যা সমাজবদলের পূর্বশর্ত।

এখানেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অপরিহার্য ভূমিকা। একদিকে মানছি—'সব যুগে সব শ্রেণী-সমাজে শিল্প-সাহিত্য হল শ্রেণীগত প্রবণতার প্রতিফলন', আবার এটাও সত্য—সব যুগে সব জাতির মধ্যেই শোষিত শ্রেণী রয়েছে এবং তার গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে কাজ করে যাচ্ছেই।

গ. কডওয়েলের সাহিত্যভাবনার দুটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, কবি, কবিতাপাঠের অবস্থা এবং পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে পরিবর্তনকামী চলাচল মিলেই কবিতার সামাজিক মূল্য নির্ধারিত হবে।

এই ঘটনার সঙ্গে ব্রেখ্টের গেস্টুস পদ্ধতির মিল পাওয়া যায়, যেখানে অভিনেতাও যেমন নাটকের ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে বদলাবেন, দর্শকও তেমনি বদলে যাবেন, অথবা এমনও হতে পারে, অভিনেতা নিজেকে বদলানোর বাস্তব পরিস্থিতি পেয়েও বদলাচ্ছে না দেখে দর্শকরা বদলানোর তাগিদ বোধ করছে কিংবা বদলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কডওয়েল তাঁর 'ইলুসন এ্যান্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থের শেষ পর্বে বলেছেন—বিপ্লবী সংগ্রামে ইতিবাচক ভূমিকা রাখাই শিল্পের কাজ। এতে কিছু নন্দনতাত্ত্বিক সংকীর্ণতার দোষ ধরেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ী সমাজে বুর্জোয়াদের যখন গঠনমূলক কিছুই দেবার থাকে না, তখন বিপ্লবী সংগ্রামের রসদ যোগানো ছাড়া প্রকৃত শিল্পীর অন্য আর কী কাজ থাকতে পারে? অবশ্য এই বিষয়ে কডওয়েল দুটি নির্দেশ

রেখেছেন—সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা মজবুত করতে ও বাড়াতে হলে পাঠক সমাজও বাড়াতে হবে, যারা বঞ্চিত অথচ সংগ্রামশীল তাদের মধ্যে সেই রসদ ছড়াতে হবে। এ ছাড়া তিনি আরও বললেন, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের শিল্প-সাহিত্যের বিপ্লবী উপাদানগুলি যখন বিপ্লবী শ্রেণীর সামনে তুলে ধরেন তখন এটা মনে করার কারণ নেই, প্রাক-বিপ্লব যুগে সেগুলিই সর্বহারা সাহিত্য-সংস্কৃতি। বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিস্ট চেতনার অঙ্গীভূত হতে বেশ সময় লাগে, যে-চেতনা বিপ্লবী শ্রেণীর নিজস্ব উত্তরাধিকার।

৩· অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পভাবনা

[বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর আলোকে]

শিল্প ও শিল্পতত্ত্ব এক নয়। প্রথমটির আবেদন অনুভূতির কাছে, পরেরটির বুদ্ধির কাছে। অবশ্য দুই মিলেই শিল্প-পরিচয়।

শিল্প ভোক্তার কাছে আস্বাদ্য হলেও তা প্রকৃতির অনুকরণ নয়, স্বভাবতই স্থূল ইন্দ্রিয়ের আস্বাদনযোগ্য নয়। আবার শিল্পতত্ত্বের যে সত্য তা বুদ্ধি-গ্রাহ্য এবং তা জড়বাদী শাস্ত্রীয় বুদ্ধি নয়—পরিশীলিত র‍্যাশনাল বুদ্ধি।

প্রখ্যাত ভারতীয় শিল্পতাত্ত্বিক কেন্টিশ্‌ কুমারস্বামী যখন অবন ঠাকুরের শিল্পকে 'খাঁটি ভারতশিল্প' বলেন, তখন অবনীন্দ্রনাথের 'শিল্পের অধিকার'-এ নিজের জবানীতেই পাচ্ছি, 'সূর্যের কণা দিয়ে কোণারক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে তাজ—' এগুলি ভারতীয় বলেই কি শুধু আমাদের ? আসলে আমাদের শিল্পের অধিকার তখনই এলো যখন বিশ্ববাসী বলল—এ শিল্প আমাদেরও।' শিল্পের আর এক নাম যে 'অনন্যপরতন্ত্রা', এই অর্থেই সার্থক।

শিল্পের রহস্য সম্পর্কেও অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসরণে নিছক ভারত-শিল্পের ব্যাখ্যা নাকচ হয়। যেখানেই চলা ও নির্মাণ সেখানেই সংগ্রাম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুখে, ইউরোপ-জাপান-চীন-ইন্দোনেশিয়া হয়ে ভারতের শিল্পরীতি—রাজপুত গ্রীক সব পথের বাঁক পেরিয়ে তবেই মানব-শিল্প। কাজেই এ মানব ও তার শিল্প কি শুধুই ভারতীয়? অবনীন্দ্র-নাথের যে অনন্য ভারতশিল্প তা শেষবিচারে আনন্দবর্ধন, আরিস্টটল ও বেনেদেত্তো ক্রোচের শিল্পভাবনারই সমীকরণ। তাঁর শিল্প ও শিল্পভাবনাকে যে 'সিংক্রিটিজম্‌' বলা হয়, তার কারণ তিনি শিল্পসৃষ্টির রহস্যকে জন্মগত বা প্রথাগত বলে স্বীকার করেননি। তিনি মনে করেছেন, শিল্প হল অর্জন-সাপেক্ষ এবং শুধু অর্জন করলেই হবে না, আত্মস্থ করতে হবে—ইউরোপ-

চীন-জাপান-রাজপুত-মুঘল সবকিছুই। এই অর্থে তাঁর কাছে ভারত-শিল্প বিশ্বজনীন।

সূত্রাকারে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন ও প্রসঙ্গঃ শিল্পী তাঁর কাজে কি সৌন্দর্যকে পুনরাবিষ্কার করেন? রঙতুলি কি বাস্তবের অনুবাদ করে? বাস্তব কি? তা কি বস্তুসত্যের উপলব্ধি নয়?

অবন ঠাকুরের লাবণ্যতত্ত্ব আনন্দবর্ধনেরই ব্যাঞ্জনা যা বাস্তবের অনুকরণ নয়। পশ্চিম আকাশে সূর্যের রঙে যে দুঃখবিরহ ফোটে তাতেই উমার পতি-গৃহে যাত্রার 'মুড' ফুটে ওঠে। এই রূপকল্প তো প্রকৃতি অনুকরণ নয়! 'ছবি ও সৃষ্টি'তে বললেন, পশ্চিম আকাশের ঐ সূর্যাস্তের পটভূমিকা ছাড়া, শিল্পীর রঙতুলির স্পর্শ ছাড়া ঐ চিত্রকল্প বা 'উমার পতিগৃহে যাত্রা' কোন অনুভূতিই জাগাতে পারে না। ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি ছাড়িয়ে এক নতুন মানসলোকে তার তৃতীয় নয়ন আবিষ্কার করল সুন্দরকে।

এইজন্যই ফোটোগ্রাফী বা হরবোলার বুলি শিল্প নয়। নিয়ম মেনে নিয়মিত অভ্যাস করলে এসব হয়, কিন্তু শিল্প হয় না। আনন্দ থেকে এবং আনন্দের লক্ষ্যে সৃষ্টির উৎসারণ--এর ব্যাখ্যায় যা বললেন তার মর্মার্থ--আরিস্টটলের মাইমেসিস-এর মতই শিল্পতত্ত্বের প্রক্রিয়া 'নিয়তিকৃত নিয়ম-রহিত'-এর প্রক্রিয়া, যা ইউরোপীয় বস্তুবাদকে বা কপি থিয়োরি'কে অস্বীকার করেছে। তিনি বললেন, ভোজ্য বস্তুর স্বাদ লবণে শিল্পের স্বাদ লাবণ্যে।

এই লাবণ্য সৃষ্টি কি ইচ্ছানির্ভর? না, তা হল লীলা। চীনা শিল্পে পটের হোয়াইট-ওয়াশ্ অংশ ও রঞ্জিত অংশের যথাযথ মাপ ও বিন্যাসের উপরই ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে। তাঁদের কথায়—ঘরের সাজ-সজ্জায় উপকরণ-আসবাবের বাহুল্য থাকলে ঘরটাও যেমন মাপে ছোট হয়, মনটাও তেমনি ছোট হয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথের মতে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের এই যে সাঙ্গীকরণ-প্রক্রিয়া, এরই নাম শিল্পের লীলবাদ। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' এবং ক্রোচের 'ডি-সাবজেক্টিফিকেসন অব সাবজেক্টিভিটি।' এইভাবেই 'মেঘদূত'-এর মেঘের মুখে ভাষা ফুটেছে, মেঘকে মানুষের শরীর দিলে তবেই সে প্রিয়ার কানে প্রাণের কথা পেঁছে দেয় (শিল্প ও দেহতত্ত্ব)।

বার্ট্রান্ড রাসেল যে-অর্থে দর্শনচিন্তাকে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একই অর্থে শিল্পসৃষ্টিকে বচন ও অনির্বচনের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া বলেছেন। 'রস ও রচনার ধারা' প্রবন্ধে বললেন—'রস জিনিসটা অনির্বচনীয়, সুতরাং তার ক্রিয়ার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দিক রয়েছে। কিন্তু কেমন করে রস হবে, এটা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু শিল্প-প্রক্রিয়ার সবখানিই অনির্বচনীয় থাকতে পারে না। তাহলে হলে কাজ

চলে কি করে?' এরই সূত্র ধরে 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' রচনায় বললেন—'চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে চোখে দেখতেন, একমাত্র চীন ও জাপান ছাড়া আর কোন জাত সেই চোখে দেখেছে বলে আমরা অন্তত জানি না। শিল্পচর্চার সঙ্গে শিল্পশাস্ত্র চর্চার বহুল প্রচার ও পাণ্ডিত্যের এই টীকা হাতে শিল্পশাস্ত্রের বই পড়তে বসলে বাঁধনগুলোই চোখে পড়ে; কিন্তু বজ্র-আঁটুনির ভেতরে-ভেতরে ফস্কা গেরোগুলো আচার্যগণ, শিল্পের অমরত্ব কামনা করে, সযত্নে সংগোপনে রেখে গেছেন তার দিকে দেখি না অনবধান-বশত। তাঁরা তো এটাও বলেছেন—পূজোর প্রতিমা গড়ায় শাস্ত্র মানবে, কিন্তু অন্য মূর্তি গড়ায় নয়।

শিল্প কি 'অকারণ পুলক'? লীলা কি উদ্দেশ্যহীন? অথবা কান্টের 'পারপাসিভনেস্ উইদাউট পারপাস্'-এর সঙ্গে অবনীন্দ্রভাবনায় প্রতিফলিত আনন্দবাদ কি পুরোপুরি এক?

জাতীয় শিল্প এবং শিল্প-প্রকরণ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে আলোচ্য প্রশ্নের কিছুটা হদিশ মিলবে। ধনসম্পদ বাড়লে বিদ্যাও বাড়ে, এটা যেমন ভুল, তেমনি জাতির উৎকর্ষকে শিল্পের উৎকর্ষ ভাবাও ভুল। এখানেই ক্রোচের সঙ্গে তাঁর অমিল। ক্রোচে শেষজীবনে 'মাই ফিলসফি'তে বলেছেন—জাতীয় জীবনসাধনা যেমন নৈতিক, তেমনি শিল্প-সাধনাও নৈতিক কাজ। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাতি ও শিল্প' প্রবন্ধে বললেন—'জাতির সঙ্গে শিল্পের বিবাহ হল রাক্ষস-বিবাহ। জাঁতার সঙ্গে মণি-মুক্তার বিবাহ দিলে যা ফল হয় সেই রকম ব্যাপার হচ্ছে জাতীয় শিল্প।'

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে চর্চা ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিরুচির প্রাধান্য স্বীকার করলেও যা তিনি স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি, তা হল—জাতি যদি তলিয়ে যায় তবে সেই তলানির ঐতিহ্যটিই জাতীয় শিল্পের ঐতিহ্য হিসাবে দাবি করতে পারে কি? মনীষী রোমাঁ রোলাঁও এই অর্থে প্রকৃত শিল্পকে জাতি অনুগামী নয় বলে নির্দেশ করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ রীতিবাদীদের মত প্রকরণ বা আঙ্গিককেই কাব্যের আত্মা বা শিল্প বলতে নারাজ হলেও, প্রকরণের যথার্থ স্থানটি নির্দেশ করেছেন শিল্পের নির্মাণে। প্রথমত, প্রকরণ হল শিল্পের উপায়, দ্বিতীয়ত, প্রকরণের বা আঙ্গিকের দিকটা হল শ্রমের দিক, তৃতীয়ত, এই শ্রম ধাত্রীর শ্রম নয়, জননীর শ্রম, কারণ তার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দটাও রয়েছে, যত্ন ও অনুভূতিও মিশে থাকছে। যেখানে শ্রমের সঙ্গে যত্ন রইল সেখানেই সুন্দরের আসন পাতা হল, আর যা শুধু শ্রমের কসরৎ বা ওজনটাকেই জাহির করতে ব্যস্ত, সেখানে প্রকাশ পেল উদ্ভট।

কাজেই জাতির অধিকাংশ সদস্য যদি অবক্ষয়ী ধারায় গা ভাসায়, তবে

শিল্পকে 'জাতীয়' হবার জন্য তারই অনুগামী হতে হবে, তার কোন মানে নেই। বরং প্রকৃত শিল্পী তা করেন না। কাজেই সেক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব-মূলক সম্পর্কে ও কল্যাণকামী উদ্দেশ্য থেকেই যায়। তাছাড়া প্রকরণের বেলাতেও শ্রম ও যত্নের প্রক্রিয়া কাজ করে, যার অভাবে সৃষ্টি সার্থক হতেই পারে না।

৪· গ্যেটে মূল্যায়নে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস

এই পুঁজিবাদী দুনিয়াটা বদলাতে হবে—শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সত্তা ও ঐতিহাসিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করে যে বছর মার্কস-এঙ্গেলস 'কম্যুনিস্ট ইস্তাহার'-এর খসড়া রচনা করেন, সেই বছরেই ১৮৪৭ সালে লণ্ডনে বসে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস 'কাব্যে ও গদ্যরচনায় জার্মান সমাজতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ-সমালোচনামূলক নিবন্ধ লেখেন। 'গরীবের গান' নামে কার্ল বেক-এর একটি কবিতার বই এবং 'মানবতার দৃষ্টিতে গ্যেটে' নামে কার্ল গ্রোয়েনের একটি প্রবন্ধের বই একত্রে সমালোচনা করেন। দুই সাহিত্যিকই ছিলেন তখনকার ভাবপ্রবণ সমাজতন্ত্রী শিবিরের প্রবক্তা। এ'রা মুখে সমাজতন্ত্র প্রচার করতেন, কিন্তু কার্যত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আগল বানাতে সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি গ্যেটেকেও এ'রা নিজেদের পক্ষে দাঁড় করিয়ে 'জাতে ওঠার' ভান করলে এঙ্গেলস আলোচ্য নিবন্ধে একই সঙ্গে তাদের মুখোশ খোলেন এবং গ্যেটের প্রকৃত ঐতিহাসিক অবস্থানটি তুলে ধরেন।

১৭৪৯ সালে গ্যেটের জন্ম। দুই দশক আগে জন্মেছেন দার্শনিক কান্ট, সাহিত্যক্ষেত্রে লেসলিং, শিলার ও ফিকটে ছিলেন গ্যেটের সমকালীন—সংস্কৃতি জগতে এক মহা-আলোড়নের কাল। এই ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগেই গ্যেটে রচনা করেন জার্মানীর কৃষক যুদ্ধের (১৬শ শতাব্দী) পটভূমিকায় বিদ্রোহী নাটক, বাঁধা রীতির বাইরে একাধিক রোমান্টিক উপন্যাস। কিন্তু এই একই সময়ে তিনি ভাইমার রাজসভার মন্ত্রণাদাতা ও নাট্যশালার অধিকর্তা ছিলেন, এমন কি বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণও করেছেন।

গ্যেটে ফরাসী বিপ্লবকে সমর্থন জানাতে না পারলেও 'ফাউস্ট' নাটকে বিদ্রোহী তারুণ্যের জয় ঘোষণা করেছেন, যদিও মুখে বলতেন—'ও সব রোমান্টিসিজম্ হল ব্যাধি।'

এঙ্গেলস-এর কাছে গ্যেটে আদৌ সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'দি গ্রেটেস্ট অব জার্মানস।' আলোচ্য নিবন্ধে বলছেনঃ

"...গ্যেটে কোন সময়ে বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, কখনো সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ঘৃণা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, যেমন 'ইফিজেনি' নাটকে। তাঁর প্রমেথিউস ও ফাউস্ট এ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আবার 'মেফিস্টোফিলিস' রূপে তীব্রভাবে ব্যঙ্গাত্মক। আবার তিনি এই সমাজের সঙ্গে মিতালীও করেন, এ সমাজের প্রশস্তি করেন, যেমন 'মাস্কেনজুয়েস' বইতে। যখনই ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলেছেন, তখনই দেখা যায় বর্তমান সমাজ সম্পর্কে একটা প্রহরীর ভূমিকা প্রকাশ পেয়ে যায়।...ফলে এই মুহূর্তে তিনি বিরাট, পরমুহূর্তেই খুবই ছোট।

এঙ্গেলস তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"গ্যেটের মত মানুষও সমকালের জার্মান সমাজের হীনতাকে অতিক্রম করতে পারেননি, উপরন্তু সেই হীনতা ও কদর্যতাই তাঁকে জয় করেছিল।..শিলার এই হীন কদর্য জগত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন কান্টের কল্পিত ভাবরাজ্যে; গ্যেটের পক্ষে ঐভাবে পালানো ধাতে সয়নি। তাঁর মনে হয়েছে, ঐভাবে পালানও এক ধরনের অলৌকিক হীনতার আশ্রয় নেওয়া। কাজেই এই রকম টানাপোড়েনের চাপ বয়সকালে সইতে না পেরে শেষে ভাইমার রাজসভার মন্ত্রীটির আড়ালে সরে গেলেন।"

এঙ্গেলস বলছেন—"জার্মানির স্বাধীনতার জন্য গ্যেটের কোন উৎসাহ জাগত না বলে তাঁর সমালোচনা করছি না। আসলে সমস্ত রকম সামাজিক আলোড়নের মধ্যে তাঁর যে পেটি-বুর্জোয়া আতঙ্ক ছিল এবং তারই কারণে যে তিনি বারে বারে তাঁর নান্দনিক সম্পদ খুইয়ে বসেছেন—এটাই সমালোচনার বিষয়! তিনি রাজসভার অমাত্য ছিলেন, এটা দোষের নয়। কিন্তু নেপোলিয়ন যখন রাজতন্ত্রের জঞ্জাল সাফাই করছেন ইউরোপ জুড়ে, সেই সময়ে রাজসভার তুচ্ছ ও জাঁকজমকপূর্ণ বিষয়গুলোর উমেদারীতে তিনি অত মনোযোগ দিলেন, এটাই বক্তব্য।"

দেখা যাচ্ছে, এঙ্গেলস-এর এই সাহিত্যভাবনা কোন নৈতিক বা উদার মানবিক দৃষ্টিকোণের উপর দাঁড়িয়ে নেই, সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার দৃষ্টান্ত।

৫· সাহিত্যে বাস্তবতার প্রশ্ন ও গোর্কির সাহিত্যভাবনা

সাহিত্যে বাস্তবতার প্রশ্নে অংশগ্রহণের চোখ, আর দর্শকের চোখ, এই দুই ধারার ইতিহাস রয়েছে। লেখকদের সামাজিক অস্তিত্ব এবং তাঁদের সৃষ্টি মূলত শ্রেণীনির্ভর, যদিও কোন কোন সৎ ও প্রতিভাশালী স্রষ্টা নিজের শ্রেণী-আবরণ ছিঁড়ে সমাজবাস্তবতার গতিশীল শক্তির ছন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। এই কারণেই ম্যাকসিম গোর্কির একটি ফ্যান্টাসিতে পাঠক বা

নিজেরই আন্তরসত্তা প্রশ্ন করছে—"মনে হয় তুমি বলবে, এই জীবনের কোন প্যাটার্ন নেই, আসলে আমরাই তার যথাযথ রূপ দিই। না, এভাবে বলো না। লেখার ক্ষমতা নিয়ে জীবনের সামনে নিজের বন্ধ্যাত্ব ও তাকে অতিক্রম করার অক্ষমতার কথা বলা সত্যিই লজ্জার!"

ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজের উন্মেষ ও বিকাশের পর্বে, অর্থাৎ ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত—সুইফট, ডিফো থেকে গ্যেটে, বালজাক সবাই ছিলেন সমগ্র সমাজ-আন্দোলনের দায়বদ্ধ ও অংশগ্রহণকারী স্রষ্টা। এ'রা কেবলই লেখার জন্যই লেখেননি, নানামুখী সংগ্রামী বন্ধনের সংগে নিজেরা ছিলেন জড়িত এবং তারই বাস্তব প্রতিফলনে উজ্জ্বল তাঁদের সৃষ্টি। বলা দরকার, এই শরিকত্ব তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে ঘটেনি: চারিত্রিক মেজাজে গ্যেটের চেয়ে এমিল জোলা বেশি জঙ্গী থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিষণ্ণতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয় দর্শকের চোখই ফুটেছে বেশি। এই প্রসঙ্গে জর্জ লুকাস তার 'স্টাডিজ ইন ইউরোপীয়ান রিয়ালিজম' গ্রন্থে বলছেন--

"But it is the social surroundings which determine the degree to which intricate and combative relationship can arise between the writer and society, such as those which resulted in a life so rich in experience as that of Goethe. It depends on whether the society in which the writer lives contains historically significant social and ideological trends to which the writer can dedicate himself with all the fervour of his personality."

সামন্ততন্ত্রের প্রতিবাদী হিসাবে যে উন্মেষকামী সুস্থ বুর্জোয়া মূল্যবোধের পরিমণ্ডল অতীতের ঐতিহ্যে ফ্লবেয়ার, জোলা বা মোপাসাঁর শৈশব জীবনের গঠনে কাজ করেছে, পরবর্তী স্তরে এসে যখন সেই মূল্যবোধগুলি বুর্জোয়া সভ্যতার আভ্যন্তরীণ সংকটে, নবজাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর নতুন মূল্যবোধের মুখে ক্ষয়ে যাচ্ছে ও ভেঙে পড়ছে তখন ঐ সব বুর্জোয়া লেখক-শিল্পীরা কোন পক্ষেরই শরিক হতে না পেরে 'নিরপেক্ষতার তত্ত্ব' বা গভীরতা ও সূক্ষ্মতার নামে ভেক-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বানিয়ে নতুন ধরনের শিল্পের আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা থেকেই তাঁদের মধ্যে নৈতিবাদী ও সংকীর্ণ সৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছে। এ'রা তখন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় শুধু বুর্জোয়া সমাজকে ব্যঙ্গ, ঘৃণা ও বিরক্তির উপাদানে সমালোচনা করেন তাঁদের সৃষ্টিতে, আর সমগ্র সমাজবাস্তবতার একটা অংশের টাইপকেই অভিনব শিল্পভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। "একটা গাছকে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সব গাছ থেকে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাও"—এমনই ছিল শিষ্য মোপাসাঁর প্রতি গুরু ফ্লবেয়ারের

উপদেশ। এইভাবে বাস্তবতা সম্পর্কে একটা অন্ধ ও সংকীর্ণ আনুগত্যের কারণেই গুরু-শিষ্য দুজনেই শিল্পের উদ্দেশ্যকে ছোট মাপে এনে খণ্ডিত ও কৃত্রিম করেছেন। এই ফ্লবেয়ারই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১৮৫০ সালে এক বন্ধুকে বললেন ঃ

"We have many voiced orchestra, varied sources of power. As for tricks and devices, we have more of those than ever. But we lack inner life, the soul of things, the idea of writer's subject."

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের 'ঐকতান' কবিতা—'আমার কবিতা জানি আমি গেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই সর্বত্রগামী।'

মোপাসাঁর যে 'উনে ভি' উপন্যাস সম্পর্কে টলস্টয় প্রশংসামুখর তার বিষয়বস্তু কি? বুরবোঁ রাজবংশ থেকে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব পর্যন্ত ফ্রান্সের অভিজাত মহলের কাহিনী। বালজাকও ইউরোপের একই যুগের অভিজাত বংশের শিল্পী-ঐতিহাসিক। কিন্তু মোপাসাঁর উপন্যাসে কি মাঝের জুলাই বিপ্লবের ফলে ফরাসী অভিজাত মহলের কোন পরিবর্তনের বাঁক ফুটেছে? না, গোটাটাই যেন একটা 'স্টিল লাইফ!' আসলে বালজাকের সজীবতা ও সমগ্রতা মোপাসাঁয় এসে যে স্থিরচিত্রের শিল্পভঙ্গিতে আটকে গেল তার কারণই হচ্ছে দুই লেখকের দায়বদ্ধতার মাত্রা ও অবস্থানের তফাৎ।

একই সময়ে রুশ লেখক টলস্টয় যখন অভিজাত জমিদারদের কদর্যতা ও হিংস্রতার ছবি আঁকেন তখন তিনি একটা পিতৃতান্ত্রিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়েই তাদের সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং কৃষকদের পক্ষে এই দুঃসহ সংঘাতের সমাধানও প্রায় একই যায়গা থেকে করেন। তবু, টলস্টয় যে ফ্লবেয়ার বা মোপাসাঁ হলেন না, তার কারণ ঐ মূল্যবোধের ভিত্তি, তা যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন। তাছাড়া তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে সমগ্র কৃষিনির্ভর সমাজে যে সব উপাদান এবং নিপীড়িত কৃষকদের মুখ দিয়ে যে সব প্রশ্ন যেভাবে রেখে গেছেন, সেখানেই শিল্পীর ঐতিহাসিক ভূমিকায় টলস্টয়ের মহত্ত্ব, সেখানেই টলস্টয়-মূল্যায়নে লেনিনের সাফল্য।

আসলে ভূমিমালিক শাসকশ্রেণীর সঙ্গে নিপীড়িত শার্ফ-কৃষকদের সম্পর্কে টলস্টয় যে উত্তর বা সমাধানের সূত্র দিয়েছেন, সেটা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বীজ হতে পারে না: কিন্তু তাঁর ও তাঁর কৃষক চরিত্রগুলির তোলা সঠিক প্রশ্নগুলিই ম্যাকসিম গোর্কির সাহিত্যভাবনায় নিউক্লিয়াস হিসাবে কাজ করেছে। টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে আন্তন চেখভও এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ম্যাকসিম গোর্কি ছিলেন গতিশীল বাস্তবতার, পারিপার্শ্বিকের জীবন্ত

মানবিক ডকুমেন্ট গড়ার ও সক্রিয় রোমান্টিকতার প্রবক্তা। তাঁর ভাবনা ও সৃষ্টি ছিল অবিচ্ছিন্ন।

আসলে টলস্টয় থেকে গোর্কি—শুধু রুশ সমাজেরই নয়, সমগ্র বিশ্ব-সমাজেরই অনিবার্য সংঘাত ও বিবর্তনের ফল। উভয়েই যে-যার ঐতিহাসিক অবস্থানে মহান ভূমিকা পালন করেছেন। তবে টলস্টয়ের চিন্তাচেতনার চেয়ে তাঁর সৃষ্টির জগত বেশি বাস্তবমুখী ও প্রগতির সহায়ক; আর গোর্কির সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত মতাদর্শ এবং সৃষ্টির জগত প্রায় অবিচ্ছিন্ন। সবচেয়ে বড় কথা, গোর্কি পেয়েছিলেন, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের বিপ্লবী রুশ-ভূমির আলোড়ন ও লেনিনের মত মহান বিপ্লবী নেতার সংস্পর্শ। যুগ-পটভূমি ও তার বাস্তবতার কারণেই শেখভ-টলস্টয়ের অনেক কৃষক চরিত্রের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের প্রভাবিত ধৈর্যশীল বিনীত ও ভগবতপ্রেমের কাঙাল মানুষের কল্পনা রয়েছে, কিন্তু গোর্কির চরিত্রসৃষ্টিতে রয়েছে বিপ্লবী পরি-স্থিতি থেকে উদ্ভূত এবং সক্রিয় রোমান্টিকতায় জারিত সেই সব 'টাইপ' যারা আগামীদিনে প্রাকৃতিক সম্পদ, নিজেদের শ্রম ও নতুন সমাজ-সংস্কৃতির স্রষ্টা ও কর্ণধার রূপে সচেতন হয়ে উঠছে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও নির্মাণকলা সম্পর্কে নানা নিবন্ধে গোর্কির বক্তব্য ছড়িয়ে রয়েছে। তাই থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

"...যাঁরা সাহিত্যকর্মী তাঁদের অবশ্যই সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। যে কোন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সেই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস জানা দরকার। শ্রমের মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে যখন তাঁরা বিশ্বাস ও বোধ অর্জন করবেন তখনই তাঁরা উৎপাদনে বেশি উৎসাহ পাবেন—এটাই তাঁদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কেও ব্যাপকতর জ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ সকল দেশের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রেরণা ও নির্মাণ প্রায় একই।...যে উপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সুদূর অতীত থেকে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অনুভূতি ও আত্মাকে ধরে রাখার জন্য যেন একটা বিরাট জাল বোনা হয়েছে, যার সারকথা—মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও জড়বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্ত করা।

"সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য 'টাইপ' সৃষ্টি করা; কোন ব্যক্তি-বিশেষের ফোটোগ্রাফ সার্বজনীন ও সামাজিক বোধ জাগাতে পারে না। যখন লেখক বেশ কিছু মানুষের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য, রুচি, অভ্যাস, বিশ্বাস ও রীতি-নীতি বিশ্লেষণ করে এক-একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন, তখনই তা আর্ট হতে পারে। লেখকের জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর 'সাবজেক্টিভ' প্রভাব কাজ করে। আত্মগত জীবনে বালজাক ছিলেন বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থক।

কিন্তু তাঁর বহু রচনায় পেটি-বুর্জোয়াদের ঘৃণ্য প্রবণতাগুলি নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত। এমনই অনেক লেখক রয়েছেন যাঁরা তাঁদের শ্রেণী ও যুগ-পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠ ডকুমেন্ট রচনা করেছেন।

"জ্ঞান ও কল্পনা—এই দুটি হল মানুষের জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে জন্মানো সৃষ্টিশীল শক্তির বিকাশ.. মানুষ তার ঈশ্বরকে কল্পনা করেছে সর্বশক্তিমান—এটা হল তার মহত্তর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক কল্পনা বাস্তবের অসহায়তা ও অক্ষমতার মধ্যে যা সে দেখতে পায়নি: আজ কিন্তু আমরা দেখতে পাই, শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে নিজেদের জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ার অধিকারে সচেতন ও সক্রিয়, যে-জীবনে তাদের মহত্তম আশা আকাঙ্খার সফল রূপায়ণ সম্ভব। তাই আজ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-কল্পনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

"বাস্তববাদ ও রোমান্টিসিজম—সাহিত্যে এই দুটি ভাবধারা রয়েছে কোন রঙের আস্তরণ না দিয়ে সোজাসুজি জীবনের সত্যকে প্রকাশ করা বাস্তববাদীদের কাজ। কোন সঠিক ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় কিন্তু রোমান্টিসিজম-কে বোঝানো যায় না। তবে এর মধ্যেও দুটি পরস্পর-বিরোধী ঝোঁক দেখা যায়, যাদের বলা যায় নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় রোমান্টিসিজম। যাতে প্রচলিত জীবনব্যবস্থাকে মানিয়ে নেবার লোভে বা মোহে পড়ে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন থাকে, তারই জন্য জীবনকে রঙিন করার নাম নিষ্ক্রিয় রোমান্টিসিজম: আর বাস্তবজীবনের বঞ্চনা ও অবমাননার বিরুদ্ধে মাথা তোলার—দাসত্বের ক্লিন্নতা থেকে সুন্দর জীবনের প্রেরণা দেয় সক্রিয় রোমান্টিসিজম। এ কথা নির্দিষ্টভাবে বলা চলে না যে বালজাক, তুর্গেনিভ, টলস্টয় গোগোল বা শেখভ বাস্তববাদী ছিলেন, অথবা রোমান্টিক ছিলেন। মহান স্রষ্টাদের মধ্যে এই দুটি প্রবণতাই মিশে থাকে ·আমি কিন্তু সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের ভূমিকা, একটা বিশেষ অর্থে স্বীকার করি। সাংস্কৃতিক দিক থেকে অপরিণত মানুষের 'নিরানন্দ বেদনাময়' জীবনকে কিছুটা কল্পনার রঙে-রূপে-বর্ণে সুন্দর করে ফোটালে, সেই জীবনের জন্য সংগ্রামে সে প্রেরণাও অনুভব করতে পারে।

"আমাদের সাহিত্যে এখনও সেইরকম রোমান্টিসিজম ফোটেনি যা জীবন সম্পর্কে সক্রিয় কল্পনার শিক্ষায় প্রাণিত করে পুরোন ক্ষয়িষ্ণু সমাজকাঠামো ভাঙতে ও নতুন সমাজজীবন গড়তে উৎসাহিত করে। জনগণের লেখককে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে সামাজিক দ্বন্দ্ব তার মধ্যে কোন সেতু বাঁধা চলবে না—একটির ধ্বংসে ও অপরটির বিজয়েই এই দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসেছে আজ শ্রমিকশ্রেণীর উপর, তারই প্রয়োজনে সক্রিয় কল্পনা আজ সৃষ্টিশীল

সাহিত্যের প্রধান চালিকাশক্তি। সারা দুনিয়ায় আজ পুরোন সমাজব্যবস্থার ভিৎ নড়ে গেছে। তারই লক্ষণ—হিংসাদ্বেষ, যন্ত্রণার কাতরানি, ভয়, নীতি-হীন ফুর্তির মাতলামি, অসুস্থ বাসনার গোঙানি ও যৌনবিকৃতি আজ সর্বত্র ছেয়ে গেছে, যার প্রকাশও ঘটছে প্রচলিত শিল্পে-সাহিত্যে। কিন্তু এই দূষিত আবহাওয়া থেকে যে মানুষ মুক্ত হতে চায়, তারই প্রতিফলন ঘটা চাই প্রকৃত শিল্প-সাহিত্যে।

"শিল্পী হলেন তাঁর দেশকালের শ্রেণী-সম্পর্কিত সবকিছুর ঘনীভূত ভাণ্ডার। অতীতকে তিনি যত বেশি জানবেন, তত গভীরভাবে তিনি বর্তমানকে, আমাদের যুগের বিপ্লবী বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই জনগণের ইতিহাস, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশ জানা একান্ত জরুরী।

"প্রবাদ ও লোককথাগুলির বেশি ভাগই শ্রমজীবীদের সামাজিক ও ঐতি-হাসিক অভিজ্ঞতার সারাংশ। এইগুলিতে যে সব সাধারণ সত্য বা নীতি-মালা বেরিয়ে আসে তা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। একবার আমার এক মজাদার বন্ধু বাড়ীর সামনে রাস্তা সাফাই করতে করতে মন্তব্য করে-ছিল—'কিছু লাভ নেই, যতই ঝাঁট দিই ততই নোংরা এসে জমে।' এই মন্তব্য থেকে একটা সারসত্য বুঝেছিলাম। এক রাস্তার নোংরা সাফ্ করলে অন্য রাস্তা থেকে আসে, সব রাস্তার নোংরা সাফ্ করলে আশপাশের অন্য শহরের থেকে নোংরা আসে। কাজেই এই সাফাই কাজটা সেদিনই সফল হবে যেদিন সারা পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করতে পারবো।

"...আমার কাছে মানুষের বাইরে কোন ভাব নেই। একমাত্র মানুষই সমস্ত বস্তু, ভাব, কল্পনা, বিস্ময়-এর উৎস এবং সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তির ভবিষ্যৎ প্রভু। আমাদের দুনিয়ার যা কিছু সুন্দর সবই মানবশ্রম থেকেই জন্মেছে, সমস্ত চিন্তা ও ভাব এই শ্রম থেকেই উদ্ভূত। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে। মানুষকে আমি শ্রদ্ধা জানাই কারণ এই দুনিয়া তারই শ্রম ও চিন্তাকল্পনার মূর্ত প্রকাশ যদি দুনিয়ায় 'পবিত্র' বলে কিছু থাকে তো সেটা হল নিজের অপূর্ণতা ও অতৃপ্তির বোধ এবং তা পূরণের জন্য নিরলস প্রয়াস। তাছাড়া যে ক্লেদাক্ত যন্ত্রণা মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের গতিপথ রুদ্ধ করে তার প্রতি ঘৃণাও 'পবিত্র', আর 'পবিত্র' হল সেই আকাঙ্খা ও সৃষ্টিশীল শ্রম যা দুনিয়ার বুক থেকে হিংসা, লোভ, পাপ ও যুদ্ধের ভয় মুছে দিতে অবিরাম সংগ্রাম করছে।"

['কেমন করে লিখতে শিখলাম' থেকে]

খ· "বুর্জোয়া সমাজের সংস্কৃতি কিছু প্রভাবশালী ও বিরাট সংখ্যক ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর মধ্যে ক্রমশ সক্রিয় ভয়াবহ সংঘাতের মধ্যে টিঁকে আছে···

বুর্জোয়াব্যবস্থা যত উন্নত হয়েছে, গরীব ক্ষুধার্ত শ্রমজীবীরা নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অংশ তৈরী করেছে, যারা স্বভাবতই মানবদরদী এবং যারা নিয়তই বিত্তবান ও ক্ষুধার্তদের মধ্যে আত্মপ্রেমের সংযম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

'মুনাফাকে যারা ভগবান বানিয়েছে তাদের সংস্পর্শে মধ্যবিত্ত ও তাদের সঙ্গে কিছু শ্রমিকও এসে আকণ্ঠ কাদায় ডুবে থাকে আর হামেশাই ছিচ্-কাঁদুনে অভিযোগ করে। এই দুর্গন্ধ কাদার নরকে বাস করার অস্বস্তি এরা যতই প্রকাশ করুক না কেন, এর থেকে উদ্ধার পাবার মৌলিক প্রয়াসে এরা খুব কমই সামিল হয়, অনেকে তো এমনও আছে যারা মনে করে ঐ কাদার জীবনই ভূ-স্বর্গ।

"আজকের এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির ক্ষয়রোগের দিনেও যারা 'যা কিছু ঘটুক' তারই মধ্যে প্রেম, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে শ্রেয় আদর্শ বলে মনে করে ও প্রচার করে, তারা একটা ব্যক্তিগত আস্তাবল বা 'মিষ্টি জীবন'-এর সম্ভাবনায় বিশ্বাস রাখে...জান্তব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি রোগ যা বুর্জোয়ারা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ঐ রোগেই আজ ওরা নিজেরাই মরছে। বলাবাহুল্য, এই বিনাশ যত দ্রুত ঘটে, দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ততই মঙ্গল। এই বিনাশ ঘটানোর ইচ্ছা ও ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই রয়েছে।

"যখন ইতিহাসে দুই শক্তির বিরোধ ঘনীভূত হয়—বুর্জোয়া অতীত ও সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ—তখন মানুষ দোটানায় পড়ে। তাদের আবেগ-সংস্কার পিছনের দিকে টানে, বুদ্ধি টানে সামনে দিকে। তারা চিৎকার করে জোরে, কিন্তু নির্দিষ্ট পথে চলার প্রত্যয় অনুভব করে না যদিও ইতিহাস সেটা সহজ করে দিয়েছে।

"যদি অতীতের ক্ষতিকর অজ্ঞতা তুলে ধরতে হয়, সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে তাকে বর্তমানের ইতিবাচক কর্মকান্ড ও ভবিষ্যতের মহান লক্ষ্যগুলির প্রেক্ষিতে দেখা দরকার।"

১৯৩৩

গ· "প্রাচীন সংস্কৃতির কোন গবেষক লোকগাথা, প্রবাদ-প্রবচন অথবা পৌরাণিক কাহিনী থেকে তথ্য সংগ্রহে তেমন মন দেন না। এতেই রয়েছে প্রকৃতির ঘটনাবলী, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সামাজিক জীবন গঠনে সুবিন্যস্ত ও শিল্পসম্মত বর্ণনা। তখন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে শ্রম ও গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে 'বিশুদ্ধ' চিন্তা করেছে এমন দ্বিপদ প্রাণী পাওয়া খুবই কঠিন। তখন কিন্তু এমন কোন কান্ট পাওয়া যাবে না যিনি 'বস্তুর স্বরূপ' চিন্তায় বিভোর। আসলে পরবর্তীকালের মানুষই 'বিমূর্ত চিন্তা' করেছে এবং তা প্রচার করেছে। আরিস্টটল বলেছেন : 'সামাজিক বন্ধনমুক্ত মানুষ হয় দেবতা, নয়ত বর্বর।

'সমস্ত পুরাণ কথায় টান্টালাসের সেই কাহিনীর ছায়া রয়েছে যেখানে মানুষ গলা জলে নেমেও আকণ্ঠ পিপাসায় জ্বলছে। বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশে আবদ্ধ অবস্থার চিত্রকল্প।

'শ্রমবীর হারকিউলিসকে অলিম্পাসের পদে তুলে দেবতার সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আদিম কোন দেবতাই বিমূর্ত বা উদ্ভট কল্পনার বিষয় ছিল না। তারা ছিল শ্রমের প্রেরণা। তাই শ্রমজীবী মানুষের ধর্মীয় ভাবনাকে উদ্ধৃতির মধ্যে রেখেই বলতে হয়, এগুলি ছিল মূলত বস্তুভিত্তিক ও শিল্পিত প্রকাশ।

'দাস-প্রভুদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে দেবতারাও মাটি থেকে দূরে বা অনেক উঁচুতে স্বর্গে গেল। এই পর্বে প্রমিথিউস ছিল জনগণের দেবতা যার প্রতি স্বর্গের ঈশ্বর ছিল বিরূপ।

'শ্রমপদ্ধতি ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন তত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক প্লেটোকে চার্চগুলো করেছিল খ্রীষ্টধর্মের অগ্রদূত। যে প্যাগানিজম-এর মূলে রয়েছে শ্রমে বা বস্তুতান্ত্রিকতায় তার অস্তিত্ব মোছার কাজে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এরপর সামন্তপ্রভুরা বুর্জোয়াদের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝে বিশপ বার্কলের ভাববাদী দর্শন প্রচারে কোমর বাঁধল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে বস্তুতন্ত্রের প্রবক্তা বুর্জোয়ারাই তাদের ধ্বংসকারী নতুন শত্রু সর্বহারা শ্রেণীর ভয়ে আবার সেই গীর্জার ছায়ায় মুখ লুকালো।

'ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি দুনিয়ার জনগণের উপর, মণিমাণিক্যের উপর এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যে কর্তৃত্ব করে তা দৈহিক ও নৈতিক। তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন-কর্মসূচীতে সমগ্র মানবতার প্রগতির প্রশ্ন স্থান পায় না। ওরা গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার বাণী প্রচারে কৃপণ নয়। কিন্তু কার্যত শিক্ষার নামে ওরা সৃষ্টি করেছে মানুষের মধ্যে বিভেদ, জাতি ও ধর্মের মধ্যে পরস্পর গড়া হয়েছে রকমারী প্রাচীর। ঔপনিবেশিক শাসনের সপক্ষে উপদেশ বিলিয়ে ওরা দোকানদারের লোভের মত অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠ ও সঞ্চয় করতে চেয়েছে।

'যখন হাত শেখায় মাথাকে এবং সেই মাথার নতুন জ্ঞান আবার ফিরে আসে হাতের কাছে, তখনই মানুষের অগ্রগতি ঘটছে বলে ধরতে হবে। দৈহিক বৃত্তি ও বৌধিক বৃত্তির মধ্যে ফারাক থাকার অর্থই জ্ঞানের দৈন্য। পুরোহিতরা যখন জাগতিক বোধকে ব্যবসায়ে পরিণত করল, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর তত্ত্বগত অলীকতার আড়ালে সেগুলির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করল, তখনই শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে গড়ে তুললো প্রতিরোধ। আজ পর্যন্ত যত গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম এবং সেই সঙ্গে বিপুল কু-সংস্কারের অন্ধকার—সবই হয়েছে জাগতিক বোধের সীমানার বাইরে থাকার কারণে।

'যে শ্রমিকশ্রেণী আজ শিক্ষিত হয়ে উঠছে তাদের জন্য আমরা যখন শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করি তখন নিজেদের ফিলিস্টাইন মনোভাব সম্পর্কে অনেক সময়ে সচেতন থাকি না, যার ফলে হিংসা, লোভ, অশালীন রুচি ও অপরকে হীন করার চেষ্টা প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু হ্যামলেট বা ফাউস্টের মত করে কোন ফিলিস্টাইন চরিত্র সৃষ্টি করতে পারি না। এরা শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে পরগাছা যারা বড় বুর্জোয়াদের দিকে হেলে থাকে, যারা মার খেয়ে বা চাপে পড়ে সর্বহারাদের দলে ভিড়ে যায়, কিন্তু সেখানেও শাশ্বত ধর্ম, বোহেমিয় আচরণ, অহং-সর্বস্বতা ইত্যাদি প্রচার করে। অবশ্য আজ শ্রমিকশ্রেণীও মস্তিষ্কবিহীন নয়। ফিলিস্টাইনরা এটা বোঝে যখন দেখে কারখানার বাইরেও ঐ সব শ্রমশীল হাতগুলো বিপ্লবী পতাকা তুলে ধরেছে।

'সব পরগাছাই অর্থাৎ সব ফিলিস্টাইনই ক্ষতিকর নয়। এদের মধ্যে অনেকেই যখন বোঝে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় তারা অনাদৃত ও অসম্মানিত তখন তারা যে স্বাধীন ইচ্ছা বা 'মানব অস্তিত্বের সংগ্রাম' প্রচার করে সেটাও একটা স্তরে অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। এই জন্যই তারা সৃষ্টি করেছে 'অনাবশ্যক লোক', 'অনুতপ্ত মহাজন' এবং এমন সব চরিত্র যারা 'ময়ূরও নয়, চড়ুইও নয়।'

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল সমাজজীবনে সংগ্রাম সৃষ্টির উপাদান সঞ্চার, যার লক্ষ্য মানুষের মূল্যবান ব্যক্তিমানসের বিকাশে সাহায্য করা—দুনিয়ার বুকে সুখী ও সুন্দর জীবন নির্মাণের জন্য।"

[১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে]

৬· বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের 'ডায়ালেক্‌টিক্যাল থিয়েটার'

শতাব্দীর বিস্ময়কর নাট্য-বিজ্ঞানী বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের এপিক থিয়েটার বা এলিয়েনেসন রীতি যত বেশি সোরগোল তুলেছে, তত বেশি মানুষের কাছে তাঁর ডায়ালেক্‌টিক্‌স-এর মর্ম স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া অধিকাংশ নাট্যদল তাঁর এপিক পদ্ধতিকে শুধুই আঙ্গিকের অভিনবত্বের অংশকে বিষয়নিরীক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গুণগত গভীরতার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত ও আগ্রহী।

এপিকের সঙ্গে গ্রন্থের এবং থিয়েটারের সঙ্গে মঞ্চের সম্পর্ক নির্দিষ্ট ধরে নিলে হোমার ও মধ্যযুগীয় ধর্মগীতিকার মঞ্চায়নের এবং গ্যেটের 'ফাউস্ট' ও বায়রণের 'ম্যানফ্রেড'-এর গ্রন্থস্থ উপভোগ্যতার ঘটনাকে মেলানো মুস্কিল। তাছাড়া আরিস্টটল যে অর্থে এপিক ও থিয়েটারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, স্বভাবতই সেই অর্থে এবং 'নাটকীয়' ও 'এপিক'—এই দুই স্বতন্ত্র শিল্প-প্রকরণ বলে ধরে

নিয়েই বহু 'এ্যাকাডেমিক' নন্দনতাত্ত্বিক ব্রেখ্‌টের 'এপিক থিয়েটার'কে স্ববিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন।

বরং বলা দরকার, ব্রেখ্‌টের থিয়েটার পুরোপুরি আরিস্টটলের উল্টো দিক। আসলে ব্রেখ্‌টের এপিক-এর উৎস সন্ধানে যেতে হবে প্রাচীনতম গ্রীক থিয়েটারে যেখানে জনগণই সেই নাট্যোৎসবের নায়ক। ব্রেখ্‌টের 'মেসিং-কাউফ ডায়ালগ'-এর দার্শনিক বলছেন ঃ করুণা ও ভয় জাগানোকে শিল্পের গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য বলে মানতে পারতাম যদি জানতাম তা জনগণের জন্য করুণা এবং থিয়েটার যদি জনগণকে ভয়মুক্ত করার দায়িত্ব নিত তবেই আরিস্ট-টলকে মানতে পারতাম।

আসলে ট্রাজিক নায়কের জন্য করুণা এবং তার দুঃখ-পরাজয়ের সঙ্গে দর্শকচিত্তের একাত্মতার নাম যে 'এমপ্যাথি', তার বিরুদ্ধেই ব্রেখ্‌টের এপিক বা ডায়ালেক্‌টিক্যাল থিয়েটারের প্রয়োগ।

ব্রেখ্‌টীয় এপিক-এর নায়ক আজ বিপ্লবী প্রলেতারিয় শ্রেণী ও তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন—কোন অভিজাত বা বুর্জোয়া নায়কের জন্য 'করুণা' বা এম্‌প্যাথি সংগ্রহের মহড়াবন নয়।

নাটকীয় থিয়েটারে কেন্দ্রীয় গল্পের বন্ধনে থাকা এবং আলাদা অংশ গুলিকে একটা নির্দিষ্ট ও সাধারণ সম্পর্কে ঘনীভূত করাটাই প্রধান। কিন্তু এপিক থিয়েটার হল—একটা কাঁচিকে স্বতন্ত্র দুটি খণ্ডে ভাগ করার পরও তাদের শান বা জীবন প্রতিফলনের যোগ্যতা ঠিক তেমনি থাকে, এটাই দেখানো।

ব্রেখ্‌টের এপিক থিয়েটার বা ডায়ালেকটিক্যাল থিয়েটার বা এ্যালিয়েনেসন-পদ্ধতি অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সমাজে কেবলই একটা চমকপ্রদ শিল্প-আঙ্গিক নয়, এমনকি পশ্চিমী দুনিয়ার 'রোমান্টিক', 'সুররিয়ালিস্ট', 'কিউবিস্ট' বা 'একজিস্টেনসিয়ালিস্ট' আন্দোলনের মত কোন শিল্প আন্দোলনও নয়, এটা মূলত একটা বৈপ্লবিক সামাজিক আন্দোলন। কারণ এই শিল্প হাতিয়ারের প্রয়োগের সঙ্গে দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, আইন-প্রশাসন সবকিছুই সক্রিয়ভাবেই জড়িত।

এ কথা ঠিক, ব্রেখ্‌টের এপিক পদ্ধতি হোমারের যুগে বা মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না, কারণ উৎপাদনের উপায়গুলির বা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির স্তর ব্রেখ্‌টীয় ডায়ালেকটিক্‌স-এর অনুগামী বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণকে ফোটানোর মত স্পট বা প্রজেক্‌সন করার উপযোগী ছিল না।

এই এপিক রীতি পর পর গল্প বলে যায়, চরিত্ররা কখনোই নিজেদের মধ্যে ডুবে যায় না, পরস্পর এমনকি নিজের সঙ্গে তর্ক করে, আবেগ এলে যুক্তি তাকে ঝাঁকানি দিয়ে সচল করে, দর্শকরাও চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে আবেগে হারিয়ে যায় না। ব্রেখ্‌টের কথায়—

"The spectator is no longer in anyway allowed to submit to an experience uncritically by means of simple empathy with the characters in a play."

ব্রেখ্‌ট নিজেই নাটকীয় ও এপিক থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এইভাবে ঃ

"নাটকীয় থিয়েটারের দর্শক বলে 'হ্যাঁ, আমিও এটা অনুভব করেছি! এ তো আমারই মত! এটাই স্বাভাবিক। না, এর কোন পরিবর্তন নেই! ঐ মানুষটার দুঃখদুর্দশা আমাকে স্পর্শ করেছে, কারণ ঐগুলি থেকে রেহাই নেই। সত্যিই এটা মহৎ শিল্প! অহো! ওরা যখন কাঁদে, আমিও কাঁদি, ওরা যখন হাসে, আমিও হাসি!'

আর, এপিক থিয়েটারের দর্শক বলে—'আমি এটা আগে কখনও ভাবিনি! এটাই শেষ কথা নয়। এটা একটা আলাদা ব্যাপার, বিশ্বাস করাই কঠিন, এর নিকেশ হওয়া দরকার। লোকটার দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে, কারণ এটা অপ্রয়োজনীয়। স্বাভাবিক কারণেই এটা মহৎ শিল্প। যখন ওরা কাঁদে, আমি তখন হাসি এবং তাদের হাসির সময়ে আমার কান্না পায়।' "

এই এপিক বা ডায়ালেকটিক্যাল থিয়েটার কেমন?

'নদীর ধারে গাছের সারি, নিচে ছোট কুটির/ছাদের থেকে উঠছে ধোঁয়া/কী বিষণ্ণ হত এসব নদী গাছ আর বাড়ী/যদি না থাকত ঐ ধোঁয়া!' এই যে প্রকৃতির মানবিকতা এবং মানুষের প্রাকৃতিকতা মুছে দেয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, তা ফিরিয়ে আনার নৈতিক মূল্যবোধ জাগানোর ও বুদ্ধিগত আনন্দ সঞ্চারের কাজই 'এলিয়েনেসন'-এর বা এপিক থিয়েটারের কাজ। ব্রেখ্‌ট বলছেন,

"I can no longer find in myself all those motives which the press or scientific reports show to have been observed in people . . . modern psychology, from psychoanalysis to behaviourism, acquaints me with facts that lead me to judge the case quite differently, especially if I bear in mind the findings of sociology and history."

ব্রেখ্‌টীয় এপিকের মূলকথা হল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রীয় আবেগ বা মোহের গ্রাস থেকে যুক্তি বিচারের মাধ্যমে মুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া। ভঙ্গিটা হবে তির্যক বা ডায়ালেকটিক্যাল এবং নিশ্চিতভাবেই 'স্বাধীনতার লক্ষ্যে', 'দুনিয়াটাকে বদলানো'র লক্ষ্যে নৈতিক জ্ঞানের প্রচার, প্রচলিত নৈতিকতার মধ্যে মানুষকে ডুবিয়ে রাখা নয়।

ব্রেখ্‌ট তাঁর এপিক বা 'এলিয়েনেসন' রীতির ব্যাখ্যায় বলেছেন, বুর্জোয়া অবক্ষয়ী সমাজে বিচ্ছিন্নতা, পরাজয়, নেতিবাচক প্রবণতা ইত্যাদি 'অ্যান্টি-

থিসিস' অবশ্যই বৈপ্লবিক রূপান্তরের পক্ষে দরকারি। বিচ্ছিন্নভাবে 'এ্যান্টি-থিসিস' ও 'থিসিস' সংঘাতে আসবে কি করে? আর 'সিন্থিসিস'-ই হবে কি করে? একই বস্তু ও মানুষের মধ্যে এই দুই শক্তি বিপরীত সম্পর্কে ক্রিয়াশীল; কাজেই নেতি বা 'এ্যান্টিথিসিস' থেকে সুরু করা ভুল নয়। তবে শুধুমাত্র নেতিটাও যেমন সত্য নয়, তেমনি শুধুমাত্র ইতিটাও বৈপ্লবিক নয়—দুয়ের সংঘাতেই বৈপ্লবিক নিউক্লিয়াস জন্ম নেয়। অর্থাৎ সরাসরি ও সরলভাবে বিপ্লবী আবেগ ভরালেই মার্কসীয় ইতিহাস-চেতনার প্রক্রিয়া সার্থক হতে পারে না। এই জন্য ব্রেখ্‌টের নাটকে অতীতের নির্বিচার জয়গান, মহৎ গুণাবলী, প্রচলিত ঐক্য ও শৃংখলাবোধ থেকে নাট্যচরিত্র সহ দর্শকরাও মুক্ত হবার তাগিদ বোধ করে। অর্থাৎ অলীক বা অবাস্তব মোহাবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে—এরই নাম 'এলিয়েনেসন'। এতে যে মাপা ছকে 'সিন্থিসিস' দেখাতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। বৈপরীত্যের সমাবেশে দেখানো পরাজয়, দুর্ভাগ্য ও অত্যাচারের ঘটনা দর্শক চেতনায় কী ফলাফল সৃষ্টি করছে তার উপরই নাটকের সার্থকতা নির্ভর করবে। ঐ সব সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা ও অত্যাচার থেকে নাটকের চরিত্রগুলি হয়ত মাথা তুলছে না, কিন্তু দর্শকদের মনে ও মননে সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলে যাচ্ছে, তা হলেও হবে 'সিন্থিসিস'-এর প্রস্তুতি। এখানে হের কয়নারের গল্পটি প্রাসঙ্গিক:

হাঙরেরা যদি মানুষ হত, নিশ্চয়ই ছোট মাছেদের আদর করত, তাদের সুখী বানিয়ে রাখত। কারণ দুঃখী মাছেদের চেয়ে সুখী মাছের স্বাদ ভাল।

ছোট মাছেদের স্কুলে কী শেখানো হবে? এমনভাবে ইতিহাস শেখানো হবে যাতে হাঙরদের সম্পর্কে সমীহ ও শ্রদ্ধা জাগে ; এমনভাবে ভূগোল শিখবে যাতে তারা হাঙরদের জায়গাটা চিনে খাদ্য হিসাবে যেতে পারে। এই খাদ্য হবার পবিত্র কর্তব্য পালনই হবে তাদের ধর্ম শেখা।

মাছেদের থিয়েটারে এমনভাবে বীর-মাছেদের রোমহর্ষক কাহিনী দেখানো হবে যাতে শুধু চরিত্ররাই নয়, দর্শকরাও এক স্বর্গীয় আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে হাঙরদের পেটে মিলিয়ে যায়!

সব মাছেরাই কিন্তু এক রকম হবে না। কিছু মাছকে অফিসিয়াল পদ দিয়ে হাঙরেরা এই রকম স্বর্গীয় সুখের শাসন চালাবে।

এতে কি আরিস্টটলের 'ক্যাথারসিস' হল বা কান্টের আবিষ্ট নৈতিকতার তৃপ্তি হল? এই বিরোধ বা অসঙ্গতির মধ্যে যে হাস্যরস তা বুদ্ধিকে শানিত করে, একটা বৈপ্লবিক বোধ ও অনুভূতির দিকে চেতনাকে তুলে ধরে। এই অর্থেই ব্রেখ্‌টের এপিক থিয়েটার একটা বৈপ্লবিক আন্দোলনের হাতিয়ার। বুর্জোয়ারা ঐ 'হাঙর-মাছের' সম্পর্কটাকেই রাজনীতিহীন বলে, আর এর

সমালোচনা বা বিপরীত কিছু মানেই রাজনীতি করা। এই প্রসঙ্গেই লেনিন বলেছেন—

"People have been the foolish victims of deception and self-deception in politics, and they always will be untill they have learnt to seek out the interests of some class or other behind all moral, religious and social phrases, declarations and promises."

অর্থাৎ জনগণ সাধারণত রাজনীতিতে প্রবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনার বিমূঢ় শিকার হয়ে থাকে। যতদিন না তারা সব রকম প্রচলিত নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক বুলি, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোন-না-কোন শ্রেণীর স্বার্থ যে কাজ করে এটা বুঝতে শেখে।

লেখক পরিচিতি

ডঃ নবকুমার নন্দী ঃ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমালোচক।

ডঃ পবিত্র সরকার ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও কৃতি নাট্য-সমালোচক।

শ্রীহীরেন ভট্টাচার্য ঃ জনপ্রিয় নাট্যকার, শিল্পী ও শিল্পতত্ত্ববিদ্।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ঃ প্রবীণ সাহিত্য সমালোচক ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূতপূর্ব উপ-গ্রন্থাগারিক ও বিশিষ্ট সাহিত্য গবেষক।

শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ঃ বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক।

শ্রীপার্থ দে ঃ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ।

ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক, সুপরিচিত নাট্য-সমালোচক ও সাংবাদিক।

ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী ঃ কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ, জনপ্রিয় নাট্যকার, সাহিত্য-সমালোচক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্।

শ্রীনির্মাল্য নাগ ঃ জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী ও শিল্প-সমালোচক।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ঃ সুপরিচিত প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক ও সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থ

১। জীবনের সপক্ষে (সাহিত্য-সমালোচনা)

২। সংস্কৃতির সপক্ষে (প্রবন্ধ-সংকলন)

৩। শিশুশিক্ষার ভাষা (সম্পাদিত)

৪। নির্বাচিত কবিতা ও ছড়া

৫। সাহিত্য সংস্কৃতির নানাদিক

৬। আবৃত্তি শিখবো